বিএনপি
সময়-অসময়
মহিউদ্দিন আহমদ

বিএনপি কি একটি রাজনৈতিক দল, নাকি একটা প্রবণতা? এর উত্তর খুঁজতে হলে যেতে হবে একাত্তর সালে। বুঝতে হবে মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের মনস্তত্ত্ব, পঁচাত্তরের ট্র্যাজেডি এবং ওই সময়ের দিশেহারা রাজনীতি। প্রশ্ন হলো, বিএনপি কি ষড়যন্ত্রের ফসল, নাকি এর উত্থান ছিল অনিবার্য। মহিউদ্দিন আহমদ দলটির সুরতহালের চেষ্টা করেছেন প্রথমবারের মতো।

বিএনপির জন্ম সেনাছাউনিতে, একজন সেনানায়কের হাতে, যখন তিনি ছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্রে। এ ধরনের রাজনৈতিক দল ক্ষমতার বৃত্ত থেকে ছিটকে পড়লে সাধারণত হারিয়ে যায়। বিএনপি এদিক থেকে ব্যতিক্রম। দলটি শুধু টিকেই যায়নি, ভোটের রাজনীতিতে বিকল্প শক্তি হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। দেশে গণতন্ত্র আছে কি না, বিএনপিতেও গণতন্ত্রের চর্চা হয় কি না, তা নিয়ে চায়ের পেয়ালায় ঝড় তোলা যায়। কিন্তু দলটি দেশের জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে, এটা অস্বীকার করার জো নেই।
বিএনপির সুলুক সন্ধান করতে হলে আমাদের যেতে হবে একাত্তরে। জানতে হবে মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের মনস্তত্ত্ব। পঁচাত্তরের বিয়োগান্ত ঘটনাপ্রবাহকে এড়িয়ে গিয়েও বিএনপি সম্পর্কে আলোচনা হবে অসম্পূর্ণ। প্রশ্ন হলো, বিএনপি কি ষড়যন্ত্রের ফসল, নাকি এর উত্থান ছিল অনিবার্য। লেখক-গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ এই বইয়ে দলটির একটা সুরতহালের চেষ্টা করেছেন। প্রথমবারের মতো এই বইয়ে উঠে এসেছে জানা-অজানা নানা প্রসঙ্গ, যা একদিন ইতিহাসের উপাদান হবে।

আলোকচিত্র : খালেদ সরকার

মহিউদ্দিন আহমদ

জন্ম ১৯৫২ সালে, ঢাকায়। পড়াশোনা গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে। ১৯৭০ সালে ডাকসুর নির্বাচনে মুহসীন হল ছাত্র সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে যুক্ত হন দৈনিক *গণকণ্ঠ*-এ—প্রথমে প্রতিবেদক ও পরে সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তথ্য, যোগাযোগ ও প্রকাশনা-সম্পর্কিত এ দেশের প্রথম বিশেষায়িত এনজিও গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং দীর্ঘ ১৫ বছর এর চেয়ারপারসন ছিলেন। দক্ষিণ কোরিয়ার সুংকোংহে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এম.এ.ইন এনজিও স্টাডিজ' কোর্সের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও অধ্যাপক। এ পর্যন্ত দেশে-বিদেশে লেখা এবং সম্পাদিত বই বেরিয়েছে ৪০টি। তার মধ্যে কয়েকটি হলো : *কমিউনিটিজ ইন অ্যাকশন, ভয়েসেস থ্রু ব্যালট, মিলিটারাইজেশন ইন সাউথ এশিয়া, কার্ল মার্ক্সের কবিতা, গভীর পবিত্র অন্ধকার, জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি* ইত্যাদি।

প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল

বিএনপি সময়-অসময়

মহিউদ্দিন আহমদ

বিএনপি : সময়-অসময়
গ্রন্থস্বত্ব : ২০১৬ মহিউদ্দিন আহমদ
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০১৬
মাঘ ১৪২২, ফেব্রুয়ারি ২০১৬
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মাসুক হেলাল
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৬০০ টাকা

BNP : Somoy-Asomoy
by Mohiuddin Ahmad
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 88-02-8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 600 only

ISBN 978 984 91762 5 1

উ ৎ স র্গ

আমার দেখা সেরা মানুষ
আমার বাবা শামসুদ্দিন আহমদ
একাত্তরে যাঁকে আমি হারিয়েছি

সূচিপত্র

ইতিহাসের খোঁজে

বাঙালি আবেগপ্রবণ জাতি। এ নিয়ে আমরা শ্লাঘা অনুভব করি। কিন্তু বিষয়টা সব সময় গৌরবের নয়। আবেগ যুক্তিকে ঢেকে দেয়, জিজ্ঞাসার পথ রুদ্ধ করে ফেলে, মীমাংসার পথ করে দেয় কঠিন। অতি আবেগের কারণে আমরা জাতিগতভাবে এখনো ইতিহাসমনস্ক হতে পারিনি। আর সে জন্যই আমরা ইতিহাসের চরিত্র নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছি বারবার। যা তৈরি করেছি, তা হলো কতগুলো কল্পকাহিনি বা মিথ।

আমাদের সবকিছু বাড়িয়ে বলার অভ্যাস। অতিরঞ্জন আমাদের জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। মধ্যযুগের দোভাষী পুঁথিতে পড়েছি : 'লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতার, শুমার করিয়া দেখি সাড়ে পঞ্চ হাজার।'

১৯৮৫ সালের ২৫ মে উড়িরচরে সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় হলো। পেশাগত কাজের জন্য আমি সেদিন উড়িরচরে ছিলাম বিকেল পর্যন্ত। সন্ধ্যায় উড়িরচর আর সন্দ্বীপের মধ্যে যে চ্যানেল, সেখানে আমাদের জাহাজ 'অন্বেষা' (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জরিপ জাহাজ) নোঙর করা ছিল। তার আগের সপ্তাহে আমরা উড়িরচরে একটা শুমারি শেষ করেছিলাম। আমরা প্রতিটি ঘরে গিয়েছিলাম। তখন উড়িরচরে ছিল ৭৪০টি পরিবার, জনসংখ্যা হবে সাকুল্যে চার হাজার। ঝড়ের পর ঢাকার পত্রিকাগুলো পাল্লা দিয়ে মৃতের সংখ্যা দিন দিন বাড়াতে থাকল। *বাংলাদেশ অবজারভার* ২৯ মে সংবাদ শিরোনাম করল, 'মৃতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে'। মুশকিল হচ্ছে, এরা কেউ উড়িরচরে যায়নি। এমনকি ঘূর্ণিঝড়ের আগে উড়িরচরের নাম পর্যন্ত শোনেনি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও এরকম অনেক কিছু লেখা হচ্ছে। ইতিহাস লেখার সময় আমাদের সব সময় একটা জুজু তাড়া করে বেড়ায়। সত্য কথা লিখতে গেলে কেউ যদি বলে বসে ব্যাটা অমুকের দালাল। তাদের দৌরাত্ম্যে সত্য বলা বা লেখা রীতিমতো বিপজ্জনক।

এ ব্যাপারে আধুনিক বাংলায় প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের উদাহরণ টেনে আনা যায়। তাঁকে অনেকেই 'ইংরেজের দালাল' বলতে কসুর করেননি। তাঁর সম্পর্কে লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করছি।

> এখনো অনেকে মনে করেন, 'আনন্দমঠ' ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই গাঙ্গুলী, উল্লাসকর দত্ত, বারীণদা, উপীনদার জন্মদাতা। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র নিজে আনন্দমঠের তাৎপর্য সম্বন্ধে ভুল করিবার কোনো ছিদ্র রাখেন নাই। তিনি প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেই লেখেন,
>
> 'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজ বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজ বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝানো গেল।' (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবিবাসরীয়, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৩ জুলাই ১৯৮৮)

আমরাও অনেক সময় আবেগতাড়িত হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মনে করি, 'আন্দোলন' একটি অতি পবিত্র ও জরুরি বিষয়। প্রতিটি মুহূর্তই যেন ক্রান্তিকাল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আন্দোলন যে আসলে উচ্ছৃঙ্খলতা, তা আমরা ভয়ে স্বীকার করি না। কেননা আন্দোলনকারীরা আমাদের ওপর চটে যেতে এবং আমাদের সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারের দালাল ও পোষ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দিতে পারেন। ফলে 'আন্দোলন' করতে করতেই অনেকে জীবন পার করে দেন। বাংলাদেশের রাজনীতি শুরু থেকেই 'আন্দোলনের' চক্রে পড়েছে। অনেক সময় মারামারি, প্রতিপক্ষের সভা ভেঙে দেওয়া এবং খুনখারাবিকেও 'আন্দোলন' বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

লেখাজোকা নিয়ে নানাজনের নানা উদ্দেশ্য। কেউ মনে করে, এটাই বুঝি সবচেয়ে সহজ কাজ। তাই তার গুছিয়ে কাজটি করার তেমন দায় নেই। সে লেখে মনের আনন্দে, নিজের গরজে। কেউ কেউ লেখে ফরমাশমতো। ওপরওয়ালা যা বলবেন, যেভাবে বলবেন, তাকে সেভাবেই লিখতে হবে। এভাবেই সম্ভবত 'মসিজীবী' পেশা তৈরি হলো। কেউ কেউ আবার লেখেন সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য। এ 'সত্য' সব সময় চিরন্তন সত্য নয়। অধ্যাপক তাঁর অনুগত ছাত্রটিকে বলে দেন, 'তুমি এটা ঠিক বা ভুল প্রমাণ করো।' দুটোই করা সম্ভব—দুই ধরনের তথ্য-উপাত্ত দিয়ে। একটা প্রস্তাবনা বা হাইপোথিসিসকে প্রমাণ করাই এখানে মুখ্য। সত্যান্বেষণ আসল লক্ষ্য নয়।

সময় এবং ইতিহাসকেও এরকম নানাভাবে দেখা যায়, বিচার করা যায়, বিশ্লেষণ করা চলে। একসময় কমিউনিস্ট পার্টিগুলো তাদের কাউন্সিল সভার রিপোর্টে লিখত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি চমৎকার, 'অবজেকটিভ কন্ডিশন' খুবই অনুকূল, প্রয়োজন শুধু 'সাবজেকটিভ কন্ডিশন' তৈরি করা।

তারপর হঠাৎ করে দেখা গেল চমৎকার স্থানীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে এবং বিপ্লবের বেলুন ফুটো হয়ে গেছে। আবার কেউ কেউ বলেন, কিছুই ঠিকমতো চলছে না। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় হয়েছে। মানুষ না খেতে পেয়ে মরছে। বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে গেছে।

এসব কথা যাঁরা লেখেন বা প্রচার করেন, তাঁরা সবাই পণ্ডিত শ্রেণির, জ্ঞানী-গুণী এবং অভিজ্ঞ। তাঁদের কথা বলার একটা ধরন আছে। সাবালক হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেই ধরনটা সাধারণত বদলায় না।

এখানে আমি যে বিষয়টি নিয়ে লিখছি তাহলো একটা রাজনৈতিক দলের ইতিবৃত্ত। 'ইতিহাস' বলার সাহস আমার নেই। কেউ কেউ বলতে পারেন, তোমার কি ইতিহাস-শাস্ত্রের ডিগ্রি আছে? স্বীকার করি, নেই। তবু সাহিত্যের ছাত্র না হয়েও যদি দু-একটা পদ্য লেখা যায়, পদার্থবিজ্ঞানের ডিগ্রি নিয়ে যদি ব্যাংকে চাকরি করা যায়, রাজনীতিবিজ্ঞান না পড়ে যদি রাজনৈতিক দলের নেতা হওয়া যায়, তাহলে ইতিহাস নিয়ে দু-চার কথা বলার অধিকার আমি ন্যায্য হিসেবেই দাবি করতে পারি। তার পরও বলব, আমি যা লেখার চেষ্টা করছি, একদিন হয়তো তা ইতিহাসচর্চার উপাদান হতে পারে।

সে যা-ই হোক। একটা ঘটনা, সময় বা চরিত্রকে আমরা কে কীভাবে বিশ্লেষণ করব, সেটা নির্ভর করে আমাদের মন-মানসিকতা, শিক্ষা-দীক্ষা এবং মতলবের ওপর। এখানে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাক্ষী মেনে তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেব। বাংলা ১৩৩৪ সনের শ্রাবণ মাসে 'সাহিত্যধর্ম' নামে তিনি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে কী লিখেছিলেন তিনি?

> কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র, রাজপুত্র, এই তিনজন বাহির হন রাজকন্যার সন্ধানে। বস্তুত রাজকন্যা ব'লে যে একটা সত্য আছে, তিন রকমের বুদ্ধি তাকে তিন পথে সন্ধান করে।
>
> কোটালের পুত্রের ডিটেকটিভ-বুদ্ধি, সে কেবল জেরা করে। করতে করতে কন্যার নাড়ীনক্ষত্র ধরা পড়ে; রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণ থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের এলাকায় পৃথিবীর সকল কন্যাই সমান দরের মানুষ—ঘুঁটে কুড়োনির সঙ্গে রাজকন্যার প্রভেদ নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে-চক্ষে দেখেন সে চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রশ্নজিজ্ঞাসা।
>
> আর-এক দিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ। তিনি রাঁধেন বাড়েন, সুতো কাটেন, ফুলকাটা কাপড় বোনেন। এখানে সওদাগরের পুত্র তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে চক্ষে না আছে রস, না আছে প্রশ্ন; আছে মুনাফার হিসাব।
>
> রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন—অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি—তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, বোধ করি, চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার

হয়েছেন জ্ঞানের জন্যে না, ধনের জন্যে না, রাজকন্যারই জন্যে। এই রাজকন্যার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাটবাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে যেখানে কাজের কল্পলতায় ফুল ধরে। যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারই প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ কোনো সমঝদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, 'তুমি কেন'।

আমি ঠিক এইভাবেই ইতিহাসচর্চার অপরিচিত, অমসৃণ পথে ঢুকে পড়েছি, একান্তই নিজের ইচ্ছায়। আমি সওদাগর-পুত্রের মতো প্রশ্ন তুলব না, দেশটা শেখ মুজিব কত টাকায় ভারতের কাছে বেঁচে দিয়েছেন এবং বিক্রি-বাট্টার দলিলটা কার কাছে আছে। কোটালপুত্রের মতো আমি গোপনে তালাশ করব না, জিয়াউর রহমান আইএসআইয়ের কাছ থেকে কী ফন্দি-ফিকির নিয়ে এসেছিলেন এবং এ জন্য তাঁকে কত মাসোহারা দেওয়া হতো। আমি দেখার চেষ্টা করব, যা দৃশ্যমান। ইতিহাস নির্মাণের জন্য আমি যে দেয়াল তৈরি করতে যাচ্ছি, তার একটি একটি করে ইট আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে দৃশ্যমানতা থেকে। যা পড়েছি, যা দেখেছি, যা শুনেছি, অনুসন্ধান করে যা পেয়েছি, যাচাই-বাছাই করে আমি তা-ই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যাঁরা 'দলদাস' এবং গুজব ছড়িয়ে কিংবা কেচ্ছা বানিয়ে নিজের জন্য একটা পাকা আসন তৈরি করতে চান, আমার লেখা তাঁদের হতাশ করবে।

সম্প্রতি আমি বাংলাদেশের নিকট অতীতের ঘটনাবলি নিয়ে লিখতে আগ্রহী হই। ভেবেছি, রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাস থাকা দরকার। কাজটা পরিশ্রমের এবং সময়সাপেক্ষ। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নির্মোহ হওয়া। প্রথমেই যে কাজটিতে হাত দিলাম, তা হলো 'জাসদ'। তো লেখাটা বই আকারে ছাপা হলো—*জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*। লেখাটা অনেকেই পছন্দ করলেন, কেউ কেউ গালাগালও দিলেন। এটাও লেখক হিসেবে আমি পরম প্রাপ্তি বলে মনে করি। অনেকেই বইটি পড়ে বলেছেন, এত কিছু তো আগে জানতাম না। আসলে আমরা অনেক কিছুই জানি না, অথবা যেটুকু অন্যকে জানালে নিজের সুবিধে হবে, শুধু সেটুকুই জানাই। একজন ইতিহাসবিদ বা গবেষকের কাজ হলো গুম হয়ে যাওয়া সত্যকে খুঁজে বের করা। পাঠকই চূড়ান্ত রায় দেবেন, তিনি কতটুকু নেবেন আর কতটুকু ফেলে দেবেন।

জাসদের ওপর বইটি ছাপা হওয়ার পর ভাবলাম, নতুন কিছু একটা শুরু করা যাক। বিএনপি একটা বড় দল এবং এটা নিয়ে লেখা দরকার। এই পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত বিএনপি সম্পর্কে কিছু লেখা হলো।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণে তেমন পটু নয়। বিএনপির ক্ষেত্রে এটা দারুণভাবে প্রযোজ্য। অনেক বিষয়ের

ওপর তথ্য জোগাড় করতে আমাকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে। তবে লিখিত রচনাকেই আমি প্রধান সূত্র হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি সাধ্যমতো। সূত্রে ব্যবহৃত ব্যক্তির নাম, পদ-পদবি এবং বানানরীতি যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে 'মেজর' হয়তো হয়ে গেছেন 'ক্যাপ্টেন' এবং 'ক্যাপ্টেন' হয়ে গেছেন 'লেফটেন্যান্ট'। বিষয়টার ব্যাপ্তি এবং মাত্রা এত বেশি যে অল্প কথায় একটা মাত্র বইয়ে তা শেষ করা সম্ভব নয়। আমিও পারিনি। হয়তো অনেক ঘটনা বা বিষয় বা চরিত্র বাদ পড়ে গেছে, কিংবা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা যায়নি। আমার কথা হলো, আমি শুরু করলাম মাত্র। আরও অনেকেই লিখবেন এ দলটিকে নিয়ে। তারপর একদিন হয়তো দলটির পরিপূর্ণ ইতিহাস লেখার সমস্ত উপকরণ জোগাড় করা সম্ভব হবে।

লেখাটিকে যত দূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ইতিহাসের কিছু বাঁকের প্রসঙ্গ এসেছে। সে জন্য প্রাসঙ্গিক কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। বইয়ের শেষে তাঁদের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। বইটি লিখতে নানাজনের কাছ থেকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা পেয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ ছবি, তথ্য ও দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে করপোরাল (অব.) আবদুল মজিদ, মেজর (অব.) মনজুর কাদের, মাহফুজ উল্লাহ, অধ্যাপক নেহাল করিম, জাহেদ করিম, আরিফ মঈনুদ্দীন, মতিউর রহমান চৌধুরী অন্যতম। এ ছাড়া বিজন সরকার, শিমুল বিশ্বাস, রেজাউল হক মোশতাক, সালিম সামাদ, মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, আয়েশা পারুল ও মো. কামালউদ্দিন মোল্লা নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ছবিগুলো সমসাময়িক পত্রিকা, ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও ইন্টারনেট থেকে নেওয়া।

লিখতে গেলে ভুলভ্রান্তি হতে পারে। এই বইতেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। আশা করছি, সহৃদয় পাঠক কোনো ত্রুটি পেলে ধরিয়ে দেবেন।

মহিউদ্দিন আহমদ
mohi2005@gmail.com

প্রেক্ষাপট

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং পঁচাত্তরের আগস্ট হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতির ইতিহাসের দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পঁচাত্তরের আগস্টের পরের কয়েক মাসের ঘটনাবলি এ দেশের রাজনীতির ব্যাকরণ পাল্টে দিয়েছে। মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে নতুন কুশীলব। রাজনীতির সমীকরণ বদলে গেছে। এ সময় সেনাবাহিনী রাজনীতির ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসে এবং পালাবদলের অনুঘটক হিসেবে নেপথ্যে থেকে সামনে চলে আসেন সেনাবাহিনীর প্রধান জিয়াউর রহমান। ক্ষমতার রাজনীতির অবধারিত সূত্র অনুযায়ী সেনাশাসকের রূপান্তর ঘটে রাজনীতিবিদ হিসেবে। এর ধারাবাহিকতায় তৈরি হয় নতুন একটা রাজনৈতিক দল—বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, সংক্ষেপে বিএনপি (বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি)।

বিএনপি বাংলাদেশের রাজনীতিতে হঠাৎ এসে পড়লেও এর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল আগেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল বলে যেরকম ঢাকঢোল পেটানো হয়, তা পুরোপুরি সত্য নয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের অনুচরদের নির্যাতন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে সবাই এককাট্টা ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিভাজন ছিল। মুক্তিযোদ্ধারাও নানান শিবিরে বিভক্ত ছিলেন। এমনকি পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে এসে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ওই সময়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমন্বয়টা ভালো ছিল না। ওপরে ওপরে একটা ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা বজায় থাকলেও ভেতরে ভেতরে ছিল হতাশা, দ্বন্দ্ব ও ক্ষোভ। 'রণাঙ্গনের' মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে 'থিয়েটার রোডের' মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বন্দ্ব ছিল প্রায় প্রকাশ্য। বলা চলে, মুক্তিযুদ্ধের সময় নানা ঘটনা ও প্রবণতার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল একধরনের গোষ্ঠীগত মনস্তত্ত্ব, যা ধীরে ধীরে ডালপালা মেলতে থাকে এবং একসময় তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। বিএনপির জন্ম ও উত্থানকে বুঝতে হলে তাই আমাদের ফিরে যেতে হবে একাত্তরের আগুনঝরা দিনগুলোতে।

জলিল : স্বাধীন দেশের প্রথম রাজবন্দী

এম এ জলিল নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। জন্ম থেকেই পিতৃহীন, নানার বাড়িতে বেড়ে ওঠেন। লড়াই করে নিজের জায়গা করে নিতে হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া বাহিনীতে কমিশন পান। সবে মেজর হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ছুটিতে বরিশালে নিজের বাড়িতে এসেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে স্থানীয় তরুণদের নিয়ে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান। অস্থায়ী সরকার তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত করে। সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে একমাত্র তিনিই দেশের ভেতরে ঢুকে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতেন। পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগকারী তিনিই একমাত্র সেনা কর্মকর্তা, যাঁকে হারিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ (পরবর্তী সময়ে সেনাপ্রধান) লে. জেনারেল গুল হাসান খান আফসোস করে বলেছিলেন, 'ভালো অফিসার। ১ নম্বর সাঁজোয়া ডিভিশনে আমার সঙ্গে কাজ করেছে। বিদ্রোহীদের নেতৃত্বদানের জন্য সে দলত্যাগ করেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল।'[১]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেজর জলিল বরিশাল অঞ্চলে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধের সময় নানা ঘটনায় বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর মনে ক্ষোভ তৈরি হয়। জলিল তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

> অস্ত্রসংকট আমাকে সব সময় ভাবিয়ে তুলত। তাই সমগ্র ৯ নং সেক্টরকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা চালু রেখে আমি ২১ এপ্রিল কয়েকটি মোটর লঞ্চ সহকারে ভারতের উদ্দেশে রওনা করি। প্রধান লক্ষ্যই ছিল ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা। বরিশাল সদর থেকে নির্বাচিত জনপ্রিয় সংসদ সদস্য (প্রাদেশিক) জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ইতিপূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে বরিশালে ফেরত এসে আমাকে জানালেন যে লে. জেনারেল অরোরা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সর্বাধিনায়ক এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালি সামরিক অফিসারদের কাছে অস্ত্রের সাহায্য প্রদান করতে প্রস্তুত আছেন। এ তথ্য লাভের মাত্র এক দিন পরই আমি কিছু মুক্তিযোদ্ধা সহকারে ভারত অভিমুখে রওনা হয়ে প্রথমে পৌঁছাই বারাসাত জেলার হাছনাবাদ বর্ডার টাউনে। ওই অঞ্চলের বিএসএফের কমান্ডার শ্রী মুখার্জি...সরাসরি লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিয়ে গেলেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে তাঁর হেডকোয়ার্টার। তিনি আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারলেন না। সাক্ষী-প্রমাণ দাবি করলেন আমার। তখনই আমাকে সদ্য ঘোষিত স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন এবং সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেবের নাম নিতে হয়েছে।

আমি জেনারেল অরোরাকে অতি স্পষ্ট ভাষায় একজন বিদ্রোহীর সুরে জানিয়ে দিলাম যে আমার অস্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই।...জেনারেল রীতিমতো চমকে ওঠেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর সিকিউরিটি এবং ইন্টেলিজেন্সের লোকদের কাছে হাওয়ালা করেন। চার দিন বন্দী অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়—বিশেষ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। আমার দ্রুত মুক্তি এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করার লক্ষ্য সামনে রেখেই আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে কিছুটা তথ্য প্রদান করি। পূর্বাঞ্চলের 'চিফ স্টাফ' জেনারেল জ্যাকব আমার দেওয়া তথ্য বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং আমাকে যেকোনো ধরনের অস্ত্রপাতি জোগান দেওয়ার আশ্বাসও প্রদান করেন। এভাবে...'ফোর্ট উইলিয়ামের অন্ধকূপ' থেকে আমি মুক্তি পেয়ে জনাব তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই।...

স্বাধীনতাযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেব একজন সম্মানিত বন্দীর জীবন যাপন করা ব্যতীত আর তেমন কিছুই করার সুযোগ ছিল না তাঁর। সেক্টর পরিদর্শন করা তো দূরের কথা, তাঁর তরফ থেকে লিখিত নির্দেশও তেমন কিছু পৌঁছাতে পারেননি সেক্টর কমান্ডারদের কাছে।...

নভেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শিবিরগুলোর দায়িত্ব সরাসরি নিয়ে নিতে চেষ্টা করে। আমার সেক্টরে ততটা সুবিধা করতে না পারলেও কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার নিয়োগ করেছিল। ট্রেনিং শিবিরের অস্ত্রগুলোও প্রত্যাহার করে নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। তখনই শুরু হয় বাগ্‌বিতণ্ডা এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটতে আরম্ভ করে। আমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করেই অধিকাংশ অস্ত্র-বারুদ ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, নৌ কমান্ডো নূর মোহাম্মদ বাবুল, ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর, নৌ কমান্ডার বেগের হাতে তুলে দিই এবং তাঁদেরকে ভারতীয় ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও সজাগ করে দিই। ভারত মুক্তিযুদ্ধে সব অস্ত্র দিয়েছে এ কথা সত্য নয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অর্থেও প্রচুর অস্ত্র ক্রয় করা হয়েছিল। সেসব অস্ত্র-সম্পদ মুক্তিযুদ্ধেরই সম্পদ ছিল।[২]

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর ৩১ ডিসেম্বর জলিল ভারতীয় বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। ভারতীয় বাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে লুটপাটের অভিযোগ আনে। জলিলের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি ছিলেন ষড়যন্ত্রের শিকার। ভারতীয় বাহিনীর লুটপাটের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চকিত ছিলেন বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এক মাস তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাঁর খবর না পেয়ে তাঁর মা ঢাকায় আসেন এবং সব জায়গায় তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রী এই বলে তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে জলিল নির্দোষ এবং শিগগিরই তিনি ছাড়া পাবেন।[৩]

ডিসেম্বরে খুলনা শত্রুমুক্ত হওয়ার পরের ঘটনাবলি জলিলকে খুবই ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত করেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, ভারতীয় বাহিনী স্বাধীন বাংলাদেশে দখলদার বাহিনীর মতোই আচরণ করছে। ওই সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে জলিল বলেছেন :

> ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের সূত্র ধরেই বলা যায়...ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক লুণ্ঠন প্রক্রিয়া...বিজিত ভূখণ্ডে বিজয়ী সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্পদ লুটতরাজ করাকে আনন্দ-উল্লাসেরই স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ বলে বিবেচনা করা হয়।...
>
> আমি সেই 'মোটিভেটেড' লুণ্ঠনের তীব্র বিরোধিতা করেছি—সক্রিয় প্রতিরোধও গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। লিখিতভাবেও এই লুণ্ঠনের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন, কর্নেল ওসমানী এবং ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের সর্বাধিনায়ক লে. জেনারেল অরোরার কাছে জরুরি চিঠিও পাঠিয়েছি। তাজউদ্দীন সাহেবের পাবলিক রিলেশনস অফিসার জনাব আলী তারেকই আমার সেই চিঠি বহন করে কলকাতায় নিয়েছিলেন।...
>
> আমার সাধের স্বাধীন বাংলায় আমিই হলাম প্রথম রাজবন্দী। ৩১ ডিসেম্বর সকাল ১০টা সাড়ে ১০টায় আক্রমণকারী বাহিনীর হাতে আমি বন্দী হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আসল রূপের প্রথম দৃশ্য দেখলাম।...যশোর সেনাছাউনির অফিসার কোয়ার্টারের একটা নির্জন বাড়িতে আমাকে বেলা ১১টায় বন্দী করা হয়।[৪]

জলিলকে সামরিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। এই আদালতের চেয়ারম্যান ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল লে. কর্নেল আবু তাহের।

ট্রাইব্যুনালে জলিলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সরকার খুলনা জেলে আটক সেখানকার সাবেক ডেপুটি কমিশনারকে নিয়ে এসেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সহযোগী ছিলেন। সাক্ষীর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার কথা জেনে লে. কর্নেল তাহের তাঁকে আদালতকক্ষ থেকে বের করে দেন। তাহের বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডারের বিরুদ্ধে কোনো স্বাধীনতাবিরোধীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ট্রাইব্যুনাল জলিলকে বেকসুর খালাস দেয়।[৫]

জলিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনি আর সেনাবাহিনীতে চাকরি করবেন না। ২৮ জুলাই (১৯৭২) তিনি সেনাপ্রধানের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। এর আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানান। পদত্যাগপত্রে জলিল উল্লেখ করেন, সামরিক বাহিনীতে চাকরির শর্ত পূরণ করা মানসিকভাবে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

MAJOR M.A. JALEEL
(Ex - 12 CAVALRY)

DATED : 23. 7. 72

PLACE : DACCA.

To

The Chief of Staff,
Bangladesh Armed Forces
DACCA.

Sub: Retirement/Officers

Reference telephone talks between you and me and also regarding my verbal talk with Bangabandhu - the Prime Minister.

1. As it shall transpire from the documents administered by me in the month of July'71, I, hereby, once again shall maintain that I have never been a member of Bangladesh Armed Forces, neither did I show my keeness or willingness to continue my services in the Bangladesh Armed Forces even previously, for I feel I, temperamentally shall not meet the requirements of military services anywhere and anymore, albeit I hold high esteem for the same.

2. I am sure you are quite conversant with the latest developments of my mind, which to be repeated again stands as such - I desire to devote myself widely and largely for the social build up and welfare of my beloved country.

3. Therefore, please, do consider my past activities in the military service and also if any service that you feel I have rendered during the liberation war of Bangladesh and oblige me with the retirement order at the earliest.

4. I can assure you that I shall ever remain a well-wisher of my beloved Army - the Army I would always like to see flourish with the flavour of honour and dignity. I cherish you all the prosperity.

(MAJOR M.A. JALEEL)

মেজর জলিলের পদত্যাগপত্র

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম অভিযুক্ত এবং পাকিস্তান নৌবাহিনীর সাবেক লিডিং সি-ম্যান সুলতানউদ্দিন আহমদের নাখালপাড়ার বাসায় জলিলের যাতায়াত ছিল। সুলতানউদ্দিন জলিলের নেতৃত্বে নবম সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। একদিন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে শেখ জামাল জলিলের খোঁজে ওই বাসায় আসেন এবং জলিলকে গণভবনে নিয়ে যান।[৬] প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডারদের সন্তানের মতো দেখতেন। তিনি জলিলকে সেনাবাহিনীতে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করে বলেন, 'তুমি চলে গেলে আমার ট্যাংক চালাবে কে?' জলিলের জবাব ছিল, 'আপনার তো ট্যাংকই নেই।'[৭]

জলিল স্বাধীন বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল

জাসদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। ৩১ অক্টোবর (১৯৭২) তিনি জাসদের যুগ্ম আহ্বায়ক নিযুক্ত হন এবং 'সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক ও পুতুল সরকারকে উৎখাত করার' কাজে শামিল হওয়ার ঘোষণা দেন।[৮] ২৩ ডিসেম্বর (১৯৭২) অনুষ্ঠিত জাসদের সম্মেলনে তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন।

সরকারবিরোধী আন্দোলনের একপর্যায়ে জলিল ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ ঢাকায় গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের আগে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কীভাবে সরকারের পতন ঘটানো যায়।

গোপন চক্র

একাত্তরের মার্চে ঢাকায় যখন রক্ত ঝরছে, বেলুচিস্তানের কোয়েটায় তখন কয়েকজন বাঙালি সেনা কর্মকর্তার মধ্যে ছিল অন্য রকম ভাবনা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৬ ডিভিশনের দপ্তর ছিল কোয়েটায়। এই ডিভিশনের গোলন্দাজ বাহিনীর ৬২ নম্বর ফিল্ড রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন শরিফুল হক ডালিম ওই সময়ের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর একটি লেখায়।[৯] ডালিমের কথাগুলো উঠে এসেছে বি জেড খসরুর গবেষণাগ্রন্থে।[১০]

ডালিমের বর্ণনায় খসরুর উদ্ধৃতিতে জানা যায়, ওই সময় কোয়েটায় অন্যান্য রেজিমেন্ট ও ব্যাটালিয়নে বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে আরও ছিলেন লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী। এ ছাড়া কর্নেল কাজী গোলাম দস্তগীর ও মেজর আবু তাহেরও ওই সময় কোয়েটায় ছিলেন। প্রশিক্ষণের সময়টাতে তাঁদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হতো। এর ফলে তাঁরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হন।

৩০ মার্চ একটা বিদেশি বেতার সংবাদে তাঁরা জানতে পারেন, ২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশে কী ভয়ানক রক্তারক্তি ঘটেছে। তাঁরা আরও জানতে পারেন, ১৬ ডিভিশনকে বিমানে করে ঢাকায় পাঠানো হবে। তাহের, ডালিম, মতি ও নূর ভাবলেন, এর ফলে তাঁদের ঢাকায় যাওয়ার সুযোগ হবে। কিন্তু তাঁদের আশা ভঙ্গ হলো। সেনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল, কোনো বাঙালিকে ঢাকায় পাঠানো হবে না। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, পালাবেন।

তাহের হঠাৎ অ্যাবোটাবাদে বদলি হয়ে যান। যাওয়ার আগে তিনি ডালিম ও নূরকে পালানোর পরামর্শ দেন। ১৭ এপ্রিল ডালিম, মতি ও নূর গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকেন। ২০ এপ্রিল তাঁরা হাজির হন দিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিসে। তাঁরা তিনজনই হচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রথম।

দিল্লিতে তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল তিক্ত। প্রথমে তাঁদের মেজর জেনারেল সুজন সিং উবানের হাওলায় দেওয়া হয়। ভারতীয় গোয়েন্দারা চার দিন ধরে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। উবান তাঁদের বললেন, বাংলাদেশ সরকারের উঁচু পর্যায়ের একটা দল শিগগিরই দিল্লি আসবে এবং তাঁদের তিনজনকে ওই দলের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হবে। কয়েক দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান কর্নেল এম এ জি ওসমানী আসেন। তাজউদ্দীন তাঁদের বলেন, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাঁদের আরও দুই সপ্তাহ দিল্লিতে থাকতে হবে। এই সময়ে ভারতীয় কয়েকটি সংস্থা তাঁদের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে ধারণা দেবে এবং তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হবে। এটা শুনে তাঁদের মনে হলো, 'এটা একটা ষড়যন্ত্র এবং বাংলাদেশ সরকার চলছে ভারতের নির্দেশে, ভারত এই মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে তার নিজস্ব ধারণা তাঁদের গেলাতে চায় এবং বাংলাদেশকে একটা তাঁবেদার রাষ্ট্র বানাতে চায়।'

দিল্লি বিমানবন্দরের কাছে একটা সেনা ক্যাম্পে তাঁদের করণীয় বুঝিয়ে দেওয়া হয়। জেনারেল উবান বলেন, আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের মধ্য থেকে বাছাই করা এক লাখ তরুণের একটা বিশেষ গেরিলা বাহিনী তৈরি করা হবে এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করবেন। এর নাম হবে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' এবং উবান হবেন এর সমন্বয়কারী। বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছা ডালিম, নূর ও মতি এই বাহিনী গড়ে তুলতে উবানকে সাহায্য করবেন।

কলকাতায় এসে তাঁরা তিনজন ওসমানীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব খুলে বলেন। বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ) প্রসঙ্গে ওসমানী বলেন, তিনি এসবের কিছুই জানেন না। পরদিন ওসমানী তাজউদ্দীনের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলাপ করলে তাজউদ্দীন জানান, তিনিও এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। ওসমানী ডালিম ও মতিকে দুটো সেক্টরে পাঠালেন এবং নূরকে তাঁর এডিসি নিয়োগ করলেন।

বিএলএফ (পরে নাম হয় মুজিব বাহিনী) আলাদাভাবে তৈরি হয়েছিল। এই বাহিনী নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে যথেষ্ট টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। বিএলএফ তৈরির মূল দায়িত্ব পালন করেন আওয়ামী লীগের চার যুবনেতা—শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। তাঁরা তাজউদ্দীন আহমদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা আওয়ামী লীগের নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ আবদুল আজিজসহ কয়েকজনের সমর্থন পান।

যুবনেতাদের ধারণা ছিল, শেখ মুজিব আর জীবিত নেই এবং তাজউদ্দীন চাইছেন ক্ষমতা হাতের মুঠোয় পুরতে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে যুবনেতারা বোঝাতে পেরেছিলেন যে তাঁরা শেখ মুজিবের প্রতি অনুগত এবং তাঁদের দিয়ে একটা বাহিনী তৈরি করলে তা ভারতের জন্য একটা স্থিতিশীল প্রতিবেশী তৈরি করতে সাহায্য করবে।[১১]

তাজউদ্দীন ও ওসমানী বিএলএফকে (মুজিব বাহিনী) বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেক চেষ্টা করেন। অবশ্য তাতে কোনো কাজ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ওসমানীর নিজের কিছু চিন্তাভাবনা ছিল। তিনি এ ব্যাপারে ভারতের নাক গলানো পছন্দ করতেন না। মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সরাসরি যোগাযোগ রাখতে চাইত। কলকাতায় বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে ওসমানী সাফ জানিয়ে দেন, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের খবরদারি বন্ধ না হলে তিনি সামরিক বাহিনীর প্রধানের পদ ছেড়ে দেবেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'যদি এটা ভারতের যুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে মুক্তিযোদ্ধারা ইসলামাবাদ থেকে দিল্লিতে রাজধানী সরিয়ে আনতে সাহায্য করছে মাত্র।' তিনি সবাইকে অবাক করে একটা ইস্তফাপত্র জমা দিয়ে সভা থেকে বেরিয়ে যান।'[১২]

১১ জুলাই বসল সেক্টর কমান্ডারদের সভা। প্রধান অতিথি তাজউদ্দীন, প্রধান বক্তা হিসেবে ওসমানীর থাকার কথা। কিন্তু তিনি অনুপস্থিত। বার্তা পাঠালেন, তিনি আসতে পারবেন না। সভায় গুঞ্জন উঠল। তাজউদ্দীন চেষ্টা করলেন সবাইকে শান্ত রাখতে; বললেন, ওসমানীর ওপর কমান্ডারদের আস্থার অভাব থাকায় তিনি পদত্যাগ করেছেন। এই কথা শুনে সভায় হইচই হলো। কেউ কেউ জানতে চাইলেন, এই খবরের সূত্র কী, তা প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হবে।[১৩]

কমান্ডারদের মধ্যে মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর এম এ জলিল, মেজর খালেদ মোশাররফ ও উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই ওসমানীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব চালিয়ে যেতে বলেন। ওসমানী পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নিতে রাজি হন। কমান্ডাররা এরপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীনের কাছে যান এবং ওসমানীর পদত্যাগের কথিত কারণের সূত্র প্রকাশ করার জন্য তাজউদ্দীনকে চাপ দেন। তাজউদ্দীন বলেন, তিনি নিজস্ব সূত্রে এটা জেনেছেন যে কোনো কোনো কমান্ডার ওসমানীর ওপর খুশি নন। জিয়াউর রহমান তখন বলেন, ওসমানীর ওপর তাঁদের পুরোপুরি আস্থা আছে এবং এই পদে কোনো পরিবর্তন আনা হলে তাঁদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাজউদ্দীনের সঙ্গে জিয়ার কথোপকথন ছিল এরকম :

জিয়া : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, শুধু কমান্ডারদের পক্ষ থেকে নয়, সমগ্র মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে, প্রধান সেনাপতি হিসেবে কর্নেল ওসমানীর ওপর আমাদের শুধু পুরোপুরি আস্থা আছে তা-ই নয়, তিনি আমাদের সকলের সম্মানীয়। আপনি যদি তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে সরিয়ে অন্য কাউকে এই পদে বসানোর চিন্তা করে থাকেন, তাহলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা এটা মেনে নেবে না। অস্থায়ী সরকারের প্রধান হিসাবে যে কাউকে সেনাপ্রধান করার ক্ষমতা আপনার আছে। কিন্তু এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অনুগ্রহ করে সতর্কতার সঙ্গে এটা ভেবে দেখুন।

তাজ : ওসমানী নিজেই পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি যদি এটা প্রত্যাহার করে নেন, তাহলে সরকারের তাতে আপত্তি থাকবে না।

জিয়া : এটা ঠিক যে তিনি নিজেই ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু সকালে আপনি যে কারণটি বলেছিলেন, আমরা মনে করি এটা ঠিক না। আমরা অবশ্য তাঁর কাছ থেকে জেনে নেব, কেন তিনি পদত্যাগ করেছেন। আপনাকে অনুরোধ করছি, স্যার, যে অনাস্থার কথা আপনি বলছেন, আগামীকাল সকালে সম্মেলনে আপনি বলবেন যে এটা ভিত্তিহীন ও অসত্য। আপনি জানেন যে সকল কমান্ডার এবং মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল ওসমানীকেই তাদের প্রধান হিসাবে চায়, অন্য কাউকে নয়। আমাদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনি কর্নেল ওসমানীকে তাঁর পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করবেন। বর্তমান সংকট থেকে বেরিয়ে আসার এটাই সবচেয়ে ভালো পথ।[১৪]

তাজউদ্দীন জিয়ার প্রস্তাব মেনে নেন। সভায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম চুপচাপ বসে ছিলেন। তাজউদ্দীন তাঁর কথা রেখেছিলেন। ওসমানী পরদিন তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন এবং সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।[১৫]

১২ জুলাই দ্বিতীয় দিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, কর্নেল এম এ জি ওসমানী, লে. কর্নেল এম এ রব, গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার, মেজর কাজী নূরুজ্জামান, মেজর সি আর দত্ত, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কে এম সফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর মীর শওকত আলী, উইং কমান্ডার এম কে বাশার, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর এম এ জলিল এবং ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম।[১৬]

সেক্টর কমান্ডার সফিউল্লাহর মতে, জিয়া ওসমানীর অব্যাহতি চেয়েছিলেন। কেননা, ওসমানীকে জিয়া একজন দুর্বল নেতা মনে করতেন। জিয়া চেয়েছিলেন একটা সামরিক পরিষদ যুদ্ধ পরিচালনা করুক। সেক্টর কমান্ডার খালেদ

মোশাররফ ছিলেন ওসমানীর পক্ষে। খালেদ সম্মেলনে বলেছিলেন, কেউ যদি ওসমানীকে সরাতে চায়, তাকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বাধা দেওয়া হবে।[১৭]

মেজর (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল ও সেনাপ্রধান) সফিউল্লাহ এ প্রসঙ্গে অন্য রকম বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যটি এরকম :

> ১০ জুলাই মুজিবনগরে সেক্টর কমান্ডারদের এক দীর্ঘস্থায়ী বৈঠক একটি অপ্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু হয়। বাংলাদেশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ করেছেন। বৈঠকের সভাপতি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। এ ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ আমাদের জানা ছিল না। তবে অনুমিত হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমান্ড গঠন নিয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য এর জন্য দায়ী। প্রধান সেনাপতি মুজিবনগরে স্থাপিত সদর দপ্তর থেকে তাঁর কমান্ড পরিচালনা করছেন। পূর্ব সীমান্তের আগরতলায় একটি উচ্চপর্যায়ের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছে। এর চিফ অব স্টাফ হচ্ছেন লে. কর্নেল আবদুর রব, যাঁর যুদ্ধ পরিচালনার কোনো দায়িত্ব নেই।
>
> মেজর কাজী নূরুজ্জামান যখন কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আশ্রমবাড়িতে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন তখন তাঁর মতে এবং তাঁর সমমনা আরও কিছু অফিসারের মতে, মুজিবনগর থেকে কর্নেল ওসমানীর পক্ষে একাকী তাবৎ যুদ্ধাভিযান কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা বাস্তবিক অসম্ভব ব্যাপার। এ কারণে তাঁর ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অন্যদের দেওয়া উচিত বলে অনুভূত হয়। মেজর কাজী নূরুজ্জামান তাই পরামর্শ দেন যে, সিনিয়র অফিসারদেরসহ একটি 'ওয়ার কাউন্সিল' গঠিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে, সারা বাংলাদেশকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা সমীচীন হবে, যথা : পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চল। এসব অঞ্চলের কমান্ডারদের যাঁর যাঁর অপারেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে অবাধ অধিকার দিতে হবে। এও মন্তব্য করা হয় যে, কর্নেল ওসমানী, বর্তমান স্থাপনায়, মুজিবনগর থেকে যথাযথ কমান্ড প্রয়োগ করছেন না। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন মেজর জিয়া, মেজর খালেদ, মেজর নূরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন রফিক এবং আমি নিজেসহ আরও কয়েকজন।
>
> এসব কথা বাঁকা করে এবং বিকৃত অর্থে তাঁর কানে যখন পৌঁছায়, তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমরা সবাই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিই যে কর্নেল ওসমানী প্রধান সেনাপতি থাকবেন এবং তাঁকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানানো হবে। দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে কর্নেল ওসমানীকে ডাকা হয়। তিনি অনুরুদ্ধ হয়ে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। অতঃপর তিনি সব সেক্টর কমান্ডারের বৈঠক পরিচালনা করেন।[১৮]

ডালিমের বর্ণনায় জানা যায়, তিনি ও নূর ওই সময় থেকেই সমমনা কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধে 'ভারতের খবরদারি' নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা ছিল এবং তাঁরা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার

সিদ্ধান্ত নেন। এর ধারাবাহিকতায় সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা গোপন চক্র গড়ে ওঠে। ডালিম এটাকে তাঁর লেখায় 'সেনা পরিষদ' নামে উল্লেখ করেছেন।[১৯] এই নামে সেনাবাহিনীতে কোনো গোষ্ঠী ছিল বলে জানা যায় না। ধারণা করা হয়, সমমনা সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগের একটা অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ওই সময় শুরু হয়েছিল। সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের এই বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন ডালিম :

> কনফারেন্সের সুযোগে অনেকের সঙ্গেই আমাদের মতবিনিময় হয় ভারতীয় নীলনকশার প্রভাব ও পরিণতি নিয়ে। যাদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম, শুধু তাদের সঙ্গেই গোপনে আলোচনা করা হয়েছিল এই অতি স্পর্শকাতর বিষয়টি। মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন জলিল এবং উইং কমান্ডার বাশার এর অন্যতম। পরবর্তী পর্যায়ে মেজর মঞ্জুর, ক্যাপ্টেন তাহের, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন, ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার, ক্যাপ্টেন হাফিজ, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন রশিদ, ক্যাপ্টেন মহসীন, লেফটেন্যান্ট হুদা, লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর, লেফটেন্যান্ট নূরন্নবী ছাড়াও যাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, তাদের সঙ্গেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। পর্দার অন্তরালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন মহল, অস্থায়ী সরকার ও ভারতীয় প্রশাসনের চক্রান্ত ও স্বার্থ নিয়ে আলোচনার ফলে কতগুলো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ঐকমত্যের সৃষ্টি হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ভারত সরকারের নীতি এবং মুজিবনগর সরকারের অযোগ্যতাকে নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করা ঠিক হবে না। একই সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্গঠন করে তাদেরকে সামরিক এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে চক্রান্তের বিভিন্ন দিক।...শুধু ইসলামাবাদ থেকে দিল্লিতে রাজধানী বদলের জন্য যুদ্ধ করছি না আমরা, প্রয়োজনে পাকবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের।[২০]

১৯৭৩ সালের শেষ দিকে 'এই চক্রের' চিন্তা ছিল, 'কিছু একটা করতে হবে—কিন্তু কীভাবে, তা কেউ বলতে পারছে না'। মেজর রশিদ ও মেজর ফারুক ১৯৭৩ সাল থেকেই পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছিলেন, যাতে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোনো যায়। চূড়ান্ত আঘাতটি আসে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট।[২১]

শাফায়াত : ওসমানী ছিলেন অসহিষ্ণু

মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্নেল হিসেবে অবসরে যান। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি সিলেটের একটি আসন থেকে আওয়ামী লীগের টিকিটে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য

নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ওসমানীকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে। মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় ও পরে তাঁর ভূমিকা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। কেমন মানুষ ছিলেন তিনি? ওসমানীর একসময়ের সহকর্মী ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাবেক চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনালের গুল হাসান খানের বর্ণনায় ওসমানী সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় :

> আমার চাইতে চাকরিতে সিনিয়র হলেও ওসমানী ষাটের দশকে আমি ডিএমও থাকাকালে আমার ডেপুটি ছিলেন। তাঁকে প্রমোশন দেওয়া হয়নি। অন্যেরা তাঁকে ডিঙিয়ে যায়। এতে স্বভাবতই পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের বিরুদ্ধে তাঁর মন ছিল তিক্ততায় ভরা। ওসমানী আগে জেনারেল পীরজাদার অধীনেও কাজ করেছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই আমি টের পাই যে ওসমানী সেই লোকদের একজন, যাঁদের কাছে সময়ের কোনো মূল্য নেই। তাই নিজের ভালোর জন্য আমি তাঁকে আস্তে আস্তে মূল কাজ থেকে সরিয়ে আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাপারে নির্বিবাদে আত্মনিয়োগ করার প্রচুর সুযোগ দান করি। ওঁদের মধ্যে তিনি টাইগার বাবা (পাপা টাইগার) নামে পরিচিত ছিলেন। কিছু সময়ের জন্য ওসমানী আমার একজন ভালো বন্ধুতে পরিণত হন। তাঁর কয়েকটা চমৎকার গুণ ছিল। আমি তাঁর পক্ষে ভালো কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট দিয়েছিলাম। সেগুলো এত বেশি বয়সে তাঁর চাকরির ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি ঘটাতে পারার কথা ছিল না।...১৯৬৬ সালে আমি সেনা হেডকোয়ার্টার থেকে চলে যাওয়ার পর ওসমানী একজন কর্নেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। অথচ ওসমানী মনে করতেন তাঁর ফিল্ড মার্শালের পদ পাওয়া উচিত ছিল।[২২]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রধান সেনাপতি হিসেবে তাঁর নিযুক্তি স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করা হয়। পদ ও বয়সের কারণে সবাই তাঁকে মান্য করতেন। কিন্তু ওসমানী সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারতেন না। মুক্তিযুদ্ধের সময় গড়ে ওঠা জেড ফোর্সের অন্তর্গত তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিলের পর্যবেক্ষণ এখানে বেশ প্রাসঙ্গিক। একটি সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে শাফায়াত বলেন :

> ওসমানীকে এ সময় বেশ অসহিষ্ণু মনে হতে লাগল। কোনো বড় ধরনের সমস্যা দেখলেই তিনি শুধু বলছিলেন, 'আমার পক্ষে এত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আই উইল রিজাইন।' পুরো সফরে তিনি প্রায় কুড়িবার পদত্যাগের হুমকি দিলেন। প্রায় সব কটি ক্যাম্পের কমান্ডার এবং কোনো কোনো জায়গায় স্থানীয় সাংসদদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করলেন ওসমানী। বসিরহাটের কাছে একটি ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন জলিলের (পরে মেজর অব., জাসদ নেতা) সঙ্গে দেখা হয়। ওসমানী জলিলকে রীতিমতো অশালীনভাবে তিরস্কার করলেন।...আমার

তখন যুদ্ধক্ষেত্র আর কলকাতার নিরাপদ জীবনের ফারাকটা বেশি করে মনে পড়েছিল। মনে হলো, ওসমানী সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলে হয়তো জলিলকে এভাবে দোষারোপ এবং তিরস্কার করতে পারতেন না।[২৩]

শাফায়াত জামিলের ভাষ্য অনুযায়ী, ওসমানী জিয়াউর রহমানকে পছন্দ করতেন না। জিয়া 'জেড ফোর্সের' অধিনায়ক ছিলেন বলে তাঁর অধীন কর্মকর্তাদের কেউ কেউ ওসমানীর কোপানলে পড়েছিলেন। বীরত্বসূচক পদক বিতরণের সময় এর শোধ নেন তিনি। তৃতীয় বেঙ্গলের সদস্যদের ত্যাগ ও অবদানকে ওই সময় যথেষ্ট মূল্যায়ন করা হয়নি। শাফায়াতের মনে হয়েছিল :

> একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ, যা নাকি জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেখানে কেবল কিছুসংখ্যক যোদ্ধাকে খেতাব দেওয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে, সেটা পর্যালোচনা এবং সেই সঙ্গে পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা বিভাজিত হয়েছিল। অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ ঘটনা অনুদ্‌ঘাটিত ও অবহেলিত রয়ে যায়।...যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান না করেও কেবল ওসমানী ও তাঁর নিয়োজিত নির্বাচকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে বহুসংখ্যক অফিসার খয়রাতি 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হন। যুদ্ধের ময়দানে পালিত ভূমিকা বিবেচনা সেখানে অনুপস্থিত ও গৌণ, মুখ্য উপাদান ছিল গোষ্ঠী রাজনীতি ও তদবির।[২৪]

মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের অযাচিত হস্তক্ষেপে অনেকের মতো শাফায়াত জামিলও বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। ২১ নভেম্বর 'মুক্তিবাহিনী'কে 'মিত্রবাহিনী'র অধীনস্থ করা হয়'। শুরু হয়ে যায় ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা রাজ সিংয়ের হুকুমদারি। তিনি শাফায়াতের অধীন কোম্পানি কমান্ডারদের সরাসরি নির্দেশ দিতে শুরু করেন। শাফায়াত তাঁকে একদিন ডাউকিতে পেয়ে বলেন, 'আমার অনুমতি ছাড়া আমার অধীনে কারও সঙ্গে আপনি সরাসরি যোগাযোগ করবেন না। আপনার জানা দরকার যে আমি একটা সুশৃঙ্খল দখলদার বাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে দেশকে মুক্ত করার যুদ্ধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছি। এ জন্য আমার কমান্ডিং অফিসারদের পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে হয়েছে। অনুগ্রহ করে ভবিষ্যতে কখনো আমার বাহিনীতে নাক গলানোর চেষ্টা করবেন না।'[২৫] এতে কাজ হলো। কর্নেল রাজ সিং আর গোলমাল করেননি। কিন্তু শাফায়াতের মনের ভেতরে একটা তিক্ততা রয়েই গেল।

বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর একটি অভিযোগে সামরিক আদালতে মেজর জলিলের বিচার হয়েছিল। ওসমানী একবার হুমকি দিয়েছিলেন যে তিনি শাফায়াত জামিলকে সামরিক আদালতের মুখোমুখি করবেন। নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে উঁচু পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার যে কতভাবে হয়, শাফায়াত তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আরেকটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন :

ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে যাই। সেখানে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আত্মসমর্পণকারী বাঙালি অফিসার লে. কর্নেল ফিরোজ সালাহউদ্দিনকে দেখলাম। তিনি আবার কর্নেল ওসমানীর খুবই প্রিয়পাত্র। শোনা যায়, এই লে. কর্নেল ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকবাহিনীর প্রধান রাজাকার রিক্রুটিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হেডকোয়ার্টারে তাঁকে দেখে একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তীব্র ঘৃণা হলো আমার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পা-চাটা এই লে. কর্নেলের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে হলো না। কয়েক দিন পর সিলেট ফিরে এসে ওসমানীর টেলিফোন পেলাম। আমি কেন ওই অফিসারটিকে স্যালুট করিনি, তার ব্যাখ্যা চাইলেন ওসমানী। তিনি আমাকে এই 'অপরাধের' জন্য কোর্ট মার্শাল করার হুমকি দিলেন। আমি অনমনীয়ভাবে বললাম, 'ঠিক আছে, তা-ই হোক।' যেকোনো কারণেই হোক ওসমানী তাঁর হুমকি কাজে পরিণত করতে পারেননি।...

বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ। কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল, রাজাকার রিক্রুটিং অফিসার সেই লে. কর্নেল সাহেব সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের পদে নিযুক্তি পেলেন। কী বিচিত্র এই বঙ্গদেশ! এর পর থেকে সেই লে. কর্নেল ভদ্রলোকের উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে।...

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ক্রমেই কেমন যেন ফ্যাকাশে হতে লাগল।...এসব দেখে ক্রমে প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়লাম।[২৬]

জিয়াউদ্দিন : হিডেন প্রাইজ

মেজর (পরবর্তীকালে লে. কর্নেল) মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁকে জেড ফোর্সের অধীন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। ভারতের মাটিতে বসে মুক্তিযুদ্ধ করার ঘোর বিরোধী ছিলেন যে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা, জিয়াউদ্দিন তাঁদের অন্যতম। তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন জেড ফোর্সের অধীনে তৃতীয় বেঙ্গলের অধিনায়ক শাফায়াত জামিল। শাফায়াতের রেজিমেন্টের তরুণ লেফটেন্যান্ট এস আই এম নূরন্নবী খান (পরবর্তীকালে লে. কর্নেল ও একটি সেনাবিদ্রোহে জড়িত থাকার অভিযোগে বরখাস্ত) মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলকে নিয়ে একাত্তরের আগস্টে কুড়িগ্রামের রৌমারী এলাকা মুক্ত করে সেখানে স্বাধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেন। রৌমারীতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ডাকঘর চালু হয় এবং মেজর জিয়াউর রহমান এটা উদ্বোধন করেন। মেজর জিয়াউদ্দিন আগ্রহ নিয়ে নূরন্নবীর সঙ্গে রৌমারীতে কিছুদিন কাটান। জিয়াউদ্দিন

মুক্তাঞ্চলে জেড ফোর্সের অধিনায়ক জিয়াউর রহমান, মেজর শাফায়াত জামিল (সামনে বাঁয়ে লুঙ্গি পরিহিত) এবং লেফটেন্যান্ট নূরন্নবী খান (পেছনে স্ট্রাইপ শার্ট ও লুঙ্গি পরা)

তাঁর মনের অনেক কথা নূরন্নবীকে বলেছিলেন। নূরন্নবী তাঁর স্মৃতিকথায় যার উল্লেখ করেছেন এভাবে :

> নবী, ভারতের মাটিতে আর থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি কিছুদিন তোমার এখানে থাকতে চাই। তোমার বিভিন্ন অবস্থানের লোকজনের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দাও। এখন থেকে তোমার দায়িত্ব আমিই পালন করব। তুমি কয়েক দিন বিশ্রাম নাও। তিন দিন তিন রাত মেজর জিয়াউদ্দিন স্যারকে নৌকা করে একের পর এক আমি আমার সব কটি সম্মুখ অবস্থানেই নিয়ে গেলাম। বলতে গেলে এর পর থেকে মেজর জিয়াউদ্দিন আমার প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্মুখ অবস্থানেই দিনরাত ঘুরে ঘুরে কাটাতেন। দেখা যেত, কোনো কোনো সময় গভীর রাতেও কোনো বাংকারে এসে তিনি সৈন্যদের খোঁজখবর নিচ্ছেন। ঘুম-বিশ্রাম তাঁর ছিল না। মেজর জিয়াউদ্দিনের পরিশ্রম ও দেশপ্রেমের কাছে নিজেকে খুব লজ্জিত মনে হতো।[২৭]

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মেজর জলিলের পর জিয়াউদ্দিন হলেন দ্বিতীয় বিদ্রোহী কর্মকর্তা। ১৯৭২ সালের ২০ আগস্ট ইংরেজি সাপ্তাহিক *হলিডে*-এর প্রথম পাতায় তিনি স্বনামে একটা নিবন্ধ লেখেন। শিরোনাম ছিল 'হিডেন প্রাইজ'। ওই সময় জিয়াউদ্দিন ছিলেন ঢাকার ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার।

ক্ষমতাসীনদের 'স্বার্থপরতার' দিকে ইঙ্গিত করে জিয়াউদ্দিন লিখেছিলেন, 'দেশের মানুষের কাছে স্বাধীনতা মর্মবেদনায় রূপান্তরিত হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়ালেই দেখা যায় লক্ষ্যহীন, স্বপ্নবিহীন, নিষ্প্রাণ মুখগুলো যন্ত্রের মতো চলছে।

মুক্তিযুদ্ধের পর জনগণ সাধারণত একটা নতুন স্বপ্ন নিয়ে চলে এবং দেশ শূন্য থেকে উঠে দাঁড়ায়। সবকিছুতেই থাকে একটা চ্যালেঞ্জ এবং মানুষ সাহসের সঙ্গে তা মোকাবিলা করে। কিন্তু বাংলাদেশে ঠিক এর উল্টোটাই ঘটছে। দেশটা যেন ভাগ হয়ে গেছে।' দেশের বিভাজন নিয়ে তিনি নির্দিষ্ট করে বলেন :

(ক) বুদ্ধিজীবীরা চুলচেরা বিশ্লেষণে ব্যস্ত;

(খ) যাদের কিছুটা লেখাপড়া আছে, তারা সবাই সমালোচনায় বিভোর, অফিসে কিংবা বাসায় তারা প্রতিদিনই কারও না কারও খুঁত ধরছে;

(গ) যাদের কিছু টাকাকড়ি আছে, তারা সাধ্যমতো এর সদ্ব্যবহার করছে, কিন্তু তাদের অবস্থাও টলমলে;

(ঘ) যারা প্রশাসনে আছে, তারা প্রগতির পথ আটকে রেখে একটা বস্তাপচা ব্যবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে;

(ঙ) ক্ষমতাসীনেরা ইতিমধ্যে জাতীয় সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে আপস করেছে এবং যুদ্ধের অর্জনকে দখলে রাখতে ব্যস্ত;

(চ) নিরন্ন গরিব মানুষগুলোর কোনো খবর নেই এবং তারা করুণা ভিক্ষা করছে।...

দেশ রসাতলে যাচ্ছে। এখন একতার দরকার। দরকার মর্যাদা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার।

এই মর্যাদা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম ২৬ মার্চ। 'গোপন চুক্তির' মধ্যে হারিয়ে গেছে আমাদের মর্যাদা। যারা এটা (এই চুক্তি) সই করেছে, তাদের এই মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে। এই অর্জন জনগণের প্রাপ্য। এই চুক্তির ব্যাপারটা যারা জানে, জনগণের কাছে তাদের এই বেইমানির কথা বলতে হবে। যদি তারা এটা স্বীকার না করে, তাহলে তারা হবে জনগণের শত্রু। জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের এটা চাওয়ার অধিকার আছে।...বঙ্গবন্ধু যদি জনগণকে ভালোবাসেন, তাঁর উচিত জনগণকে জানানো। তাঁর ভয় কী? আমরা তাঁকে ছাড়াই যুদ্ধ করেছি এবং জিতেছি। যদি আবার দরকার পড়ে, আবার যুদ্ধ করব। কেউ আমাদের হারাতে পারবে না। আমরা ধ্বংস হতে পারি, কিন্তু পরাজিত হব না।[২৮]

লেখাটি যখন ছাপা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তখন লন্ডনে চিকিৎসা শেষে জেনেভায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। জিয়াউদ্দিনের লেখা নিয়ে বেশ হইচই হয়। শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে এসে সব শোনেন। তিনি জিয়াউদ্দিনকে ডেকে পাঠান। সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ জিয়াউদ্দিনকে নিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে গণভবনে যান। শেখ মুজিব জিয়াউদ্দিনকে ভর্ৎসনা করে বলেন, এই কর্মটি রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল; জিয়াউদ্দিনের মুক্তিযুদ্ধের অবদানের কথা ভেবে এবং এ ধরনের অপরাধ সে প্রথমবার করেছে বলে তাঁকে ক্ষমা করা হবে, তবে সেনাপ্রধানের কাছে তাঁকে ভুল স্বীকার করে লিখিতভাবে ক্ষমা চাইতে

হবে। জবাবে জিয়াউদ্দিন বলেন, তিনি নিজ বিশ্বাস থেকেই এসব কথা লিখেছেন; ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না; তাই আগেভাগেই তিনি ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন।[২৯]

প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে সফিউল্লাহ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সঙ্গে নিয়ে জিয়াউদ্দিনকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু জিয়াউদ্দিন তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে তিনি রাজনীতির পিচ্ছিল পথে পা বাড়ান, যোগ দেন সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি'তে।[৩০]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির তখনকার মূল্যায়ন ছিল এরকম :

> পূর্ব বাংলায় প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও সামন্তবাদীরা নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে পূর্ব বাংলা মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতার লোভে সাড়ে সাত কোটি জনগণের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিকট বিক্রি করে দেয়, পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের উৎখাতের জন্য তাদের ডেকে আনে।
>
> ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা ও সমর্থনে এ সুযোগ গ্রহণ করে। তারা তাদের হারানো পশ্চাদ্‌ভূমি লাভের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। তারা পূর্ব বাংলা দখল করার জন্য বাংলাদেশে পুতুল সরকার গঠন করে। একে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করায়, কামানের খোরাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য তার সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে তাঁবেদার মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলে, তাদের পূর্ব বাংলায় নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্য প্রেরণ করে। শেষ পর্যন্ত তারা পাকিস্তান আক্রমণ করে এবং সশস্ত্র আগ্রাসী বাহিনী দ্বারা পূর্ব বাংলা দখল করে নেয়।
>
> এভাবে পূর্ব বাংলা ভারতের উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়...পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক জনগণের রক্তপাত বৃথা যায়।...
>
> পূর্ব বাংলার জাতীয় বিপ্লব, অর্থাৎ পূর্ব বাংলা থেকে বৈদেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের অবসান ও স্বাধীন-সার্বভৌম পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা অসমাপ্ত রয়ে গেছে।...
>
> কাজেই অনিবার্যভাবেই পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান দায়িত্ব এসে পড়েছে পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণি ও তার রাজনৈতিক পার্টির ওপর।...
>
> এটা পরিচালনা ও সম্পন্ন করা সম্ভব দীর্ঘস্থায়ী নির্মম গণযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। এই জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সূচনা করতে হবে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে...গ্রাম্য এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন, নিয়মিত বাহিনী, স্থানীয় গেরিলা গ্রামরক্ষী বাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত উন্নত পর্যায়ের সচল যুদ্ধ, বড় রকমের ঘেরাও, অবস্থান যুদ্ধ

পরিচালনা করে শহরসমূহ দখল করতে হবে এবং সমগ্র পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করতে হবে।[৩১]

এই প্রচারপত্রে দেওয়া মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্লেষণটির সঙ্গে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের প্রচারণা এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বানের সঙ্গে ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক অবস্থানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যাহোক, এই উপলব্ধি থেকেই জিয়াউদ্দিন সর্বহারা পার্টির 'বিপ্লবে' সমর্পিত হন এবং কয়েকটি জায়গায় শিক্ষানবিশি শেষে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপ্লবের ঘাঁটি তৈরির দায়িত্ব পান।[৩২]

নূরুজ্জামান : সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলিত

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা রণাঙ্গনে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মেজর কাজী নূরুজ্জামান ছিলেন সবার চেয়ে সিনিয়র। ১৯৪৩ সালে তিনি ব্রিটিশ ভারতের নৌবাহিনীতে এবং ১৯৪৬ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মেজর হিসেবে পদোন্নতি পান। পরে তিনি অবসরে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে সাড়া দিতে দেরি করেননি। ওই বয়সে তাঁর জন্য অস্থায়ী সরকারের অধীনে টেবিল-চেয়ারে বসে কোনো দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত থাকাটাই স্বাভাবিক হতো। কিন্তু তিনি চাইলেন সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে। তাঁর একসময়ের ক্যাডেট মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন তিনি। নূরুজ্জামানকে জুলাই মাসে ৭ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক করা হয়।[৩৩] মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল হন। তবে তিনি আর সামরিক বাহিনীর চাকরিতে থাকেননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরে সেনা কর্মকর্তাদের দলাদলির বাইরে ছিলেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলো চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিতর্কিত হয়ে ওঠার বিষয়টি তিনি ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলিত হচ্ছেন এবং ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা দাপটের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি শাহরিয়ার কবিরের উদাহরণটির উল্লেখ করেছিলেন। তাঁকে কেউ বলেছিল যে শাহরিয়ার ৭ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। কর্নেল নূরুজ্জামান তাঁকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি (শাহরিয়ার) কোন সেক্টর কমান্ডারের অধীনে যুদ্ধ করেছেন। শাহরিয়ার বা তাঁর সঙ্গীরা কেউই এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি।[৩৪] নূরুজ্জামান ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন :

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য প্রমাণ হিসেবে একজন মুক্তিযোদ্ধার কি

সার্টিফিকেটের দরকার আছে?...শতকরা ৭০-৮০ ভাগ মুক্তিযোদ্ধাকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ রিক্রুট করেছিল। এঁদের মধ্যে শতকরা ২০-৩০ জন সত্যিকার অর্থে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।[৩৫]

লে. কর্নেল নূরুজ্জামানকে সরকার 'বীর উত্তম' পদক দিয়েছিল। তাঁর যুক্তি ছিল, হাজার হাজার কৃষক মুক্তিযোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁরা কোনো স্বীকৃতি পাননি। এই কারণ দেখিয়ে তিনি 'বীর উত্তম' খেতাব নিতে অস্বীকার করেছিলেন।[৩৬]

তাহের : মুজিব প্রতারণা করেছেন

১৯৭১ সালের ২৫ জুলাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর আবু তাহের, মেজর মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর, মেজর জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন বজলুল গণি পাটোয়ারী পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তাহের জিয়ার নেতৃত্বাধীন 'জেড ফোর্সের' সঙ্গে যুক্ত হন। ১২ আগস্ট তাহের ১১ নং সেক্টরের দায়িত্ব পান। সার্বিক দায়িত্ব জিয়ার কাছ থেকে তিনি ১০ অক্টোবর বুঝে নেন। ওই সময় জিয়া জেড ফোর্সকে নিয়ে সিলেট অঞ্চলে চলে যান।[৩৭] ১৪ নভেম্বরে তাহের একটা সামরিক অভিযানে দুর্ঘটনাবশত মাইনে পা দিলে মাইনটি বিস্ফোরিত হয় এবং তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর একটা পা কেটে বাদ দিতে হয়। বাহাত্তরের নভেম্বরে তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে লে. কর্নেল হিসেবে অবসর দেওয়া হয়। সরকার তাঁকে বেসামরিক পদে চাকরির ব্যবস্থা করে। তিনি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের অধীনে সি-ট্রাক বিভাগের পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। পঁচাত্তরের মার্চে তাঁকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে ড্রেজার বিভাগের পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন থাকা অবস্থায় তাহের বাম ধারার রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনি পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজ শিকদারের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬৯ সালে তিনি ছুটি নিয়ে ঢাকায় কলাবাগানে তাঁর বড় ভাই বিমানবাহিনীর সার্জেন্ট আবু ইউসুফের বাসায় সিরাজ শিকদারের দলের কিছু কর্মীকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেন।[৩৮] ১৯৭১ সালের ৩ জুন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নাম পাল্টে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি রাখা হয়। এই দলের সঙ্গে তাহেরের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ১৯৭২ সালের শেষের দিকে তিনি নবগঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে (জাসদ) যোগ দেন। তবে সর্বহারা পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। চুয়াত্তরের জুন মাসে জাসদের সামরিক সংগঠন 'বিপ্লবী গণবাহিনী' তৈরি হলে তাঁকে এই বাহিনীর ফিল্ড

কমান্ডার নিয়োগ করা হয়।[৩৯] সেনাবাহিনী ছেড়ে এলেও সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাহেরের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। এ প্রসঙ্গে সেনা কর্মকর্তা শরিফুল হক ডালিম বলেন, '...আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি কখনো, আমরা আমাদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে একই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে থাকি।'[৪০]

তাহের নানা কারণে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। সরকার উৎখাতের আন্দোলনে তিনি যুগপৎ জাসদ ও সর্বহারা পার্টির পক্ষে কাজ অব্যাহত রাখেন। সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাহের মাও সে তুংয়ের রচনাবলি পড়তেন এবং এগুলো তাঁর গাড়িচালকের মাধ্যমে সেনানিবাসে জিয়ার কাছে পাঠাতেন।[৪১] জিয়ার ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি সেনানিবাসের ভেতরে সাধারণ সৈন্য, নন-কমিশন্ড এবং জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারদের নিয়ে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামে একটা গোপন সংগঠন তৈরি করেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরের বছরগুলোতে যেসব সেনা কর্মকর্তা সরকারের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং একটা রক্তক্ষয়ী পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজনীতির পালাবদল ঘটাতে চেয়েছিলেন, তাহের ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাহের ও জিয়াউদ্দিন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। সমসাময়িক পরিস্থিতি ও রাজনীতি সম্পর্কে তাহেরের পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি বোঝা যায় পরবর্তী সময়ে (১৯৭৬ সালের জুন-জুলাই) বিশেষ সামরিক আদালতে বিচারের সময় দেওয়া তাঁর জবানবন্দি থেকে। এখানে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

> সব ধরনের শোষণ ও আধিপত্য থেকে মুক্তি পাব, এই আশা নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম, একটা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলব। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর কী হলো? যুদ্ধের বেশির ভাগই আমাদের মাটিতে হয়নি এবং এর সুফল জনগণ সামান্যই পেল। নিরস্ত্র, শান্তিপ্রিয় ও সন্ত্রস্ত মানুষ নিরাপত্তা ও খাবারের আশায় সীমান্ত পাড়ি দিল। বেশির ভাগ সৈনিকও তা করল। নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, একই কারণে সীমান্তের ওপারে গেল। আওয়ামী লীগ যেহেতু জনগণের রায় পেয়েছিল, তাদের দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। দুর্ভাগ্য এই যে নিরস্ত্র জাতির সামনে কেমন দিন অপেক্ষা করছে, তারা কখনো তা ভাবেনি। সামনের ভয়ানক দিনগুলোর জন্য তারা জনগণকে তৈরি করেনি।...এ জন্য আমাদের চড়া দাম দিতে হলো। আওয়ামী নেতৃত্ব যদি আন্তরিকভাবে আমাদের কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সাহসী ভূমিকা রাখত, তাহলে ঘটনাপ্রবাহ হতো অন্য রকম। কিন্তু তা হলো না।...
>
> গণযুদ্ধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া হলো। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের

ভেতরে বীরের মতো লড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের প্রেরণা দেওয়ার জন্য কেউ ছিলেন না। যদি বাইরের হস্তক্ষেপ না থাকত, তাহলে দেশের ভেতরে কার্যকর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব গড়ে উঠত।...

আমার চিন্তাভাবনা কর্নেল ওসমানীর অসন্তোষের কারণ হলো। তাঁর জীবনটা ছিল খুব আরামের। ঘুমানোর জন্য তাঁর একটা নিরাপদ আবাস ছিল এবং সেক্টর সদর দপ্তরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার মতো অঢেল সময় ছিল তাঁর। কিন্তু যা চলছিল, তা নিছকই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তামাশা। নেতারা ছিলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন। জনযুদ্ধ আর প্রথাগত যুদ্ধের মধ্যে অনেক ফারাক। কর্নেল ওসমানী এটা বুঝতেন না।...

একটা মুক্ত এলাকায় অস্থায়ী সরকারকে সরিয়ে আনতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান করা যেত। সেক্টর সদর দপ্তরগুলো এবং সব কর্মকর্তার উচিত ছিল ভারতীয় ভূখণ্ড ছেড়ে বাংলাদেশের ভেতরে চলে আসা। আমি এই প্রস্তাব দিলে মেজর জিয়া তখনই একমত হন।...সেক্টর কমান্ডারদের একটা সভায় কর্নেল ওসমানী, মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর সফিউল্লাহ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁরা সেক্টর হেডকোয়ার্টারগুলো বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে আসার বিরোধিতাই শুধু করেননি, তাঁরা মেজর জিয়ার ব্রিগেডকে আমার সেক্টর থেকে সরিয়ে দেন।...

১৬ ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর খপ্পরে পড়ল। নেতৃত্বের নির্লিপ্ততা, দেওলিয়াপনা ও অযোগ্যতার কারণে অস্থায়ী সরকার ছিল অকার্যকর। ফলে ভারতের নাক গলানোর সুযোগ তৈরি হয়। ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকার কারণে আমাদের নিয়মিত বাহিনী ছিল মানসিকভাবে দুর্বল ও নতজানু। ভারতীয় বাহিনী যখন বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে পা রাখল, তখন তারা একটা দখলদার বাহিনীর মতো সবকিছুই কবজা করল।...

শুরু হলো মতবিরোধ। মুজিব সরকার সেনাবাহিনীর উন্নয়নে চরম অবহেলা দেখাল। রক্ষীবাহিনীর মতো একটা কুখ্যাত আধা সামরিক বাহিনী তৈরি করল। রক্ষীবাহিনী তৈরিতে ভারতের কর্মকর্তা ও উপদেষ্টারা সরাসরি জড়িত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে আমি এর প্রতিবাদ করেছিলাম। যুদ্ধের সময় ভারতের সঙ্গে করা গোপন চুক্তির ব্যাপারেও আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম।...

এ সময় সরকারের সঙ্গে লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিনের মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলে জিয়াউদ্দিন ও আমি সেনাবাহিনী থেকে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিই। ১৯৭২ সালের নভেম্বরেই এটা ঘটল এবং জিয়াউদ্দিন ও আমি নিজ নিজ রাজনীতি বেছে নিলাম। যখনই সম্ভব হতো, আমরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম এবং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতাম।...

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ভূমিকা সবারই জানা, কীভাবে একটার পর একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছিল, কীভাবে

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল। আমাদের লালিত সকল আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও মূল্যবোধ একের পর এক ধ্বংস করা হয়েছিল। গণতন্ত্রকে অত্যন্ত নোংরাভাবে কবর দেওয়া হয়েছিল। জনগণকে পায়ের নিচে পিষে জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র।...

শেখ মুজিব জনগণের নেতা ছিলেন। অস্বীকার করার অর্থ হবে সত্যকে অস্বীকার করা। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাঁর ভাগ্য নির্ধারণের ভার জনগণের ওপরই বর্তায়। জনগণের উচিত হবে জেগে ওঠা এবং প্রতারণার দায়ে মুজিবকে উৎখাত করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জনগণ মুজিবকে নেতা বানিয়েছে, তারাই একদিন স্বৈরাচারী মুজিবকে ধ্বংস করবে। জনগণ কাউকে ষড়যন্ত্র করবার অধিকার দেয়নি।[৪২]

তাহেরের এই জবানবন্দি থেকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর মতে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে 'প্রতারণা' করেছেন, সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছেন, সেনাবাহিনীর উন্নয়নে চরম অবহেলা দেখিয়েছেন এবং চালু করেছেন ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র। মুজিব সরকারকে উৎখাত করাই তাহেরের ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য তাহেরকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

মঞ্জুর : সেনাবাহিনীর কোনো ভিত্তি ছিল না

মেজর মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ৮ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর আবু ওসমান চৌধুরীকে প্রত্যাহার করে মঞ্জুরকে ১৪ আগস্ট ওই সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর অন্যান্য সহকর্মীর মতো মঞ্জুর অতটা সরব ছিলেন না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাঁর মনও নানা কারণে বিষিয়ে উঠেছিল, ক্ষোভ জমেছিল অনেক। তিনি মনে করতেন, মুজিব সরকারের আমলে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। এ নিয়ে তাঁর মর্মবেদনার অন্ত ছিল না। যুক্তরাজ্যের *সানডে টাইমস*-এর সংবাদদাতা অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর মনোভাব তুলে ধরেছিলেন :

আমরা সত্যিকার অর্থে কোনো সেনাবাহিনী ছিলাম না। কাগজপত্রে আমাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সেনাবাহিনীর জন্য কোনো আইনগত ভিত্তি ছিল না। 'টেবল অব অর্গানাইজেশন অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট' বলে কোনো জিনিস ছিল না। সবই ছিল 'অ্যাডহক'। সেনাবাহিনী বেতন পেত। কারণ, শেখ মুজিব তা দিতে বলেছিলেন। মুজিবের মুখের কথার ওপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। আমাদের ছেলেরা নরকের যন্ত্রণায় ভুগছিল, কিন্তু মুখ ফুটে কোনো

অভিযোগ করেনি। কারণ, এরা দেশের সেবায় নিয়োজিত ছিল। এবং এরা প্রয়োজনে যেকোনো উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিল।

এ দেশের সেনাবাহিনী একটা স্বেচ্ছাসেবক দলের মতো। আমাদের অফিসার ও জওয়ানরা সৈনিক হিসেবে তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে চায় বলে তাদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে। বিনিময়ে তারা কী পেয়েছে? প্রত্যেকেই এরা হতভাগ্য, এদের খাবার নেই, তাদের কোনো প্রশাসন নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই। তুমি অবাক হবে, তাদের জার্সি নেই, গায়ের কোট নেই, পায়ে দেওয়ার বুট পর্যন্ত নেই। শীতের রাতে তাদের কম্বল গায়ে দিয়ে পাহারা দিতে হয়। আমাদের অনেক সিপাহি এখনো লুঙ্গি পরে কাজ করছে। তাদের কোনো ইউনিফর্ম নেই। তদুপরি, তাদের ওপর হয়রানি।

পুলিশ আমাদের লোকদের পেটাত। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সরকারি আমলারা সেনাবাহিনীকে ঘৃণার চোখে দেখত। একবার আমাদের কিছু ছেলেকে মেরে ফেলা হলো। আমরা মুজিবের কাছে গেলাম। মুজিব কথা দিলেন, তিনি ব্যাপারটি দেখবেন। পরে তিনি আমাদের জানালেন, আমাদের ছেলেরা 'কোলাবরেটর' ছিল বলে তাদের মেরে ফেলা হয়েছে।

সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মুজিব সকল পন্থাই ব্যবহার করেছিলেন। তিনি কাউকে তাঁর জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন সন্দেহ হলেই সেখানে ভাঙন ধরিয়ে দিতেন। একমাত্র মুজিবই সেনাবাহিনীতে ভাঙন ধরিয়ে একে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন।[৪৩]

মইনুল : সেনাবাহিনীতে দলাদলি ছিল

লে. কর্নেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (পরে মেজর জেনারেল) ১৯৭২-৭৩ সালে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, ঢাকার ৪৬ ব্রিগেড ও লগ এরিয়া অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে যে দলাদলি ছিল, তা তিনি কাছে থেকে দেখেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো, সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ ও উপসেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না। তাঁদের প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দ্ব চলাকালে সিনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্যে মীর শওকত আলী, আবু তাহের, জিয়াউদ্দিন ও আবুল মঞ্জুর জিয়াকে সমর্থন দিতেন। তাঁরা মনে করতেন, খালেদ মোশাররফ সফিউল্লাহকে সমর্থন ও পরামর্শ দিচ্ছেন। এ নিয়ে সফিউল্লাহ বেশ বিব্রত হতেন।[৪৪]

মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা করা নিয়েও স্বচ্ছতার অভাব ছিল বলে মইনুল হোসেন চৌধুরী মনে করতেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ সরকার কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাহসিকতার জন্য স্বীকৃতি দেয়। তখন

কোনো পদক বা সনদপত্র ছিল না। শুধু চিঠির মাধ্যমে জানানো হতো। যুদ্ধের পর ঢাকায় মিন্টো রোডের একটা বাড়িতে কর্নেল ওসমানী কয়েকজন সেক্টর কমান্ডারকে সঙ্গে নিয়ে সাহসিকতার জন্য পদক কারা পেতে পারেন, তার একটা তালিকা তৈরি করেন। ওসমানীর স্বাক্ষরে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ মুজিবের অনুমোদনের পর ওই তালিকা গণমাধ্যমে ছাপা হয়। ওই তালিকা দেখে অনেক মুক্তিযোদ্ধার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। দেখা গেছে, সব সেক্টর কমান্ডারকে বীর উত্তম খেতাব দেওয়া হয়েছে। অথচ বেশির ভাগ সেক্টর কমান্ডারের সদর দপ্তর ছিল ভারতের ভেতরে এবং যুদ্ধের নয় মাস তাঁরা সেখানেই কাটিয়েছেন। 'তাঁরা কোথায় বীরত্ব দেখালেন, তা নিয়ে কানাঘুষা শুরু হলো।' যারা মাঠে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, তাঁদের অনেককেই উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এটা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা নিয়ে ঢাকায় ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার মইনুল হোসেন চৌধুরী সেনাপ্রধান সফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন। সফিউল্লাহ তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে যান। প্রধানমন্ত্রী সব শুনে পদক তালিকা রদ করার আদেশ দেন। পরদিনই এই আদেশ পত্রিকায় ছাপা হয়। কিন্তু কয়েক দিন পর এই আদেশ বাতিল করে আগের তালিকাই বহাল রাখা হয়। ওই তালিকা বহাল রাখার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল থেকে জোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল।[৪৫]

মইনুল হোসেন চৌধুরী মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র বিতরণ নিয়ে অনেক অভিযোগ আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, সময়ে সময়ে এমন সব লোককে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কর্মকর্তা করা হয়, মুক্তিযুদ্ধে যাঁদের অংশগ্রহণ কিংবা কোনো ভূমিকা ছিল না। খুব বেশি হলে তাঁরা শরণার্থী হয়েছিলেন। শুধু রাজনৈতিক কারণে এঁদের নিয়োগ দেওয়া হতো এবং তাঁরা অবাধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সনদপত্র বিতরণ করতেন। এ জন্য মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ওপর সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের কোনো শ্রদ্ধা তৈরি হয়নি।[৪৬] সামরিক বাহিনীর ভেতরেও শৃঙ্খলা ছিল না। এ প্রসঙ্গে মইনুল হোসেন চৌধুরীর মন্তব্য প্রাসঙ্গিক :

> আমার মনে হয়েছিল, সেনাবাহিনীকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য দক্ষ অধিনায়কত্ব, কঠোর নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলা প্রয়োগ করা দরকার। সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ অভ্যন্তরীণ এসব বিভেদ ও অনৈক্য দূর করতে সক্ষম হননি।... মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসারদের রেষারেষি ছাড়াও পাকিস্তান-ফেরত অফিসাররা, বিশেষ করে যাঁরা সিনিয়র ছিলেন, তাঁরাও সুযোগ বুঝে এই বিরোধকে উসকে দিতেন। তা ছাড়া ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের কোনো কোনো রাজনীতিবিদ সামরিক বাহিনীর সদস্যদের এসব দলাদলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করেন।...

১৯৭৫ সালে, খুব সম্ভব জুলাই মাসের প্রথম দিকে, একদিন আমি বাস্কেটবল খেলা শেষ করে বিকেলবেলায় শহীদ মইনুল রোডে অবিস্থত আমার বাসায় ঢুকছিলাম। বাসার গেটে মেজর রশিদ আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে। আলাপের শুরুতেই সে সেনাবাহিনী, রাজনীতি, বাকশাল ইত্যাদি সম্পর্কে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল। আমি তাকে তার ব্রিগেড অধিনায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিলকে এসব জানাতে বলি।...

আমি তৎক্ষণাৎ অনুধাবন করি, রশিদ হয়তো ভেবেছে, সম্প্রতি আমাকে ঢাকা ব্রিগেড থেকে বদলি করায় আমি হয়তো সরকারের ওপর মনঃক্ষুণ্ন। তাই সে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত করতে সক্ষম হবে এবং আমি তার রাজনৈতিক অভিমতকে সমর্থন করব। কিন্তু সে ভুল লোকটিকে বেছে নিয়েছিল। তবে ঘুণাক্ষরেও এটা বুঝতে পারিনি যে, সে বা তারা জঘন্য কোনো পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে।[৪৭]

ফারুক : একটা কিছু করতে হবে

দেওয়ান ইশরাতুল্লাহ সৈয়দ ফারুক রহমান পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ১৯৬৫ সালে। ১৯৭০ সালের অক্টোবরে ক্যাপ্টেন ফারুক (পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লে. কর্নেল) আবুধাবিতে একটা রেজিমেন্টে স্কোয়াড্রন কমান্ডার পদে যোগ দেন। একটি চুক্তির আওতায় আবুধাবির সশস্ত্র বাহিনীকে পাকিস্তান সরকার প্রশিক্ষণ দিত। ১৯৭১ সালের ১২ নভেম্বর তিনি দুবাই ত্যাগ করেন। বৈরুত ও লন্ডন হয়ে ২১ নভেম্বর তিনি দিল্লিতে হাজির হন।[৪৮]

ফারুক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কি না, এ নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বিতর্ক ছিল। মীমাংসার জন্য ব্রিগেডিয়ার মইনুল হোসেন ও লে. কর্নেল হামিদকে নিয়ে একটা কমিটি করা হয়। তাঁরা ফারুকের এয়ার টিকিট প্রভৃতি পরীক্ষা করে আট ঘণ্টার ঘাটতি পান। পর্যালোচনা সভায় সফিউল্লাহ, জিয়া, খালেদ, মঞ্জুর, মইনুল হোসেন ও হামিদ উপস্থিত ছিলেন। খালেদ ফারুকের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দেন। ফারুককে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তবে তাঁকে অন্য মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের মতো দুই বছরের জ্যেষ্ঠতা দেওয়া হয়নি।[৪৯]

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বেঙ্গল ল্যান্সার্স বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন লে. কর্নেল আবদুল মোমিন। ফারুক ছিলেন এই বাহিনীর উপপ্রধান। রেজিমেন্টটি ফারুকের হাতেই গড়া এবং এই বাহিনীর সদস্যরা তাঁর খুবই অনুগত ছিলেন। এই বাহিনীর হাতে ৩০টি ট্যাংক ছিল। মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে ট্যাংকগুলো শেখ মুজিবকে উপহার হিসেবে

পাঠিয়েছিলেন। এই ট্যাংকবহর নিয়ে ফারুকের মতো একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনা কর্মকর্তা চুপচাপ বসে থাকবেন, তা আশা করা যায় না।[৫০]

কর্নেল হামিদের ভাষ্য অনুযায়ী, ফারুকের শক্তির উৎস ছিলেন সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। পারিবারিক সম্পর্কে ফারুক ছিলেন খালেদের ভাগনে। 'নেপথ্যে খালেদ মোশাররফই ফারুককে সব রকম নিরাপত্তা ও সহযোগিতা দিয়েছেন। ফারুক যে একটা কিছু করবেন, তা খালেদ জানতেন। তবে শেখ সাহেবকে হত্যা করার জন্য অবশ্যই তিনি ইন্ধন জোগাননি। ফারুক তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা, প্ল্যান-প্রোগ্রাম নিয়েই চলছিলেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের ছত্রচ্ছায়ায় ফারুক জুনিয়র হলেও ক্যান্টনমেন্টে তাঁর ছিল শক্তিশালী বিচরণ।'[৫১]

ফারুক চুয়াত্তরের মাঝামাঝি মনস্থির করে ফেলেছিলেন, 'একটা কিছু করতে হবে।' ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে সরকারের নির্দেশে একটা 'ক্লিনিং অপারেশন'-এর অংশ হিসেবে ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার্সের ব্রাভো স্কোয়াড্রন নিয়ে ফারুক ডেমরায় যান। ওই এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী ২০ বছর বয়সের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হলে সে বলে, 'ওস্তাদের নির্দেশে সে এযাবৎ ২১ জনকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে।' যেকোনো অভিযান পরিচালনা করতে গেলেই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হতো। সেনাবাহিনী বিভিন্ন জায়গায় চোরাচালান, মজুতদারি, খুন ইত্যাদি অভিযোগে শত শত লোককে গ্রেপ্তার করে। 'কিন্তু ঢাকা থেকে একটা টেলিফোন এলেই ওই লোকজন বেকসুর খালাস হয়ে যেত।'[৫২]

টঙ্গীর একটা ঘটনা ফারুকের মন বিষিয়ে দেয়। মাসকারেনহাসের লেখায় ফারুকের বয়ান উঠে এসেছে এভাবে :

> একবার টঙ্গীতে মেজর নাসের তিন ব্যক্তিকে আটক করে। এরা তিনটি খুনের আসামি ছিল।...মেজরের হাতে ধৃত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মোজাম্মেল মেজর নাসেরকে তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল। মোজাম্মেলের ভাষায়, 'ব্যাপারটিকে সরকারি পর্যায়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন না। আজ হোক, কাল হোক, আমাকে আপনার ছেড়ে দিতেই হবে। সুতরাং, টাকা নিয়ে ছেড়ে দিতে আপনার আপত্তি কেন?' নাসের এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে মনে করে কোর্টে সোপর্দ করেন। কিছুদিন পর ওই তিন খুনের আসামি মোজাম্মেলকে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখে সবাই অবাক হয়। ওই ঘটনা ফারুক আর তাঁর সহকর্মীদের চমকে দিয়েছিল। ফারুক বলেছিলেন, 'আমরা এমন এক সমাজে বসবাস করছিলাম, যেখানে অপরাধীরা নেতৃত্ব দিচ্ছিল।...আমরা সবাই বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম।...আমরা তাকে খতম করার সিদ্ধান্ত নিলাম।...আমি সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ক্যাপ্টেন শরফুল হোসেনকে বলেছিলাম, শরফুল, এভাবে বেঁচে থাকা

একেবারেই অর্থহীন। চলো, আমরা শেখ মুজিবকে এক্ষুনি খতম করে দিই।...এর পর থেকে প্রমোশন, কোর্স, ক্যারিয়ার ইত্যাদির প্রতি আমার আর কোনো মোহ রইল না। আমি কেবল একটা জিনিসই সারাক্ষণ ভাবতাম—কীভাবে এ সরকারের পতন ঘটানো যায়।'[৫৩]

১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ফারুক তাঁর পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেন। তিনি এই পরিকল্পনায় তাঁর ভায়রা ভাই ২ নম্বর ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর খন্দকার আবদুর রশিদকে জড়ান। পঁচাত্তরের মার্চে রশিদ ভারতে 'গানারি স্টাফ কোর্স' শেষ করে ঢাকায় ফিরে এলে তাঁকে যশোর আর্টিলারি স্কুলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ফারুক খালেদ মোশাররফকে ধরে রশিদকে ঢাকায় ২ নম্বর ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টে বদলি করান।[৫৪]

ফারুক ও রশিদ এমন একজনকে খুঁজছিলেন, যিনি শেখ মুজিবের বিকল্প হতে পারেন। তাঁদের প্রথম পছন্দ ছিলেন সেনাবাহিনীর উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। জিয়া পাকিস্তান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ফারুক ও রশিদের প্রশিক্ষক ছিলেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ছিলেন বেশ জনপ্রিয়। তাঁদের মনে হলো, 'দেশের এই দুঃসময়ে জিয়ার মতো একজন নেতার দরকার।' জিয়ার সঙ্গে রশিদের যোগাযোগ হলো। ১৯৭৬ সালের আগস্টে লন্ডনের গ্রানাদা টেলিভিশনে অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জিয়া-রশিদের কথোপকথনের বিষয়টি জানা যায়।

রশিদ : আমাদের পছন্দ ছিলেন জেনারেল জিয়া। এ জন্য অনেক প্রচেষ্টার পর ১৯৭৫ সালের ২০ মার্চ সন্ধ্যায় আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হই। জেনারেল জিয়া বললেন, 'আমি একজন সিনিয়র অফিসার। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে আমি জড়িত হতে পারি না। কিন্তু তোমরা, জুনিয়র অফিসাররা আগ্রহী হলে এগিয়ে যেতে পারো।'

অ্যান্থনি : আপনি কি এ কথা জেনারেল জিয়াকে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে আপনারা শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎখাতের পরিকল্পনা করেছেন?

রশিদ : আপনার মনে রাখা দরকার যে এ সময় আমি সামরিক বাহিনীর উপপ্রধান একজন মেজর জেনারেলের সঙ্গে কথা বলছিলাম। যদি আমি সরাসরি তাঁকে বলতাম যে আমি দেশের প্রেসিডেন্টকে সরাতে চাই, সে ক্ষেত্রে তাঁর নিজের সান্ত্রিদের দিয়ে সেখানেই আমাকে গ্রেপ্তার করে সরাসরি জেলে পাঠিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই আমাকে কিছুটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথা পাড়তে হয়েছে। আলোচনার আসল জায়গায় এসে বলেছিলাম যে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি চলছে এবং কিছুই ঠিকভাবে চলছে না, সে জন্য একটা পরিবর্তন দরকার। এসব শুনে জেনারেল জিয়া বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো আমরা বাইরে লনে গিয়ে আলাপ করি।

অ্যান্থনি : জিয়া কি আপনাকে এভাবে বলেছিলেন?

রশিদ : হ্যাঁ। এরপর আমরা লনে গেলাম। আমি তাঁকে বললাম, আমরা হলাম পেশাদার সৈনিক। আমরা দেশকে সেবা করি, কোনো ব্যক্তিবিশেষকে নয়। সশস্ত্র বাহিনী, সিভিল সার্ভিস, সরকার—সবকিছুই রসাতলে যাচ্ছে। আমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আমরা জুনিয়র অফিসাররা এর মধ্যেই এ ব্যাপারে পরিকল্পনা করেছি। আমরা আপনার সমর্থন ও নেতৃত্ব কামনা করছি। তিনি বললেন, আমি দুঃখিত, এ ধরনের কিছুর মধ্যে আমি জড়াতে চাই না। যদি তোমরা কিছু করতে চাও, সে ক্ষেত্রে জুনিয়র অফিসারদের নিজেদের তা করা উচিত।

অ্যান্থনি : তাহলে আপনাদের এ ধরনের একটা পরামর্শের কথা তিনি প্রেসিডেন্টকে জানাননি?

রশিদ : না। তবে তিনি নিজের এডিসিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আমাকে আর কোনো সাক্ষাৎকার দেওয়া হবে না।[৫৫]

অদৃষ্টবাদী ফারুক চট্টগ্রামের হালিশহরে বিহারি কলোনিতে বসবাসকারী জনৈক পীর আবদুল হাফিজের সঙ্গে ২ এপ্রিল (১৯৭৫) দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ চান। জন্মান্ধ এই ব্যক্তি 'আন্ধা হাফিজ' নামে পরিচিত ছিলেন। হাফিজ ফারুককে তিন মাস অপেক্ষা করতে বলেন।[৫৬] ১২ আগস্ট ঢাকা সেনানিবাসে ফারুক তাঁর বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন উৎসবে রশিদকে বলেন, ১৫ আগস্ট রাতেই আঘাত হানতে হবে।[৫৭]

রশিদ : বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে

রশিদ কর্নেল হামিদকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ফারুক তাঁকে ১২ আগস্ট অভ্যুত্থান পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন বলে যে দাবি করেন, তা ঠিক নয়। রশিদের দাবি, তাঁরা দুজন মিলেই তারিখটা নির্ধারণ করেছিলেন। তবে তিনি আলাদাভাবে অনেক আগে থেকেই সমমনা সেনা কর্মকর্তা ও রাজনীতিকদের সঙ্গে গোপনে সলাপরামর্শ করে আসছিলেন। রশিদের কথা অনুযায়ী :

> আমার মাধ্যমেই ডালিম, নূর, হুদা, রাশেদ, পাশা, শাহরিয়ার এদের দলে আনা সম্ভব হয়। ডালিম ও নূর তখন আর্মি থেকে বরখাস্ত। শাহরিয়ার অবসরপ্রাপ্ত। বজলুল হুদা মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের অফিসার ছিল। মেজর পাশা ও মেজর রাশেদ চৌধুরীকেও অবসর দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এরা সবাই ব্যক্তিগত কারণে শেখ সাহেবের ওপর ছিল বীতশ্রদ্ধ। সিনিয়র অফিসার বেশ

কয়েকজনের সঙ্গেও কথা হয়। তারা দোদুল্যমান থাকলেও মৌন সমর্থন দেন। সবার ছিল একই সমস্যা—বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?[৫৮]

রশিদ আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা ও বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে ২ আগস্ট (১৯৭৫) দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে রশিদ বুঝতে পারেন, প্রয়োজনের সময় তাঁকে ব্যবহার করা যাবে। খন্দকার মোশতাক ছাড়াও আওয়ামী লীগের আরও কয়েকজন নেতার সঙ্গে রশিদ এ নিয়ে কৌশলে কথা বলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শেখ মুজিবের সর্বশেষ রাজনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে খুশি ছিলেন না।[৫৯]

মোশতাক-রশিদের মধ্যকার কথাবার্তার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে দেওয়া রশিদের সাক্ষাৎকারে।

অ্যান্থনি : মুজিবের মৃত্যুর পর আপনি এবং কর্নেল ফারুক মিলে জনাব মোশতাককে দেশের প্রেসিডেন্ট বানালেন। এর আগে কি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

রশিদ : হ্যাঁ। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হয় এবং এরপর আমি ১২, ১৩ ও ১৪ আগস্ট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

অ্যান্থনি : আপনি কি মুজিব হত্যা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন?

রশিদ : ঠিক হত্যার কথা সরাসরি বলিনি। তবে তাঁকে এমনভাবে বলা হয়েছে যে ক্ষমতা থেকে ওঁদের বলপ্রয়োগে হঠানো হবে এবং এ কাজ করতে গিয়ে শেখ মুজিবকে হত্যা করতে হতে পারে।...

অ্যান্থনি : আপনি কি সামরিক অভ্যুত্থানের তারিখ সম্পর্কে তাঁকে কোনো ধারণা দিয়েছিলেন?

রশিদ : না, আমি কীভাবে বিশ্বাস করতে পারি? তিনিও তো এসব শেখকে বলে দিতে পারেন এবং তাঁর দক্ষিণ হস্তে পরিণত হতে পারেন।

অ্যান্থনি : আপনার কি এ ধরনের ধারণা হয়েছিল যে উনি আপনাদের পক্ষে রয়েছেন?

রশিদ : হ্যাঁ।[৬০]

জিয়া : শেখকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়েছে

জিয়াউর রহমানের কথা প্রথম শোনা যায় ১৯৭১ সালে। পরবর্তী সময়ে জিয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তাঁর আগেকার জীবন সম্পর্কে জনমনে তেমন ধারণা নেই। পাকিস্তান আমলে সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রথম পরিচালক ও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা আকবর কবিরের স্মৃতিকথা থেকে জিয়ার অতীত সম্পর্কে কিছু জানা যায়।

জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আমার পরিচয় করাচি পৌঁছার কয়েক মাসের মধ্যেই। তিনি তখন উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র অথবা পরীক্ষা দিচ্ছেন। ওঁর পিতা-মাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।...জিয়ার বাবা অত্যন্ত সজ্জন ছিলেন। আর ওঁর মা শুধু সুন্দরীই ছিলেন না, বিদুষীও ছিলেন। নজরুলসংগীত ও পল্লিগীতি গাইতেন এবং করাচির বাঙালি অনুষ্ঠানে তাঁর গান সবাইকে আকৃষ্ট করত। অতি অল্প বয়সে ১৯৫৪ সালে তিনি মারা যান।...জিয়া আর্মিতে যোগ দেওয়ার পর আমার সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হতো। তাঁর বাবার কাছে শুনলাম, তিনি আর্মি ইনটেলিজেন্সে যোগ দিয়েছেন এবং দিনাজপুরে প্রায় চার বছর রয়ে গেছেন। সেখানেই তিনি বিয়ে করেন। আমি পরিচিত মহলের মাধ্যমে তাঁকে ইনটেলিজেন্স থেকে বের করে নিয়ে আসি।[৬১]

জিয়া ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার ট্রান্সমিটার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার একটা ঘোষণা দেন। তাঁর কণ্ঠস্বর, 'আমি মেজর জিয়া বলছি', দিশেহারা মানুষকে স্বস্তি দিয়েছিল, উদ্দীপনা জুগিয়েছিল।

২৫ মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে মানুষ হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। অনেকেই দেশের মাটি ছেড়ে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হয়। অজস্র রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, অসহায় মানুষ এবং পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করা বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্যরাও সীমান্তের ওপারে চলে যান এবং প্রতিরোধযুদ্ধে শামিল হন। অন্য অনেকের মতো জিয়াও কি ২৫ মার্চের পর হঠাৎ করে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যান, নাকি আগে থেকেই তিনি বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলেন? জিয়ার নিজস্ব ভাবনা ফুটে উঠেছিল ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁর একটা লেখায়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি অফিসারদের আনুগত্য ছিল না প্রশ্নাতীত। অবশ্য গুটি কয়েক দালাল ছাড়া আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখত, অবহেলা করত, অসম্মান করত। দক্ষ ও যোগ্য বাঙালি অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটত না কোনো স্বীকৃতি বা পারিতোষিক। জুটত শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা। আখ্যায়িত করত আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে। একাডেমির ক্লাসগুলোতেও সব সময় বোঝানো হতো, আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের দালাল। পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতেই আওয়ামী লীগ সচেষ্ট। এমনকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ক্যাডেটদের শেখানো হতো—আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।...

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মধ্যেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল।...[৬২]

একটি জাতির জন্ম

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান

জিয়াউর রহমানের লেখা 'একটি জাতির জন্ম' নিবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠা

জিয়া ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বিদ্রোহ করেন। তাঁর রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আবদুর রশিদ জানজুয়া ও অন্য অবাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার ও হত্যা করে জিয়া বিদ্রোহ শুরু করেন। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী রাতে জিয়া চট্টগ্রামে অসামরিক টেলিফোন অপারেটরকে বলেন, চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার, পুলিশের এসপি ও ডিআইজি এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের

জানাতে যে, 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।'[৬৩]

২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী রাতে, অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে জিয়া যে তাঁর সৈনিকদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, তা তাঁর সহকর্মীরা সবাই সমর্থন করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আরেক বিদ্রোহী কর্মকর্তা মেজর খালেদ মোশাররফের ভাষ্য অনুযায়ী, '২৬ মার্চ মেজর জিয়া ঘোষণা করেছিলেন স্বাধীনতা শেখ মুজিবের পক্ষে।'[৬৪] ২৭ মার্চ রেডিওতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জিয়া পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে আসা বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের অনেকেই ৪ এপ্রিল (১৯৭১) সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় জমায়েত হন। কর্নেল (অব.) ওসমানী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জিয়া এবং অন্য সবাই ওসমানীকে তাঁদের অধিনায়ক মনোনীত করেন।[৬৫] পরে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে তাঁরা সবাই এই সরকারের অধীনে রণাঙ্গনে নেতৃত্ব দেন।

প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টে নিয়ে একটি ব্রিগেড তৈরি করা হলে জুনের শেষ দিকে মেজর জিয়াকে এর কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর (বিডিএফ) সদর দপ্তরের নির্দেশে মেজর জিয়ার নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে ১০ সেপ্টেম্বর এই ব্রিগেডের নাম রাখা হয় 'জেড ফোর্স'।[৬৬] জিয়াকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পদায়ন করা হয়।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাবেক সহসভাপতি (১৯৬৮-৭০) ও ছাত্রলীগের নেতা এবং মেজর শাফায়াত জামিলের অধীনে ডেল্টা কোম্পানির কমান্ডার লেফটেন্যান্ট এস আই এম নূরন্নবী খানের সঙ্গে জিয়ার আলাপচারিতায় মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার জীবনের অনেক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর সিলেটে জিয়ার সঙ্গে ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নিভৃতে নূরন্নবীর অনেক কথা হয়। নূরন্নবীর লেখায় জানা যায় :

> ডাকবাংলোর কোনার রুমটায় দুটো মাত্র সিঙ্গেল খাট। ওটার একটায় আমার, অন্যটায় জিয়া স্যারের থাকার ব্যবস্থা হলো...
>
> তারপর চলল গল্প। যার যার বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ। জিয়া স্যারই প্রথম মুখ খুললেন। বলতে লাগলেন...কালুরঘাটের পতন ও রামগড়ে পশ্চাদপসরণের কথা, তারপর ভারতের মেলাঘরে তাঁর আসার কথা। মাঝখানে একটু থামলেন জিয়া স্যার। তারপর আবার বলতে লাগলেন...কীভাবে 'জেড ফোর্স' গঠন করা হলো, কামালপুর, বাহাদুরাবাদ ও নকশী বিওপিতে কীভাবে অপারেশন চালান, তারও কথা। বললেন গারো এলাকা থেকে জেড ফোর্সের

১৯৭১ সালের ২ মে ত্রিপুরার হরিণা ক্যাম্পের কাছে পথের উপর দাঁড়িয়ে ১নং সেক্টরের অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান। আলোকচিত্র : রবীন সেনগুপ্ত

ঢাকা অভিমুখে অভিযান পরিচালনার বিষয়ে পরিকল্পনার কথা, পাশাপাশি ঢাকা অভিযান ও দখলের গৌরব থেকে বঞ্চিত করার জন্য কর্নেল ওসমানীর সিদ্ধান্ত বা নির্দেশে পুরো 'জেড ফোর্স'কে সিলেট এলাকার অপারেশনে পাঠানোর কথা।[৬৭]

নূরন্নবী খানের বিবরণ থেকে জানা যায়, জিয়া তাঁর জেড ফোর্সকে নিয়ে ঢাকার দিকে রওনা হতে এবং ঢাকা মুক্ত করার অনন্য গৌরবের অংশীদার হতে চেয়েছিলেন। তাঁর ব্রিগেডে ওই সময় মেজর জিয়াউদ্দিন ও মেজর শাফায়াত জামিলের মতো দুর্ধর্ষ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জেড ফোর্স নামের এই ব্রিগেডটিও প্রথম গড়ে উঠেছিল এবং এর আরও অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বাদ সাধলেন ওসমানী। জিয়ার সঙ্গে ওসমানীর সম্পর্কে টানাপোড়েন ছিল। ওসমানী নিজেও পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যেতে পারেননি বা যাননি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সফিউল্লাহ ও জিয়া একই ব্যাচে কমিশন পেয়েছিলেন। তবে ক্রম অনুযায়ী জিয়ার নাম ছিল ওপরে। জিয়ার আশা ছিল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতেও জ্যেষ্ঠতার এই সাধারণ নিয়মটি মেনে চলা হবে। কিন্তু তা হয়নি। জিয়ার সঙ্গে সফিউল্লাহ ও খালেদ মোশাররফের একটা অলিখিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

একাত্তরের জুনে জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড 'জেড ফোর্স' তৈরি হয়। এ সময় সফিউল্লাহ এবং খালেদও চাইলেন তাঁদের অধীনে যেন আরও দুটো ব্রিগেড তৈরি করা হয়। এতগুলো ব্রিগেড তৈরি করার মতো নিয়মিত সেনা তখন ছিল না। কিন্তু তাঁদের চাপ অব্যাহত থাকে। ৩০ আগস্ট সফিউল্লাহর অধীনে 'এস ফোর্স' এবং ২৪ সেপ্টেম্বর খালেদ মোশাররফের অধীনে 'কে ফোর্স' নামে আলাদা দুটো ব্রিগেড তৈরি হয়।

১৯৭২ সালের ৫ এপ্রিল সফিউল্লাহকে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়। পরবর্তী সময়ে জিয়াকে করা হয় ডেপুটি চিফ অব স্টাফ। এটা ছিল জিয়ার জন্য একধরনের 'সান্ত্বনা পুরস্কার'। অবশ্য দুজনকেই ব্রিগেডিয়ার বানানো হয় এবং পরে একই সঙ্গে দুজনই মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পান। খালেদ মোশাররফকেও ব্রিগেডিয়ার হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে তাঁকে চিফ অব জেনারেল স্টাফের গুরুত্বপূর্ণ পদটি দেওয়া হয়। ধারণা করা হয়, ওসমানীর পরামর্শেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন। ওসমানীকে সম্মানসূচক জেনারেল এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ লে. কর্নেল (অব.) আবদুর রবকে সম্মানসূচক মেজর জেনারেল পদ দিয়ে অবসর দেওয়া হয়। তাঁরা দুজনই ছিলেন ১৯৭০ সালের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য। তাঁরা সংসদ সদস্য হিসেবে তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্বে ফিরে যান।

সেনাপ্রধান না হতে পেরে জিয়াউর রহমান ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ নিয়ে তিনি হইচই না করলেও সেনাবাহিনীর ভেতরে অসন্তোষ ছিল। জিয়া নিজে ঠান্ডা মাথার হলেও তাঁর অনুগত কেউ কেউ এ নিয়ে মাথা গরম করেছিলেন। এঁদের একজন

হলেন লে. কর্নেল আবু তাহের। সেনাপ্রধান সফিউল্লাহর ভাষ্য অনুযায়ী, তাহের একবার তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন, 'স্যার, এত দিন তো চিফ থাকলেন, এখন এ পদটা জিয়াউর রহমানের জন্য ছেড়ে দেন।' জবাবে সফিউল্লাহ বলেছিলেন, 'ইউ আর ডাউন ক্যাটেগোরাইজড; এখনই সিএমএইচে গিয়ে সসম্মানে মেডিকেল বোর্ড আউট হয়ে যাও।' সফিউল্লাহ বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে জানিয়েছিলেন। এরপর তাহের 'মেডিকেলি' অবসর নেন। এ নিয়ে সেনাবাহিনীতে অপপ্রচার হয়।[৬৮]

লে. কর্নেল হামিদের ভাষ্য অনুযায়ী, সফিউল্লাহ ও খালেদ ছিলেন শেখ মুজিবের 'অনুগত'। খালেদকে শেখ মুজিবের বেশি কাছের মনে হতো। ফলে একটা ধারণা তৈরি হয়, সফিউল্লাহর পর খালেদই সেনাপ্রধান হবেন। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নেতারা জিয়াকে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী' মনে করতেন। ওসমানীও জিয়াকে ভালো চোখে দেখতেন না। এ সময় জিয়াকে সেনাবাহিনী থেকে সরিয়ে বার্লিনে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে যায়। এটা জেনে জিয়া কর্নেল (পরবর্তী সময়ে ব্রিগেডিয়ার) খুরশীদ উদ্দিন আহমেদের মাধ্যমে শেখ মুজিবের কাছে তদবির করেন। খুরশীদ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' একজন অভিযুক্ত এবং শেখ মুজিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জিয়ার প্রতি শেখ মুজিবের মনোভাবের কিছু পরিবর্তন হলেও তা যথেষ্ট ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর সহানুভূতি পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদের সঙ্গেও জিয়া যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন। একবার রেগে গিয়ে জিয়া কর্নেল হামিদকে বলেছিলেন, 'শেখকে ওই ব্যাটারাই (সফিউল্লাহ, খালেদ) আমার বিরুদ্ধে খেপিয়েছে।'[৬৯]

নূরুল ইসলাম : জিয়া ক্ষুব্ধ ছিলেন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়টি প্রধানমন্ত্রী নিজেই দেখতেন। পঁচাত্তরের ২৬ মে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী এই মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান। সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে নাখালপাড়ার এমপি হোস্টেলে তিনি ছয়-সাত মাস ছিলেন। এ সময় জিয়া প্রায়ই দুঃখ করে তাঁকে বলতেন, মুক্তিযুদ্ধে তাঁর (জিয়ার) অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি; সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের পদটি তাঁরই পাওয়া উচিত ছিল। এই পদে সফিউল্লাহর নিযুক্তির ব্যাপারে জিয়া ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং এটা তিনি নূরুল ইসলাম চৌধুরীর কাছে গোপন করেননি। নূরুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষ্য অনুযায়ী :

পদাতিক বাহিনীর কাঠামোবিন্যাস নিয়ে একদিন আমি প্রতিরক্ষাসচিব মুজিবুল হক, জেনারেল সফিউল্লাহ ও জিয়ার সঙ্গে আলোচনাকালেই খবর পাই, বঙ্গবন্ধু সফিউল্লাহকে তিন বছরের মেয়াদ শেষে আরও তিন বছরের জন্য সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেছেন। এটা জানার পর জিয়াউর রহমান অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি আমার অফিসে এসে আমাকে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে বলেন। প্রতিরক্ষাসচিব মুজিবুল হককেও বিষয়টি জানান। আমি জিয়াউর রহমানকে দু-এক দিন অপেক্ষা করতে বলি এবং বিষয়টি বঙ্গবন্ধুকে জানাই। সেদিন বঙ্গবন্ধু খুবই রেগে গিয়ে বলেন, 'তুমি এখনই তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তুমি জানো না, জিয়া অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। সে অনেককে দিয়ে বাকশালের সদস্য হওয়ার জন্য আমার কাছে সুপারিশ করেছে। সে ধৈর্য ধরতে জানে না। আমি এখন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদেরই সদস্য করেছি, পরে হয়তো তাকেও করব।' এ কথা শোনার পর আমি বঙ্গবন্ধুকে বললাম, 'পদাতিক বাহিনীর কাঠামোবিন্যাসের জন্য জিয়াকে আমার আরও কিছুদিন দরকার। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে আপনার আদেশের জন্য পাঠিয়ে দেব।' এতে বঙ্গবন্ধু সম্মত হলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনের সবকিছু না বলে আমি জিয়াউর রহমানকে জানালাম যে সফিউল্লাহর নিযুক্তির ব্যাপারে বর্তমানে কিছুই করতে চান না রাষ্ট্রপতি। আমি সেনাবাহিনীর কাঠামোবিন্যাস চূড়ান্ত করার জন্য পদত্যাগের আগ পর্যন্ত জিয়ার কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা করে বললাম, আগামী ১ সেপ্টেম্বর তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করা হবে। এতে জেনারেল জিয়া সম্মত হন।

১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ঘটনার দুই দিন আগে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ সেনাবাহিনীর মধ্যে কিছু ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরে আমাকে অবহিত করেছিলেন। আমরা বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করি। বঙ্গবন্ধুও মনে হয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের কাছ থেকে আগে এর কিছু আভাস পেয়েছিলেন। ডিএফআইয়ের প্রধান ও আমার সঙ্গে আলোচনা করে বঙ্গবন্ধু সফিউল্লাহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। কিন্তু কেন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না বা সম্ভব হয়নি, তা আমার এখনো অজানা। এর দু-তিন দিন পরই ঘটে এ দেশের ইতিহাসের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ।[৭০]

সামরিক বাহিনীর মনস্তত্ত্ব

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতার সদর দরজায় চলে আসে। তৎকালীন সরকার ও রাজনীতি সম্পর্কে সেনাবাহিনীর মধ্যে যে নেতিবাচক মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়েছিল, তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৫ আগস্ট। এই

মনস্তত্ত্ব গড়ে ওঠার পেছনে দুটো ধারণা কাজ করেছিল—সামরিক বাহিনী অবহেলার শিকার এবং সরকার ভারতের লেজুড়। এ ধরনের ধারণা উসকে দেওয়ার মতো রাজনীতিবিদের অভাব ছিল না। একশ্রেণির গণমাধ্যমেও ভারতবিরোধী জিগির ছিল লক্ষণীয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাস্তব কারণেই একধরনের বাংলাদেশ-ভারত সমীকরণ তৈরি হয়েছিল। ওই সময় থেকেই দুই দেশের মধ্যে নানা কারণে টানাপোড়েন শুরু হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দেশ বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ ও প্রচার ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) দেশের হাল ধরে ভারতের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ গণপরিষদের চিফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথম উদাহরণটি হলো, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ফেরত পাঠানো। বাহাত্তরের মার্চেই ভারতীয় বাহিনীর শেষ দলটি ঢাকা ছেড়ে যায়। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহকারী এবং জ্যেষ্ঠ ভারতীয় কর্মকর্তা ডি পি ধরকে নিয়ে। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ধর বাংলাদেশে এসেছিলেন সদ্য স্বাধীন দেশটির সরকারি প্রশাসনের কাঠামো ঠিকঠাক করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। এটা নাকি ভারতের সঙ্গে করা গোপন চুক্তিরই একটি অংশ। বিষয়টি ছিল স্পর্শকাতর। বাংলাদেশের প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তা এটা পছন্দ করেননি।[৭১]

ডি পি ধর শেখ মুজিবের সঙ্গে একদিন সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে মুজিব তাঁকে বলেছিলেন, 'তারপর মি. ধর, কবে দিল্লি ফিরছেন? এসেছেন, কয়েকটা দিন আমাদের এখানে কাটান। বাংলাদেশ মাছের দেশ। এখানকার পদ্মার ইলিশ খুবই উপাদেয়।...কয়েক দিন মাছ-টাছ খান, তারপর যাবেন।' ধর সেদিনই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে যেতে বলা হচ্ছে, সরকারি কাজকর্মের কোনো ইঙ্গিত নেই। তিনি দিল্লির সঙ্গে কথা বললেন, এবং ঢাকা ছেড়ে গেলেন।[৭২]

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে আরও দুই বছর পর, ১৯৭৪ সালে লাহোরে ইসলামি ঐক্য সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করা নিয়ে। মন্ত্রীদের নিয়ে একটা অনানুষ্ঠানিক সভায় শেখ মুজিব লাহোর যাওয়ার প্রসঙ্গ তুললে ড. কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুস সামাদ আজাদ এর বিরোধিতা করেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, 'আমরা ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশ। সুতরাং ইসলামিক দেশসমূহের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' শেখ মুজিব ছিলেন যোগদানের পক্ষে। সম্মেলনে যাওয়ার ব্যাপারে যখন তিনি সিদ্ধান্ত জানালেন, তখন তাঁকে বলা হলো, 'যাত্রাপথে দিল্লিতে নেমে ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে

গেলে সবদিক রক্ষা হয়।' এটা শুনে শেখ মুজিবের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। শাহ মোয়াজ্জেমের ভাষ্য অনুযায়ী :

> বঙ্গবন্ধু টেবিল চাপড়িয়ে রীতিমতো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, আমি কারও মাথা তামাক খাই যে আমাকে মাঝপথে নেমে কারও মত নিতে হবে? তোমরা ভেবেছ কী? আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। কী করব, না করব আমরাই সাব্যস্ত করব। কাউকে ট্যাক্স দিয়ে চলার জন্য দেশ স্বাধীন হয়নি। পিন্ডির গুহা থেকে দিল্লির গর্তে ঢুকব—আমার জীবদ্দশায় তা হবে না। তোমরা যে যা মনে করো, আমি ইসলামাবাদ (প্রকৃতপক্ষে লাহোর) যাব এবং সরাসরি যাব—দিল্লি থামব না।[৭৩]

মুজিববিরোধী চরম ডান ও বাম, বিশেষ করে চীনপন্থী দলগুলো একসুরে প্রচার করছিল যে শেখ মুজিব ভারতের দালাল। সেনা কর্মকর্তারাও, বিশেষ করে লে. কর্নেল (অব.) জিয়াউদ্দিন এবং লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের এ বিষয়ে প্রচুর ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। মেজর রফিকের লেখা *বাংলাদেশ! সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সঙ্কট* গ্রন্থ থেকে ডালিম উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

> মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী অফিসার-সৈনিকেরা স্বাভাবিকভাবেই দেশের দরিদ্রতা, অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও দুর্নীতি দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিকেরা সরকার পরিচালনার মতো একটি দুরূহ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। মেজর ডালিম, মেজর পাশা, মেজর বজলুল হুদা, মেজর শাহরিয়ার তখন কুমিল্লা সেনানিবাসে চাকরিরত ছিলেন। এঁরা প্রায়ই অবসর সময়ে মিলিত হতেন এবং দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আওয়ামী লীগের দুর্নীতিবাজ লোকদের নিয়ে সরকার পরিচালনা এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। এভাবে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৭২ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্নেল তাহের ও ঢাকা সেনানিবাসে কর্নেল জিয়াউদ্দিন প্রতি সপ্তাহে স্টাডি পিরিয়ডের নামে অফিসারদের সমবেত করে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে তরুণ অফিসারদের সঙ্গে সমালোচনায় লিপ্ত হতেন।[৭৪]

সামরিক বাহিনীর অনেক সদস্যের মনে এই ধারণা হয়েছিল যে ভারতের তাঁবেদারি করার জন্য বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে ইচ্ছা করে দুর্বল রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা সাধারণ ধারণা তৈরি হয়েছিল যে তাদের লোকেরা যখন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে যুদ্ধ করেছেন, তখন আওয়ামী লীগের নেতারা কলকাতায় নিরাপদে দিন কাটিয়েছেন। ১৯৭২ সালের মার্চে ভারতের সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদি শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি হওয়ার ফলে অনেকের ধারণা হয় যে দেশে একটা কার্যকর সেনাবাহিনীর দরকার নেই।

১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে বলেছিলেন যে তিনি একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরি করার বিরুদ্ধে। 'আমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো একটা দানব সৃষ্টি করতে চাই না।' জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামে একটা আধা সামরিক বাহিনী তৈরি করে শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। প্রথমে বলা হয়েছিল, রক্ষীবাহিনীকে পুলিশের সহায়ক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। পরে এই বাহিনীকে খোলাখুলিভাবে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের সমালোচকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।[৭৫]

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থাভাজন ছিলেন সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ। জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে যে চাপা অসন্তোষ ও ক্ষোভ ছিল, এটা তাঁরও নজর এড়ায়নি। ১৯৯৩ সালে *ভোরের কাগজ*-এর সম্পাদক মতিউর রহমানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন :

> তখন সরকারের কিছু কার্যকলাপ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। আবার সেনাবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ ছিল।...সরকারবিরোধী কিছু রাজনৈতিক শক্তি এই অবস্থায় সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে।...এদের অবস্থান সরকারের ভেতরেও ছিল এবং বাইরে তো ছিলই।...
>
> সামরিক বাহিনীর মধ্যে যে অসন্তুষ্টির মনোভাব ছিল, সেটা কিছুটা টের পেয়েছিলাম। এই অসন্তুষ্টির কারণে কিছু পকেটে (গ্যারিসন) সরকার সম্পর্কে সমালোচনা দেখা দিচ্ছিল।...আমাদের হাতে একটি লিফলেট আসে; কিছু সেপাই, এনসিও পর্যায়ের লোক সরকারের কার্যকলাপে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এটি বের করেছিল।...
>
> সেনাবাহিনীর সদস্যদের এরকম মনোভাব ছিল যে তারা কিছুটা অবহেলিত। যদিও ব্যাপারটা পুরোপুরি সত্য ছিল না। তবে কতকগুলো কার্যকলাপ, যেমন রক্ষীবাহিনীর আবির্ভাবটা অসন্তোষের একটা বড় কারণ ছিল।...রক্ষীবাহিনীকে যখন দেখত, অন্যরা মনে করত আমরা অবহেলিত, এর ওপর আরেকটি বড় ব্যাপার ছিল। রক্ষীবাহিনীকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়, যা দিয়ে তারা যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারত। যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল দুই বাহিনীর মধ্যে।...
>
> দেশের তৎকালীন অবস্থায়, যেমন 'বাকশাল' গঠন ইত্যাদি নিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া ছিল। আমার মধ্যে কিছু প্রশ্ন ছিল। সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম।
>
> এ ব্যাপারে আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন করি, 'স্যার, সারা জীবন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন। হঠাৎ করে এক পার্টিতে কেন যাচ্ছেন? তিনি

বললেন, 'সফিউল্লাহ, তুমি বুঝবে না...। দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনি, আবার গণতন্ত্রে ফিরে আসব। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'...মনে হয়, এসব কিছুর পরও যদি রক্ষীবাহিনী সামনে না আসত, তাহলে হয়তো সেনাবাহিনী সেগুলো মেনে নিত।...[৭৬]

সামরিক বাহিনীর প্রতি আওয়ামী লীগ সরকারের মনোভাব নিয়ে নানান প্রশ্ন ছিল। এমনকি আওয়ামী লীগের পরীক্ষিত মিত্র বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও (সিপিবি) মনে করে, সামরিক বাহিনীর সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরকারের কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল। সিপিবির একটি মূল্যায়নে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয় :

> তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে সামরিক বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের দেশের সামরিক বাহিনীর জন্ম ও ভিত্তি হয়েছে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে।...
>
> পাকিস্তান আমলে সামরিক বাহিনীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে তেমন বৈরীসুলভ দৃষ্টি গ্রহণ করা খুবই ক্ষতিকর হবে।[৭৭]

ডালিমের একটা বর্ণনা থেকে জানা যায়, কীভাবে তরুণ সেনা কর্মকর্তারা শেখ মুজিবের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এটা ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। ইস্কাটন লেডিস ক্লাবে মেজর ডালিমের খালাতো বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানে একটা গোলমাল হয়। শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী এবং ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলের সঙ্গে ডালিমের শ্যালকের কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে গাজীর 'ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনী' ডালিম দম্পতিকে অপমান করে এবং তাঁদের অপহরণের চেষ্টা চালায়। এই ঘটনা শুনে ঢাকা সেনানিবাসে ডালিমের সহকর্মী বন্ধুরা দুই ট্রাক সেনাসহ গাজীর বাড়িতে হামলা চালায় এবং ওই বাড়ি থেকে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে আসে। উভয় পক্ষ শেখ মুজিবের কাছে বিচার চায়। শেখ মুজিব একটা সামরিক তদন্ত কমিটি করে বিচারের ব্যবস্থা নেন। ৮ জন তরুণ সেনা কর্মকর্তাকে শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগে চাকরিচ্যুত অথবা জোর করে অবসরে পাঠানো হয়। মেজর ডালিম ও মেজর নূরও চাকরি হারান। এই ঘটনার ফলে সেনাবাহিনীতে প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল।[৭৮]

চুয়াত্তরের জানুয়ারিতে যে সেনা কর্মকর্তারা দুই ট্রাক বোঝাই সৈন্য নিয়ে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাকে সাময়িক উত্তেজনার বশে একটা নিয়ম ভাঙার বা বন্ধুর (ডালিমের) প্রতি সহমর্মিতার উদাহরণ হিসেবে ওই সময় হালকাভাবে দেখা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটা অভ্যুত্থানের মহড়া। ওই দিনই একটা অভ্যুত্থান হয়ে যেতে পারত। দেড় বছরের মাথায় এটা ঘটল।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান

পঁচাত্তরের ১৪ আগস্ট রাত ১০টায় নির্মাণাধীন কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের (বর্তমানে ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) রানওয়েতে মেজর ফারুকের বেঙ্গল ল্যান্সার্স এবং মেজর রশিদের সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারির ইউনিট জড়ো হলো। সম্বল তাঁদের ২৮টা ট্যাংক, ১৮টা কামান আর ৭০০ সৈনিক। ট্যাংকগুলোতে কোনো গোলা নেই। রাত ১১টায় উপস্থিত হলেন কয়েকজন কর্মরত, চাকরিচ্যুত ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। তাঁদের মধ্যে আছেন ডালিম, নূর, হুদা, শাহরিয়ার, পাশা, রাশেদ প্রমুখ। ভোর চারটা ৪০ মিনিটে তাঁরা তিনটা দলে ভাগ হয়ে তিন দিকে রওনা হলেন। একটা দল গেল ইস্কাটনে বন্যানিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসার দিকে, একটা দল গেল ধানমন্ডিতে বাকশাল সেক্রেটারি শেখ ফজলুল হক মনির বাসার উদ্দেশে এবং তৃতীয় দলটির গন্তব্য হলো ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে রাষ্ট্রপতি ও বাকশাল চেয়ারম্যান শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন। শেখ মনি সস্ত্রীক নিহত হন। সেরনিয়াবাতসহ তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে হত্যা করা হয়। শেখ মুজিব সপরিবার নিহত হন পাঁচটা ৪০ মিনিটে।[৭৯]

সেরনিয়াবাতের বাসায় অপারেশন শেষ করে ডালিম শাহবাগে অবস্থিত ঢাকা বেতার কেন্দ্রে যান। ভোর ছয়টায় তাঁর কণ্ঠ বেতারে শোনা গেল, 'আমি মেজর ডালিম বলছি। খন্দকার মোশতাকের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বীর সশস্ত্র বাহিনী দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। স্বৈরাচারের পতন হয়েছে।'

সকাল সাড়ে সাতটায় মেজর রশিদ পুরান ঢাকার আগামসি লেনে খন্দকার মোশতাক আহমদের বাসায় হাজির হন। মোশতাককে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় এবং তাঁকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ডালিম ঢাকা সেনানিবাসে যান এবং সকাল সাড়ে ১০টায় তিন বাহিনীর প্রধানকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। তাঁদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জিয়াউর রহমান এবং সিজিএস খালেদ মোশাররফও আসেন।[৮০] সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ, বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার এবং নৌবাহিনীর প্রধান কমোডর এম এইচ খানের নতুন রাষ্ট্রপতির প্রতি আনুগত্য জানিয়ে দেওয়া বিবৃতি রেকর্ড করা হয়। বিডিআরের (বর্তমানে বিজিবি) প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং পুলিশের মহাপরিদর্শক নুরুল ইসলামকে একই উদ্দেশ্যে ডেকে আনা হয়।

সকালে ডালিমের ঘোষণা বেতারে প্রচার হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই

১৫ আগস্ট মোশতাক সরকারের সমর্থনে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে এসেছিলেন বাহিনীপ্রধানেরা। বাঁ থেকে জিয়াউর রহমান, খলিলুর রহমান, এ কে খন্দকার, এম এইচ খান ও খালেদ মোশাররফ

কয়েকজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা তাঁদের সমর্থন ও অভিনন্দন জানাতে বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবু তাহের, আকবর হোসেন, শাজাহান উমর, জিয়াউদ্দিন, রহমতউল্লাহ, মাজেদ এবং পাকিস্তান সামরিক অ্যাকাডেমির সাবেক ক্যাডেট মোস্তাক ও সরাফাত।[৮১] কয়েকজন অসামরিক ব্যক্তিও হাজির হয়েছিলেন বেতার কেন্দ্রে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুজিব সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, জাসদের গণবাহিনীর উপপ্রধান হাসানুল হক ইনু এবং ঢাকা নগর গণবাহিনীর প্রধান লে. কর্নেল তাহেরের ছোট ভাই আনোয়ার হোসেন। ইনুকে তাহের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।[৮২]

বেলা সাড়ে ১১টায় সরকার 'পরিবর্তন' ও নতুন সরকারের ওপর আনুগত্য প্রকাশ করে দেওয়া বাহিনীপ্রধানদের রেকর্ডকৃত বিবৃতি প্রচার করা হয়।[৮৩] রক্ষীবাহিনীর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার এ এন এম নূরুজ্জামানের অনুপস্থিতিতে উপপরিচালক সরোয়ার হোসেন মোল্লা ও আনোয়ার উল আলমকে বেতার কেন্দ্রে নতুন সরকারের পক্ষে আনুগত্যের ঘোষণা দেওয়ার জন্য ডেকে আনা হয়।[৮৪]

অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর সমর্থন ছিল

কেউ কেউ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকে 'কয়েকজন বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার' কাণ্ড বলে হালকা করে দেখেন। বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। ১৬ আগস্ট

সরকারি ইংরেজি দৈনিক *দ্য বাংলাদেশ অবজারভার*-এর প্রধান শিরোনামের প্রথম অংশটি ছিল—আর্মড ফোর্সেস টেক ওভার (সশস্ত্র বাহিনী ক্ষমতা নিয়েছে)। *অবজারভার*-এ 'হিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি' শিরোনামে সম্পাদকীয় ছাপা হয়।[৮৫]

বেলা সোয়া ১১টায় অভ্যুত্থানের কারণ ব্যাখ্যা করে নতুন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ বেতারে একটা ভাষণ দেন। ভাষণটির খসড়া তৈরি করেছিলেন তাহেরউদ্দিন ঠাকুর।

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
>
> আসসালামু আলাইকুম
>
> প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,
>
> এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঠিক ও সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের পূতপবিত্র সামগ্রিক ও সমষ্টিগতভাবে সম্পাদনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার ওপর ভরসা করে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সরকারের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছে। বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের বজ্রকঠিন দায়িত্ব সম্পাদনের পথ সুগম করার জন্য বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সত্যিকারের বীরের মতো অকুতোভয়চিত্তে এগিয়ে এসেছেন।...
>
> দীর্ঘকাল দেশের ভাগ্য উন্নয়নের কোনো চেষ্টা না করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা এবং সেই ক্ষমতাকে স্থায়ীভাবে আঁকড়ে রাখার ষড়যন্ত্রের জাল রচনা করা হয়েছিল।...
>
> একটি বিশেষ শাসকচক্র গড়ে তোলার লোলুপ আকাঙ্ক্ষায় প্রচলিত মূল্যবোধের বিকাশ ও মানুষের অভাব-অভিযোগ প্রকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় দেশবাসী একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে অব্যক্ত বেদনায় তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।
>
> দেশের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন সর্বমহলের কাম্য হওয়া সত্ত্বেও বিধান অনুযায়ী তা সম্ভব না হওয়ায় সরকার পরিবর্তনের জন্য সামরিক বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী পরমতম নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে দেশবাসীর সামনে সম্ভাবনার এক স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করেছেন। এখন দেশবাসী সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্রুত নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোরতম পরিশ্রম করতে হবে।...[৮৬]

শেখ মুজিবের মৃতদেহ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসায় প্রায় ৩২ ঘণ্টা পড়ে ছিল। জীবিত শেখ মুজিব যাঁদের একদিন 'বীর উত্তম' বা 'বীর বিক্রম' খেতাব দিয়েছিলেন, সেসব মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা ঢাকা বেতার কেন্দ্রে এবং বঙ্গভবনে আসর গুলজার করেছিলেন। ধানমন্ডির বাড়িটিতে যাওয়ার কথা কারও

মনে হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন 'পাকিস্তান-প্রত্যাগত' কর্নেল জামিলউদ্দিন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসেবে ওই দিন তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ছিল। শেখ মুজিবের টেলিফোন পেয়ে কর্তব্যের তাড়নায় তিনি ৩২ নম্বর বাড়িটির দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। পথেই তাঁকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়।

শেখ মুজিবের মৃতদেহ দাফন করা নিয়ে বঙ্গভবনে কিছু তর্কবিতর্ক হয়েছিল। ১৫ আগস্ট বিকেলে মোশতাক সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের বিবরণ থেকে জানা যায় :

> ...শপথের পর প্রেসিডেন্টের কক্ষে সব মন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রবীণদের পশ্চাতে ভয়ে ভয়ে আমরাও ঘরে ঢুকে চুপচাপ আসন গ্রহণ করলাম।
>
> সেনাবাহিনীর কয়েকজন অপরিচিত অফিসার সে ঘরে রয়েছে। কারও কারও হাতে কী সব অস্ত্র। ঢোক গিলতেও ভয় হচ্ছে।
>
> প্রেসিডেন্ট মোশতাক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বললেন, যা ঘটেছে আপনারা সব শুনেছেন। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আমাকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। শেখ মুজিব ছিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি—তাঁর মরদেহ বাসস্থানে পড়ে রয়েছে—আমি মনে করি, যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর পিতা-মাতার কবরের পাশে গোপালগঞ্জে স্বগ্রামের বাড়িতে তাঁকে সমাহিত করা হোক। আপনারা যদি কেউ মরদেহের সঙ্গে যেতে চান, যেতে পারেন।
>
> এদিক থেকে কেউ উচ্চবাচ্য করল না। সেনা কর্মকর্তাদের একজন বলে উঠল, আমরা তাঁকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে হত্যা করেছি। আর এক্ষণে আপনি তাঁকে মর্যাদার সঙ্গে দাফন করতে চান—এটা কেমন কথা। এ হতে পারে না।
>
> ...তিনি (মোশতাক) ধমকের সুরে বললেন, ওয়েল, ইন দ্যাট কেস, ইউ টেক ওভার। ইফ আই অ্যাম দ্য প্রেসিডেন্ট ইউ হ্যাভ টু ক্যারি আউট মাই অর্ডারস।
>
> তারা কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই করে মোশতাক সাহেবের প্রস্তাব মেনে পরদিন বঙ্গবন্ধুর লাশ গোপালগঞ্জে নিয়ে সমাহিত করে এসেছিল।[৮৭]

দেশটা যেন হঠাৎ করেই বদলে গেল। ১৬ আগস্ট *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর প্রথম পাতায় সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছিল। শিরোনাম ছিল 'ঐতিহাসিক নবযাত্রা'।[৮৮]

মুজিব হত্যার পরিকল্পনায় খন্দকার মোশতাকের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। খন্দকার মোশতাকের দাবি, তিনি এটা জানতেন না। ১৯৭৬ সালে মোশতাকের গ্রামের বাড়িতে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের এক প্রশ্নের জবাবে মোশতাক কোরআন শরিফ হাতে নিয়ে বলেছিলেন :

খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর শাসনক্ষমতা গ্রহণ
১৯৭৫-এর অভ্যুত্থানের পক্ষে ১৬ আগস্ট *ইত্তেফাক*-এর প্রথম পাতায় সম্পাদকীয়—'ঐতিহাসিক নবযাত্রা'

> এই পবিত্র গ্রন্থ স্পর্শ করে বলতে পারি, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর যখন ওরা আমার কাছে এল দায়িত্ব অর্পণের জন্য, তখনই প্রথম জানতে পারি। তার আগে কিছুই জানতাম না।[৮৯]

খন্দকার মোশতাকের এই বয়ান খুব কম লোকেই বিশ্বাস করেছিল। মুজিব হত্যা ষড়যন্ত্রে শাহ মোয়াজ্জেমেরও জড়িত থাকার কথা শোনা গিয়েছিল। মুজিব হত্যা মামলার চার্জশিটে তাঁর নাম ছিল। আদালতের রায়ে মোয়াজ্জেম ছাড়া পান।

মুজিব হত্যায় খুশি হয়েছিলেন অনেকেই

মুজিব হত্যা প্রসঙ্গে অধ্যাপক আহমদ শরীফের মন্তব্য আমলে নেওয়ার মতো। শেখ মুজিবকে নিয়ে অতি মাতামাতি এবং তাঁর হত্যাকাণ্ডে হঠাৎ করে নির্লিপ্ত হয়ে যাওয়াকে আহমদ শরীফ তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি ডায়েরিতে লেখেন,

> হুজুগে বাঙালি, সুযোগসন্ধানী, সুবিধেবাদী এবং নগদজীবী বাঙালি। চাটুকারিতার তোয়াজে তোষামোদে স্তবে স্তুতিতে ছোট-বড়-মন্দ-মাঝারি সব দেবতার পূজারী বাঙালি আবার যথাসময়ে যথাস্থানে যথাপ্রয়োজনে যথাপাত্রে—অকৃতজ্ঞ হয়ে বেওয়াফা হয়ে নতুন শক্তির ওফাদারী হচ্ছে বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

...মুজিবকে যারা হত্যা করল, তারা গোড়ায় সবাই মুজিবের অনুগতই ছিল।...শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের দুঃশাসন কিন্তু হত্যা-লুণ্ঠনের বিভীষিকা মুজিবকে গণশত্রুতে পরিণত করেছিল।

...১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের আগস্ট অবধি মুজিব শাসন হচ্ছে ত্রাসের, হত্যার, কাড়ার, মারার, জোর-জুলুমের, স্বৈরাচারের, দুর্ভিক্ষের, পীড়নের, শোষণের, জবরদখলের ও জবরদস্তির হৃৎকাঁপনো বীভৎস রূপ। তাই তার সপরিবার হত্যায়ও কেউ দুঃখশোক পায়নি।[১০]

শেখ মুজিব নিহত হওয়ায় অনেকেই খুশি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তাঁর দলের লোক, যাঁদের তিনি বাকশালের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বানিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগবিরোধীরা স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তি পেয়েছিলেন, উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই। জাসদের গণবাহিনী ওই সময় একটা লিফলেট প্রকাশ করে। এর শিরোনাম ছিল, 'খুনী মুজিব খুন হয়েছে—অত্যাচারীর পতন অনিবার্য'।

শেখ মুজিব নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটা অধ্যায়ের শেষ হলো। সূচনা হলো নতুন অধ্যায়ের। মঞ্চে আবির্ভূত হলো নতুন কুশীলবরা। তাদের মধ্যমণি জিয়াউর রহমান।

উত্থান

জিয়া সেনাপ্রধান হলেন

চারদিকে পালাবদলের হাওয়া। ২০ আগস্ট রাষ্ট্রপতি মোশতাক একটি ঘোষণা দিয়ে সামরিক আইন জারি করলেন। ঘোষণায় বলা হলো, সামরিক আইন ১৫ আগস্ট ভোরবেলা থেকে কার্যকর হয়েছে। একই সঙ্গে সংবিধানও কার্যকর থাকল। খন্দকার মোশতাক আহমদ স্বাক্ষরিত এই ঘোষণার 'চ' ধারায় বলা হলো :

> ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের প্রাতঃকালে বলবৎ ছিল এমন সকল আইন, অধ্যাদেশ, রাষ্ট্রপতির আদেশ ও অন্যান্য আদেশ, ফরমান, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল রহিত, প্রত্যাহৃত বা সংশোধিত না হইলে বলবৎ থাকিবে।[১]

সামরিক আইন জারি হওয়ার ফলে নাগরিক অধিকারের পরিধিতে ব্যাপক কোনো পরিবর্তন হয়নি। কেননা, অধিকার সংকোচনের পালা শুরু হয়েছিল আগে থেকেই। ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর সারা দেশে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করা হয়েছিল। ওই আদেশের বলে সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২ ও ৪৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকারগুলোর কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়েছিল।[২]

সেনাবাহিনীতে পরিবর্তনের প্রথম কোপটি পড়ল সেনাপ্রধান সফিউল্লাহর ওপর। ২৪ আগস্ট তাঁকে সরিয়ে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ব্রিগেডিয়ার মাশহুরুল হক, ব্রিগেডিয়ার সি আর দত্ত এবং ব্রিগেডিয়ার কাজী গোলাম দস্তগীর—এই তিনজন জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে দিল্লিতে একটা সামরিক কোর্সে থাকা অবস্থায় ব্রিগেডিয়ার হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে

সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়। এর আগে একই দিন জেনারেল (অব.) ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা বানানো হয়।[৩]

জিয়া ছিলেন ফারুক-রশিদের পছন্দের লোক। সেনাপ্রধান হওয়ার খবরটা পেয়ে জিয়া শুধু খুশিই হননি, তিনি মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঢাকার স্টেশন কমান্ডার লে. কর্নেল এম এ হামিদের বর্ণনায় জানা যায় :

> ২৪ তারিখ অনুমান দুপুর ১২টায় জেনারেল জিয়ার ফোন আসল। তার উত্তেজিত কণ্ঠ, কাম হিয়ার জাস্ট নাউ।
>
> আমি আমার অফিসে তখন কী একটা কনফারেন্স করছিলাম। বললাম : একটু পরে আসলে হবে না? বলল : শাট আপ, কাম জাস্ট নাউ। আমি মিটিং ভঙ্গ করে তার ওখানে ছুটলাম। বলাবাহুল্য জেনারেল জিয়া আমার কোর্স মেট। তার সঙ্গে অফিসের বাইরে আমার ছিল 'তুই' 'তুকার' সম্পর্ক।...
>
> আমি তার অফিসে ঢুকতেই মিলিটারি কায়দায় ডাঁট মেরে গর্জে উঠল, স্যালুট প্রপারলি ইউ গুফি, ইউ আর এন্টারিং চিফ অব স্টাফ'স অফিস। আমি থমকে গেলাম। সে মুচকি হাসতে লাগল। তার হাতে একখানা টাইপ করা সাদা কাগজ। হেসে হেসে আমার চোখের সামনে সেটা নাড়তে লাগল। বলল, সিট ডাউন, রিড ইট। আমি তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে দেখলাম, মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স থেকে ইস্যুকৃত অফিশিয়াল চিঠি। তাকে প্রধান সেনাপতি করে নিয়োগপত্র।...চিঠিটা পেয়ে সে প্রথমেই আমাকে ডেকেছে। বলল, হামিদ, এখন কী করা যায়? জিজ্ঞাসা করলাম, সফিউল্লাহ চিঠি পেয়েছে? সে জানে?
>
> না, এখনো কেউ জানে না।
>
> বললাম, তাহলে প্রথমে তার কাছেও কপি পৌঁছাতে হবে। তারপর অফিশিয়ালি সে হয়তো কয়দিন সময় নিয়ে তোমাকে 'হ্যান্ড ওভার' করবে। এখন একটু চুপ থাকো।
>
> বলল : শাট আপ, আমি কাল থেকেই টেক ওভার করব। আমি তাকে বোঝালাম, দেখো, এটা তো তুমি 'ক্যু' করতে যাচ্ছ না। সরকারের অফিশিয়াল চিঠি রয়েছে। তোমাকে তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়াই হয়ে গেছে।
>
> সে বলল, তুই এসব বুঝবি না। হি ইজ ভেরি ক্লেভার পারসন। তুমি আগামীকাল ঢাকা স্টেশনের সব ইউনিটের অফিসার ও সৈনিকদের বড় মাঠে একত্র হওয়ার নির্দেশ পাঠাও।...
>
> পরদিন সকালে সারা ক্যান্টনমেন্টে মহা উত্তেজনা। অফিসার, জওয়ান সবাই সিগন্যাল মেসের গ্রাউন্ডে সমবেত হয়েছে। কেউ কিছু জানে না, কী ব্যাপার। ঠিক সাড়ে সাতটার সময় ডেপুটি চিফ জিয়াউর রহমান মঞ্চে এসে হাজির। সবাই অ্যাটেনশন। জিয়া মঞ্চ থেকে চিৎকার দিয়ে গর্জন করে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, আজ থেকে আমি চিফ অব স্টাফ।...বলেই মঞ্চ থেকে দ্রুতপদে প্রস্থান।

ওদিকে সফিউল্লাহ এ ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে।...সফিউল্লাহ আমাকে টেলিফোন করল, হামিদ, এসব কী হচ্ছে?

...সে দারুণ বিরক্ত ও অপমান বোধ করলেও পরিস্থিতির কারণে পরিবর্তন মেনে নিতে বাধ্য হলো। ওই দিন থেকে সফিউল্লাহ আর অফিসেই আসল না।[৪]

১৫ আগস্টের ঘটনাবলির পেছনে জিয়াউর রহমানের ষড়যন্ত্র আছে—এমন একটা অভিযোগ শোনা যায়। এই অভিযোগ কতটা অনুমাননির্ভর এবং কতটা যৌক্তিক, এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে মুখরোচক আলোচনা থাকলেও এ বিষয়ে তেমন কোনো অনুসন্ধান কিংবা গবেষণা হয়নি। এটা ঠিক যে পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের ফলে জিয়া সেনাপ্রধান হতে পেরেছিলেন। শেখ মুজিব নিহত না হলে জিয়ার উত্থান হতো না, এটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। কিন্তু এটাও ঠিক যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলে সফিউল্লাহ নন, জিয়াই হতেন সেনাপ্রধান। জিয়া সেনাবাহিনী ছেড়ে অন্য কোনো অসামরিক পদে চাকরির ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। বলা যায়, তিনি মাটি কামড়ে পড়ে ছিলেন। একজন পেশাদার সেনা কর্মকর্তা হিসেবে তিনি তাঁর বাহিনীর চূড়ায় আরোহণের স্বপ্ন দেখতেই পারেন। একটা নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। জিয়াউর রহমান এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা করেছিলেন কি না, তা নিয়ে কোনো অ্যাকাডেমিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ হয়নি। জিয়ার দিকে সন্দেহের তির ছুড়ে দেওয়ার পক্ষে একটিমাত্র উদাহরণের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আর তা হলো—তাঁর সঙ্গে দেখা করে রশিদের কথাবার্তা বলার ঘটনাটি। শৃঙ্খলাভঙ্গের এই অপরাধের কথা তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ সেনাপ্রধান সফিউল্লাহকে জানাননি—সন্দেহের উৎস এখানেই। তবে দুটো ঘটনার উল্লেখ করা চলে, যাতে মনে হতে পারে যে জিয়া নিজে সরাসরি কোনো ষড়যন্ত্র করেননি, ষড়যন্ত্রের সুবিধা ভোগ করেছেন।

প্রথম ঘটনাটি ১৫ আগস্ট সকাল ছয়টার। রশিদ নিজ মুখে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঢাকার ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলেন, 'উই হ্যাভ কিলড শেখ মুজিব।' শাফায়াত তাঁর ব্রিগেড মেজর হাফিজউদ্দিন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই গেলেন সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জিয়াউর রহমানের বাসায়। শাফায়াতের কাছে সব শুনে জিয়া একটু হকচকিত হয়ে গেলেন। তবে বিচলিত হলেন না তিনি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'সো হোয়াট, প্রেসিডেন্ট ইজ ডেড? ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ দেয়ার। গেট ইয়োর ট্রুপস রেডি। আপহোল্ড দ্য কনস্টিটিউশন।' (রাষ্ট্রপতি মারা গেছেন, তাতে কী হয়েছে? উপরাষ্ট্রপতি আছেন। তোমার সৈন্যদের প্রস্তুত রাখো। সংবিধান অনুযায়ী চলো)।[৫]

দ্বিতীয় ঘটনাটি জিয়ার সেনাপ্রধান হওয়ার পরের দিন, অর্থাৎ ২৫ আগস্টের। কর্নেল শাফায়াত জামিল জেনারেল জিয়ার অফিসে বসে আছেন। এমন সময় হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকলেন সদ্য পদোন্নতি পাওয়া মেজর জেনারেল এরশাদ। প্রশিক্ষণের জন্য তখন তাঁর দিল্লিতে থাকার কথা। তাঁকে দেখে জিয়া রেগে গিয়ে বেশ রূঢ়ভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, অনুমতি ছাড়া তিনি কেন দেশে ফিরে এসেছেন। জবাবে এরশাদ বললেন, দিল্লিতে অবস্থানরত তাঁর স্ত্রীর জন্য তিনি একজন গৃহভৃত্য নিতে এসেছেন। এটা শুনে জিয়া রেগে গিয়ে বলেন, 'আপনার মতো সিনিয়র অফিসারদের এই ধরনের লাগামছাড়া আচরণের জন্যই জুনিয়র অফিসাররা রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করে দেশের ক্ষমতা দখলের মতো কাজ করতে পেরেছে।' জিয়া তাঁর ডেপুটি এরশাদকে পরবর্তী ফ্লাইটেই দিল্লি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁকে বঙ্গভবনে যেতেও নিষেধ করলেন। কিন্তু সেনাপ্রধানের নির্দেশ অমান্য করে রাতে এরশাদ বঙ্গভবনে যান এবং অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থানরত অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন।[৬]

২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৭৫) রাষ্ট্রপতি মোশতাক আহমদ 'ইনডেমনিটি' অধ্যাদেশ জারি করে ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সেনা কর্মকর্তাদের আইনি সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এই আদেশে বলা হয়েছিল, ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত কারও বিচার করা যাবে না।

অক্টোবরের শেষ দিকে সেনাবাহিনীর প্রমোশন বোর্ডের সভায় লে. কর্নেল হিসেবে পদোন্নতির জন্য কয়েকজন মেজরের নাম প্রস্তাব করা হয়। রশিদ, ফারুক ও ডালিমের নাম ছিল এই তালিকায়। কর্নেল শাফায়াত জামিলের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি প্রমোশনের পরিবর্তে তাঁদের বিচারের জন্য সুপারিশ করেন। বিডিআরের প্রধান মেজর জেনারেল কাজী গোলাম দস্তগীর, ব্রিগেডিয়ার সি আর দত্ত এবং কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল আমজাদ আহমেদ চৌধুরী শাফায়াতকে সমর্থন দিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে তাঁদের বিরোধিতা 'খড়কুটোর মতো ভেসে যায়'।[৭] রশিদ, ফারুক ও ডালিম লে. কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি পান।

নভেম্বরের পালাবদল

১৫ আগস্ট (১৯৭৫) যাঁদের নিয়ে খন্দকার মোশতাক সরকার গঠন করেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগ বা বাকশালের নেতা। ৩ অক্টোবর বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন, ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হবে এবং ১৯৭৭

সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন হবে একটা 'সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠন ও পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার' কায়েমের জন্য।[৮]

খন্দকার মোশতাকের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা এবং 'সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের' পরিকল্পনাটি অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি। যাঁরা সামরিক শাসন প্রলম্বিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা নিজস্ব ছক আঁকতে থাকেন।

খন্দকার মোশতাক জিয়াকে সেনাপ্রধান করলেও জিয়া একচ্ছত্র ক্ষমতা পাননি। মোশতাক ওসমানীকে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা বানালেন। তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের জন্য বাহিনীপ্রধানদের ওপর 'চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ' নামে একটা পদ তৈরি করে বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে সেই পদে বসালেন। অর্থাৎ জিয়ার ওপরে জেনারেল খলিল, তাঁর ওপরে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ওসমানী, তাঁর ওপর বঙ্গভবনে থাকা ফারুক-রশিদ ও অন্যান্য মেজরের ছড়ি ঘোরানো। এত সব ধাপ ডিঙিয়ে তাঁকে রাষ্ট্রপতি মোশতাকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হতো। সামরিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মোশতাক ওসমানীর সঙ্গেই পরামর্শ করতেন, জিয়াকে তেমন পাত্তা দিতেন না। সরাসরি কথাও বলতেন না। এতে জিয়া ভেতরে ভেতরে মোশতাকের ওপর নাখোশ ছিলেন।[৯]

দেশে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। ঝড়ের আগে যেমন একটা গুমোট ভাব দেখা যায়, অনেকটা সেরকম। বঙ্গভবনের ঘটনাপ্রবাহ ওই সময় খুব কাছ থেকে দেখেছেন মোশতাকের প্রতিমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> কোথাও যেন সমন্বয় ঘটছিল না। সরকার প্রকাশ্যে বেসামরিক ও আওয়ামী লীগের সরকার। কিন্তু মোশতাক সাহেবের সত্যিকারের ক্ষমতার উৎস ছিল সামরিক ব্যক্তিরা। তারা ব্যারাকে নয়, সশরীরে অবস্থান করে বঙ্গভবনে।...সৈন্যরা ব্যারাকে ফিরে যাবে—এটাই স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্ট নাকি সে মর্মে নির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান সব বুঝেশুনে এগোচ্ছিলেন।...জিয়াউর রহমান নাকি বলে পাঠিয়েছিলেন, এদের উপস্থিতিতে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে—তাই তাদের প্রেসিডেন্টের হেফাজতেই রাখা যাক।[১০]

জিয়া ভাবলেন, মেজরদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে আনলেই তাঁর সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। 'মোশতাক-ওসমানী-খলিল চক্র' ধ্বংস করতে না পারলে তাঁর পক্ষে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এটাই ছিল জিয়ার ওই সময়ের মাথাব্যথার কারণ।[১১] কর্নেল হামিদের পর্যবেক্ষণে ওই সময়ে ক্যান্টনমেন্টে ক্ষমতার লড়াইয়ের নানা দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

মেজরদের উৎখাত আর চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে এবার এক প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালেন শাফায়াত জামিল ও খালেদ মোশাররফ।...তারা জিয়াকে শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানালেন। কিন্তু জিয়া নিরুত্তর। তিনি একূল-ওকূল দুকূল রক্ষা করেই চলছিলেন।...

জিয়া দুই প্রান্তের লোকজনের সঙ্গেই যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। একদিকে ফারুক-রশিদের পিঠ চাপড়ানো, অন্যদিকে শাফায়াত জামিলের কাঁধে হাত, দুই-ই করছিলেন।...

জিয়া তলে তলে আরেকটি কাজ করছিলেন। তা হলো, তিনি সবার অজ্ঞাতে জাসদের কর্নেল (অব.) আবু তাহেরের সঙ্গে গোপন কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জাসদের আর্মস উইং ইতিমধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। শেখ সাহেবকে উৎখাতের জন্য ইতিপূর্বে তারাও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জিয়া সবার অজ্ঞাতে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর সুহৃদ কর্নেল তাহেরের সঙ্গে গোপন কথাবার্তা চালিয়ে যান।[১২]...

আগস্ট-পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলের বিবরণটি ভিন্ন রকমের। তাঁর কাছে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান এবং সিজিএস খালেদ মোশাররফের মধ্যে কখনো বৈরী সম্পর্ক ছিল, এটা মনে হয় না। তবে জিয়াকে তাঁর মনে হয়েছে অনেকটা দোদুল্যমান চরিত্রের। পঁচাত্তরের অক্টোবরে জিয়া 'অভ্যুত্থানকারী সেনা কর্মকর্তাদের বিশৃঙ্খল কার্যকলাপের গুরুতর অভিযোগ' করেন শাফায়াতের কাছে। শাফায়াত তাঁকে বলেন, 'স্যার, আপনি চিফ, আপনি অর্ডার করলে আমি জোর করে এদের চেইন অব কমান্ডে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারি।' শাফায়াতের বিবরণ অনুযায়ী :

কিন্তু জিয়া ভুগছিলেন দোটানায়। ১৫ আগস্টের ভয়াবহ ঘটনাবলি তাঁকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। তখন তিনি এক পা এগোন তো দু'পা পিছিয়ে যান। মনে হলো, চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারছেন না জিয়া। যা করার নিজেদেরই করতে হবে।...

অক্টোবরের মাঝামাঝি রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ওসমানী বঙ্গভবনে সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের একটা কনফারেন্স ডাকেন।...কনফারেন্সে ওসমানী সবাইকে রাষ্ট্রপতি মোশতাক ও তাঁর সরকারের প্রতি অনুগত থাকার নির্দেশ দেন। যেকোনো রকম অবাধ্যতা সমূলে উৎখাত করা হবে বলে জানালেন তিনি। ওসমানী এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রেজিমেন্টের সিনিয়র জেসিওদের কাছে ডেকে নিয়ে বলতে লাগলেন, যারা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারা ভারতীয়দের প্ররোচনাতেই তা করবে, তারা সব ভারতীয় এজেন্ট।...

অক্টোবরের ২৮/২৯ তারিখ হবে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আমাকে বললেন, 'কিছু কি ভাবছ? এরকমভাবে দেশ ও আর্মি চলতে পারে না। জিয়া এগিয়ে আসবে না। ডু সামথিং।' ব্রিগেডিয়ার খালেদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর

প্রধান ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানের আলাপ হয়েছিল এ ব্যাপারে। খালেদ আমার মত চাইলেন। আমি বললাম, 'আপনি দিন-তারিখ বলেন। আমি প্রস্তুত।'

২৯ অক্টোবর রাত ১১টায় জিয়া আমাকে তাঁর অফিসে ডাকলেন। ডেকে আমাকে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে মেজর শাহরিয়ার অশালীন ব্যবহার করেছে। জিয়া বললেন, 'এরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছে। ট্যাঙ্কগুলো থাকাতেই ওদের এত ঔদ্ধত্য। তুমি একটা এক্সারসাইজের আয়োজন করে ট্যাঙ্কগুলো সাভারের দিকে নিয়ে যাও।' আমি উৎসাহিত হয়ে জানতে চাইলাম, কবে নাগাদ এটা করব। জবাবে জিয়া বললেন, 'জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে করো।' আমি চুপসে গেলাম। আমরা ভাবছিলাম দু-এক দিনের মধ্যেই কিছু করার কথা, আর জিয়া কিনা ট্যাঙ্ক বাইরে নিতে বললেন আরও ২/৩ মাস পর! আমার মনে হলো, জিয়াকে নিয়ে কিছু করা যাবে না। বরং খালেদ মোশাররফের সঙ্গেই কাজ করা যাক। ১ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান ও আমি খালেদের অফিসে বসলাম। বিস্তারিত আলোচনার পর খালেদ সিদ্ধান্ত দিলেন ২ নভেম্বর দিবাগত রাত দুটোয় বঙ্গভবনে মোতায়েন আমার দুটো কোম্পানি ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসবে, সেটাই হবে আমাদের অভ্যুত্থান সূচনার ইঙ্গিত।[১৩]

বঙ্গভবনে অবস্থানরত মেজররা সবাই যে একই রকম চিন্তা করতেন, তা নয়। তবে একটা পাল্টা অভ্যুত্থানের আশঙ্কা তাঁরা করছিলেন। এই আশঙ্কা থেকেই তাঁরা জিয়ার ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং মোশতাক-ফারুক-রশিদদের বিরুদ্ধে যখন ঢাকা সেনানিবাসের ৪৬ ব্রিগেডে কর্নেল শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলছে, তখন আওয়ামী লীগবিরোধী অনেক দলের সঙ্গে ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের কুশীলবরা যোগাযোগ করেন। ডালিমের বর্ণনায় বিষয়টি উঠে এসেছে।

আসন্ন বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছিল 'সেনা পরিষদ'। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম; যেকোনো প্রতিবিপ্লবের মোকাবিলা করার জন্য বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমিক সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। আলোচনা হলো সাম্যবাদী দলের নেতা তোহা ভাই, সর্বহারা পার্টির মাহবুব, জাসদের মেজর জলিল (তখন জেলে বন্দী) এবং গণবাহিনীর নেতা কর্নেল তাহেরের সঙ্গে।

সোভিয়েত-ভারত মদদপুষ্ট যেকোনো প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন সবাই। সবকিছু জানার পর কর্নেল তাহের বলেছিলেন, 'এই মুহূর্তে জেনারেল জিয়ার বিরোধিতা করা দেশদ্রোহিতারই সমান। কারণ, বর্তমান অবস্থায় সেনাবাহিনীর

পুনর্গঠন এবং ঐক্যের প্রয়োজনে জেনারেল জিয়ার কোনো বিকল্প নেই।...খালেদ যদি সত্যিই জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে তার নেতৃত্বাধীন গণবাহিনী 'সেনা পরিষদের' সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই চক্রান্তের বিরোধিতা করবে। আবার আমরা শুরু করব সমাজ পরিবর্তনের অসমাপ্ত বিপ্লব।'...সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, যেকোনো হুমকি মোকাবিলা করার জন্য 'সেনা পরিষদ' এবং 'গণবাহিনী' যৌথভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে অতি সতর্কতার সঙ্গে। কর্নেল তাহের এবং আমাদের মাঝে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের বন্দোবস্ত করা হলো।[১৪]

২ নভেম্বর রাতে গণেশ উল্টে গেল। মুখ্য ভূমিকায় কর্নেল শাফায়াত জামিলের ৪৬ ব্রিগেড। এই ব্রিগেডের অধীনে মেজর ইকবালের কমান্ডে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য বঙ্গভবনের পাহারায় ছিল। তারা পাহারা উঠিয়ে সেনানিবাসে ফিরে এল। এটাই ছিল অভ্যুত্থানের প্রথম পর্ব। একই সঙ্গে অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় পর্বটি সমাধা হলো। প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি দল ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহর নেতৃত্বে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করল। লে. কর্নেল এম এ হামিদের ভাষ্য অনুযায়ী, জিয়া বন্দী হওয়ার পর খালেদ মোশাররফ চলে আসেন চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে। চতুর্থ বেঙ্গলের লে. কর্নেল আমিনুল হককে সরিয়ে তিনি সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শাফায়াত জামিল, লে. কর্নেল মালেক, ব্রিগেডিয়ার রউফ, ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান, মেজর হাফিজউদ্দিন, মেজর ইকবাল, মেজর নাসের, মেজর আমিন, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত প্রমুখ।[১৫]

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে কর্নেল শাফায়াত জামিলের নিজস্ব বয়ানটি ভিন্ন। ১৫ আগস্টের পর থেকেই 'অভ্যুত্থানকারী খুনিদের' বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটা চিন্তা করেছিলেন বলে তিনি দাবি করেছেন। শাফায়াতের ভাষ্য অনুযায়ী :

পরিকল্পনামতো রাত তিনটায় বঙ্গভবনে মোতায়েন প্রথম বেঙ্গলের কোম্পানি দুটো ক্যান্টনমেন্টে চলে এল। আমার স্টাফ অফিসারবৃন্দ—মেজর নাসের, মেজর ইকবাল, মেজর মাহমুদ এবং এমপি অফিসার মেজর আমিন অভ্যুত্থান শুরুর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।...ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহ জিয়ার বাসায় গিয়ে তাঁকে প্রোটেক্টিভ কাস্টডিতে এনে নিষ্ক্রিয় করে ফেলল।...

চতুর্থ বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসারের দপ্তরে আমাদের থাকার কথা ছিল রাত দুইটায়। আমি তখন থেকে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করি। কিন্তু খালেদ মোশাররফ বা নুরুজ্জামান কারোরই দেখা নেই, এত দিন অন্য যাঁরা প্রতিনিয়ত বলতেন একটা কিছু করার জন্য, তাঁদেরও দেখা নেই। রুদ্ধশ্বাস দীর্ঘ অপেক্ষার

পর খালেদ মোশাররফ এলেন শেষ রাতে চারটার দিকে। ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান এসেছিলেন সকালে।...

স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকতের মাধ্যমে বিমানবাহিনীর সহায়তা নিশ্চিত করা হয়। ২ নভেম্বর মধ্যরাতে স্কোয়াড্রন লিডার ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পর্যায়ের ১০ জন অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।...স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত, বদরুল আলম, জামান এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল রশিদ, সালাহউদ্দিন, ওয়ালী, মিজান এবং ফ্লাইং অফিসার কাইয়ুম ও ফরিদুজ্জামান সেদিন এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ বিমানের একজন বৈমানিক ক্যাপ্টেন কামাল মাহমুদও আমাদের পক্ষে সেদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[১৬]

৩ নভেম্বর সকালে চতুর্থ বেঙ্গলের সদর দপ্তরে বসে খালেদ মোশাররফ একটা দাবিনামা তৈরি করলেন। দাবিগুলো ছিল :

(ক) ট্যাংক ও কামান বঙ্গভবন ও শহর থেকে সেনানিবাসে ফেরত পাঠাতে হবে।

(খ) জিয়া এখন থেকে আর চিফ অব স্টাফ নন।

(গ) বঙ্গভবন থেকে ফারুক-রশিদসহ অন্য কর্মকর্তাদের সেনানিবাসে ফিরিয়ে এনে চেইন অব কমান্ড পুনরুদ্ধার করতে হবে। খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হিসেবে থেকে যাবেন।

এ সময় ব্রিগেডিয়ার রউফ আরেকটি দাবি সংযোজন করলেন, খালেদ মোশাররফকে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ঘোষণা করতে হবে। বঙ্গভবনে দুই পক্ষে সারা দিন দর-কষাকষি চলল। সন্ধ্যায় আপসরফা হলো। ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ১৭ জন কর্মকর্তা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিমানে ব্যাংককের পথে ঢাকা ছাড়েন।[১৭] রাত তখন সাড়ে দশটা।[১৮]

দুপুরের দিকে পুলিশের মহাপরিদর্শক টেলিফোনে বঙ্গভবনে জেনারেল খলিলকে জানান, গত রাতে সেনাবাহিনীর লোকজন জেলে ঢুকে আওয়ামী লীগের চারজন নেতাকে (তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান) হত্যা করেছে। জেনারেল খলিল রাষ্ট্রপতির সচিব মাহবুব আলম চাষীকে খবরটি দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে জানাতে বলেন। চাষী রাষ্ট্রপতিকে সংবাদটি দিয়ে তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ঘটনা জানেন।' পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় 'জেনারেল খলিল এই সংবাদটি আর কাউকে শোনাননি, চেপে যান। তাঁর কথা হলো, আমি ডিফেন্স স্টাফ প্রধান। আমার দায়িত্ব প্রেসিডেন্টকে ঘটনাটি জানানো, আমি তা-ই করেছিলাম। অন্যদের বলাবলি করতে যাব কেন?'[১৯]

বঙ্গভবনে তখন চলছে অন্য রকম নাটক। খালেদ সেনাপ্রধান হওয়ার জন্য

দেনদরবার করছেন। মোশতাক গোঁ ধরলেন, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ছাড়া তিনি এটা করবেন না।

৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে খোন্দকার মোশতাক মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকলেন। সভা চলাকালে গোল বাধল। ওই সন্ধ্যার ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন :

> হঠাৎ দরজা খুলে একদল সশস্ত্র সামরিক অফিসার ক্যাবিনেট রুমে ঢুকে চারদিকে অস্ত্র উঁচিয়ে চিৎকার করতে থাকল। অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিতে থাকল...তারা মন্ত্রীদের লক্ষ্য করে অস্ত্র তাক করে ট্রিগারে হাত রেখে প্রস্তুত। যেকোনো সময় আর একটি বৃহদাকারের বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে যাবে। একজন কেউ চিৎকার করে বলছে, উই ওয়ান্ট খালেদ মোশাররফ। হি হ্যাজ টু বি মেইড চিফ অব স্টাফ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ইউ আর এ বাস্টার্ড স্যার, ইউ আর এ কিলার। ইউ উইল বি ফিনিশড।
>
> এ ধরনের নানা গালাগাল বর্ষিত হচ্ছিল। খন্দকার মোশতাকের ওপরই রাগ বেশি।...তাদের কেউ কেউ প্রচুর মদ্যপান করে এসেছিল। ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছিল না।...অনেক পরে শুনেছি, তাদের দেনদরবার মোশতাকের সঙ্গে গত দুদিন ধরেই চলছিল। খালেদ মোশাররফ বারবার মোশতাককে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে আর্মি চিফ বানিয়ে তিনিই প্রেসিডেন্ট থাকুন। মোশতাক রাজি হচ্ছিলেন না। তাঁরা এখন তার প্রতিশোধ নেবে। পরে যার নাম সবচাইতে বেশি শুনেছি, সে হলো শাফায়াত জামিল। আরও পরে একসঙ্গে জাতীয় পার্টি করেছি সেই মেজর ইকবাল, কর্নেল আবদুল মালেক এবং লে. কর্নেল জাফর ইমামও সেই দলভুক্ত ছিল।
>
> ...জেনারেল ওসমানী সাহেব ওদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, একি করছ, খবরদার, কখনো গুলি করো না।...স্তব্ধ বিমূঢ় মোশতাক সাহেবকেও তিনি বললেন, 'স্যার, এরা যা বলে সই করে দিন, যা চায় তা-ই করুন।...'
>
> বেশ কিছুক্ষণ পর ওসমানী সাহেব ওদের দু-একজনকে নিয়ে কতকগুলো টাইপ করা কাগজ মোশতাক সাহেবের সম্মুখে ধরলেন এবং বললেন, স্বাক্ষর করে দিন।
>
> নীরব মোশতাক একে একে সব কটি কাগজে সই করে দিলেন। পরে জানা গিয়েছিল, খালেদ মোশাররফের প্রমোশন, জেল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিশন গঠন আরও কী সব কাগজে সই করে দিয়েছেন।...[২০]

কর্নেল শাফায়াত জেল হত্যাকাণ্ডের খবর পান ৪ নভেম্বর সকাল ১০টায়। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে তিনি বঙ্গভবনে যান। সারা দিন বঙ্গভবনে বসে খালেদের দেনদরবারের কথা জেনে তিনি বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হন। শাফায়াত দেখলেন করিডরে মোশতাক খালেদকে উত্তেজিতভাবে বলছেন, 'আই হ্যাভ সিন মেনি ব্রিগেডিয়ারস অ্যান্ড জেনারেলস অব পাকিস্তান আর্মি। ডোন্ট ট্রাই টু টিচ মি।'

পাশে ওসমানী দাঁড়িয়ে আছেন। করিডরে মেজর ইকবাল ও অনেক সৈন্য ছিলেন। ইকবাল ততোধিক উত্তেজিত কণ্ঠে মোশতাককে বললেন, 'ইউ হ্যাভ সিন দ্য জেনারেলস অব পাকিস্তান আর্মি। নাও ইউ সি দ্য মেজরস অব বাংলাদেশ আর্মি।' এর মধ্যে সৈনিকেরা গুলি চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওসমানী বিপদ আঁচ করে বলে উঠলেন, 'শাফায়াত, সেভ দ্য সিচুয়েশন। ডোন্ট রিপিট বার্মা।' মেজর ইকবাল ও মোশতাকের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন কর্নেল শাফায়াত, ইকবালকে এক পাশে সরিয়ে দিলেন এবং মোশতাককে নিয়ে ক্যাবিনেট কক্ষে ঢুকলেন। ওই ঘরে মেজর জেনারেল খলিল বসে ছিলেন। শাফায়াত তাঁকে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'আপনি চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ, প্রায় ৪০ ঘণ্টা হয়ে গেছে জেলখানায় জাতীয় নেতাদের হত্যা করা হয়েছে, তারও ঘণ্টা কুড়ি পর দেশ ত্যাগ করেছে খুনিরা, আপনি এসবই জানেন, কিন্তু আমাদের বলেননি কিছুই। এই ডিসগ্রেসফুল আচরণের জন্য আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হচ্ছি।' খলিল নিশ্চুপ। শাফায়াত এরপর ধরলেন মোশতাককে। 'স্যার, আপনি আর এই পদে থাকতে পারেন না। কারণ, আপনি একজন খুনি। জাতির পিতাকে হত্যা করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। এসব অপরাধের জন্য বাংলার জনগণ আপনার বিচার করবে। আপনি অবিলম্বে পদত্যাগ করুন। আপনার পদত্যাগের পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট হবেন।' মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী প্রতিবাদ করে বললেন, 'কোন বিধানে এটি হবে।' জবাবে শাফায়াত বলেন, 'খন্দকার মোশতাক যে বিধানে আজ প্রেসিডেন্ট, একই বিধানে প্রধান বিচারপতিকে প্রেসিডেন্ট করতে হবে।' কর্নেল মালেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির দায়িত্ব নেন।[২১]

৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি মোশতাক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করেন। খালেদকে মেজর জেনারেলের পদ দেওয়া হয়। ওই রাতেই মোশতাক পদত্যাগপত্রে সই করেন। বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইটে মোশতাককে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ১৫ আগস্ট ও জেল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে মোশতাকের প্রতিমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে এম ওবায়দুর রহমান, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।[২২]

৫ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের কাছে মোশতাক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ছেড়ে দেন। সায়েম ৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। ৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া বক্তৃতায় সায়েম বলেন :

> আমি একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অবাধ নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। আমরা এই দায়িত্ব ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অথবা সম্ভব হলে তার পূর্বে পালন করতে বদ্ধপরিকর।[২৩]

৩ নভেম্বর থেকেই ঢাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল। বেতার-টেলিভিশনে কোনো কিছু প্রচার করা হচ্ছিল না। বোঝা যাচ্ছিল না, দেশে কোনো কার্যকর সরকার আছে কি না। ৪ নভেম্বর সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের একটা যৌথ মিছিল বের হয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি অবধি যায়। মিছিলে খালেদ মোশাররফের মা এবং খালেদের ছোট ভাই আওয়ামী লীগের নেতা রাশেদ মোশাররফ ছিলেন। চারদিকে রটে যায়, আওয়ামী লীগপন্থীরা খালেদের মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। বিবিসি ও রয়টার্সের ঢাকা প্রতিনিধি আতিকুল আলম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী তাজউদ্দীনের কথিত একটি চিঠি নিয়ে ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকার কূটনৈতিক পাড়ায় ছোটাছুটি করেন। তিনি দাবি করেন, ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেনকে উদ্দেশ করে লেখা ওই চিঠিতে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে।[২৪] জাসদের গণবাহিনী দাবি করে, খালেদ ক্ষমতা দখল করে 'রুশ-ভারত মহলকে জোরদার, শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আওয়ামী লীগ ও তাদের লেজুড় মণি-মোজাফফর চক্রকে মাঠে নামানোর' চেষ্টা করছে।[২৫] এসব প্রচারের ফলে দেশে আওয়ামী লীগ ও ভারতবিরোধী জিগির শুরু হয় প্রচণ্ডভাবে এবং জনমত খালেদ মোশাররফ ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে চলে যায়।
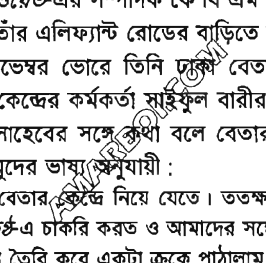
সায়েম তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে ইতিপূর্বে খন্দকার মোশতাকের দেওয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতির কথা আবারও উল্লেখ করলেন। সায়েম আরও কিছুদিন রাষ্ট্রপতি থাকলেন। কিন্তু তাঁর পেছনে বরকন্দাজ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অদল-বদল হলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

৬ নভেম্বর মধ্যরাতে 'সিপাহি বিপ্লব' সংঘটিত হলো। লে. কর্নেল রশিদের ২ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের একটি দল মেজর মুহিউদ্দিন ও সুবেদার মেজর আনিসুল হকের নেতৃত্বে রাত ১২টায় সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিয়ার বাসায় যায় গৃহবন্দী জিয়াকে মুক্ত করতে। প্রথম বেঙ্গলের যেসব সৈনিক জিয়াকে বন্দী করে রেখেছিল, তারা সরে পড়ে।

জিয়া মুক্ত হয়ে ২ ফিল্ড আর্টিলারিতে আসার কিছুক্ষণ পরই লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের সেখানে হাজির হন। জিয়া জেনারেল খলিল এবং

বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াবকে নিয়ে আসতে বলেন। সিপাহি বিদ্রোহের অনুঘটক ছিলেন আবু তাহের। তাঁর নেতৃত্বে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' কয়েক দিন যাবৎ খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে সেনানিবাসে প্রচার চালিয়ে আসছিল। গৃহবন্দী অবস্থায় তাহেরের সঙ্গে জিয়া টেলিফোনে যোগাযোগ রাখছিলেন। তাঁদের পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তিতেই তাহের ও তাঁর লোকেরা ৬ নভেম্বর মধ্যরাতে সেনানিবাসে বিদ্রোহ শুরু করেন। জিয়া মুক্ত হন।

রাত দুইটা ৩০ মিনিটের দিকে তাহের আসেন জিয়ার কাছে। জিয়াকে তখন ঘিরে ছিলেন লে. কর্নেল আমিনুল হক, মেজর মুহিউদ্দিন, মেজর জুবায়ের সিদ্দিকী, মেজর মোস্তফা, মেজর মুনির ও সুবেদার মেজর আনিস। তাহের জিয়াকে সেনানিবাস থেকে বের করে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে নিয়ে যেতে চাইলেন। বেতার কেন্দ্র তখন তাহেরের অনুগত লোকদের দখলে। জিয়া সেনানিবাস ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেন। তাঁদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়।[২৬]

ইংরেজি সাপ্তাহিক *ওয়েভ*-এর সম্পাদক কে বি এম মাহমুদের সঙ্গে জাসদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঢাকায় তাঁর এলিফ্যান্ট রোডের বাড়িতে জাসদের নেতারা অনেক বৈঠক করেছেন। ৭ নভেম্বর ভোরে তিনি ঢাকা বেতারের নিয়ন্ত্রণ নেন কিছু সময়ের জন্য। বেতার কেন্দ্রের কর্মকর্তা সাইফুল বারীর মাধ্যমে তিনি বেতারের মহাপরিচালক জামান সাহেবের সঙ্গে কথা বলে বেতার কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নেন। কে বি এম মাহমুদের ভাষ্য অনুযায়ী :

> গেলাম ওনাকে বেতার কেন্দ্রে নিয়ে যেতে। ততক্ষণে শামসুদ্দিন বলে একটা ছেলে ছিল *গণকণ্ঠ*-এ চাকরি করত ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। ওখানে বসে আমরা পাণ্ডুলিপি তৈরি করে একটা ক্রুকে পাঠালাম জিয়াউর রহমানের বক্তৃতা ধারণ করার জন্য। অপেক্ষা করলাম। সিরাজুল আলম খান দূরালাপনীতে আমাকে শ্রুতিলিপি বলে দিলেন, যেটা আমি সম্প্রচার করিনি।[২৭]

ভোরে ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে তাহেরের লোকেরা 'সিপাহি বিপ্লব'-এর ঘোষণা দেয়। ঘোষণায় বলা হয়, সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকেরা এবং বিপ্লবী গণবাহিনী বিপ্লব করেছে, এবারের বিপ্লব সিপাহি বিপ্লব, জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা হয়েছে ইত্যাদি। রহস্যজনকভাবে জাসদ কিংবা রব, জলিল ও তাহেরের নাম বলা হলো না। জনমনে ধারণা হলো, জিয়াই নায়ক।

১৫ আগস্ট এবং ৭ নভেম্বরের ঘটনা দুটোকে একই সূত্রে গাঁথা বলে মনে করেন কেউ কেউ। তাঁদের কাছে দুটোই 'বিপ্লব'। এ প্রসঙ্গে ১৫ আগস্টের অন্যতম কুশীলব ডালিমের মন্তব্য হলো :

> একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল এই দুইটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। ১৫ আগস্ট অগ্রণীর ভূমিকায় ছিল সেনা

পরিষদ আর ৭ নভেম্বর একই দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করেছিল সেনা পরিষদ এবং কর্নেল তাহেরের অধীনস্থ গণবাহিনী। এই দুইটি ঐতিহাসিক জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের চেতনা ছিল জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার চেতনা, গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেতনা, ইন্দো-সোভিয়েত বলয়ের নাগপাশ ছিন্ন করে জাতীয় স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার চেতনা, স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার চেতনা—এক কথায় বলতে গেলে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।[২৮]

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নেতা খালেদ মোশাররফ ৭ নভেম্বর সকালে তাঁর দুই সহযোগী কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা ও লে. কর্নেল এ টি এম হায়দারকে নিয়ে শেরেবাংলা নগরে সেনাবাহিনীর একটি ইউনিটে আশ্রয় নেন। এই ইউনিটটি ছিল খালেদের অনুগত। সেখানেই তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

২ ফিল্ড-এর দপ্তরে বেতারের রেকর্ডিং ইউনিট এসে জিয়ার একটা বক্তৃতা রেকর্ড করে।[২৯] সকালেই জিয়ার বক্তৃতাটি প্রচার করা হয়। জিয়ার ভাষণটি ছিল এরকম :

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যদের অনুরোধে আমাকে সাময়িকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে। এ দায়িত্ব ইনশাআল্লাহ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনারা সকলে শান্তিপূর্ণভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। দেশের সর্বস্থানে অফিস-আদালত, যানবাহন, বিমানবন্দর, নৌবন্দর ও কলকারখানাগুলো পূর্ণভাবে চালু থাকবে। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।[৩০]

সামরিক আইনের অধীনে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসককে সরকারপ্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ৭ নভেম্বর সকালের ভাষণে জিয়াউর রহমান জানান দিলেন, তিনিই বাংলাদেশের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের শীর্ষে।

সকাল ১০টায় ঢাকা সেনানিবাসে সভা বসল। সভায় উপস্থিত জিয়া, ওসমানী, খলিল, তাওয়াব, এম এইচ খান, মাহবুব আলম চাষী ও আবু তাহের। দেশের শাসনকাঠামো নিয়ে কথাবার্তা হলো। রাষ্ট্রপতি হিসেবে ওসমানী খন্দকার মোশতাকের নাম প্রস্তাব করলেন। জেনারেল খলিল ও কর্নেল তাহের আপত্তি জানালেন। বিচারপতি সায়েমকেই রাষ্ট্রপতি পদে বহাল রাখা সাব্যস্ত হলো। জিয়া

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জেনারেল খলিল বলেন, এই ক্ষমতাটি রাষ্ট্রপতির হাতে থাকাই যুক্তিসংগত। তাহের খলিলের মত সমর্থন করলেন। জিয়াকে বিমানবাহিনীর প্রধান ও নৌবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবেই থেকে যেতে হলো। সন্ধ্যায় জিয়া, সায়েম ও মোশতাক ঢাকা বেতার কেন্দ্রে যান। সেখানে রাষ্ট্রপতি সায়েম এবং বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মোশতাকের ভাষণ প্রচার করা হলো।[৩১] সায়েম তাঁর ভাষণে বললেন :

> ...রাষ্ট্রপতির পদে জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদের পুনর্বহাল হওয়ার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত দাবি সত্ত্বেও তাঁরই অনুরোধক্রমে আমি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছি। জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদের দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তা যেকোনো উন্নয়নশীল দেশে বিরল এবং সেই দেশের জনগণের জন্য গর্বের বিষয়।...
>
> পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্য আমরা কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দেশে সামরিক আইন প্রশাসন কাঠামো গঠন করা হয়েছে।
>
> এই কাঠামোতে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হবেন। এতে তিনজন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থাকবেন। তাঁরা হচ্ছেন সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনীর প্রধান কমোডর মোশাররফ হোসেন খান এবং বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তাওয়াব। দেশের চারটি বিভাগে চারজন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক থাকবেন।
>
> জননেতাদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। এই পরিষদ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করবে এবং পরামর্শ দেবে।
>
> সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বেসামরিক কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্ত থাকবে।
>
> আমি ঘোষণা করছি যে শুধু রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে যে সমস্ত জননেতা আটক আছেন, তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে।[৩২]

বিদায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমদও বেতারে একটা ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি বলেন :

> ...আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসীর কাছ থেকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের জন্য আমার কাছে স্বতঃস্ফূর্ত দাবি আসা অব্যাহত রয়েছে।...কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে আজ এমন এক ব্যক্তিত্বের

প্রয়োজন, যিনি হবেন সম্পূর্ণ নির্দলীয় এবং অরাজনৈতিক। এসব শর্তাদি পালনের জন্য দেশের প্রধান বিচারপতি বর্তমানে যেভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে আছেন, তা-ই শোভন ও সুন্দর বলে আমি মনে করি।...

যে দায়িত্ব মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছিলেন, সে দায়িত্বের পরিমণ্ডল আমি অতিক্রম করেছি। তথাপি দেশের নগণ্য সেবক হিসেবে আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি।...

আমার প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জেনারেল এম এ জি ওসমানীর সংকটকালীন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পরিসমাপ্ত হয়েছে। দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী এই কর্মবীর যা করেছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।[৩৩]

১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সময় থেকে শাহবাগের বেতার কেন্দ্র মেজর রশিদের অধীন টু ফিল্ড আর্টিলারির সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ওই রেজিমেন্টের সদস্য মেজর (পরে ব্রিগেডিয়ার) জুবায়ের সিদ্দিকী বেতার কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং খুব কাছে থেকে ক্ষমতার পালাবদলের নাটকটি দেখেছিলেন। ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি সায়েম যখন বেতারে ভাষণ দেন, তখন জিয়াউর রহমান ও আবু তাহের দুজনই বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন। বেতারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কামরায় বসে জিয়ার সঙ্গে তাহেরের কথাবার্তা হয়। তাহের জিয়াকে বলেন, বিপ্লবী সৈনিকদের কিছু দাবিদাওয়া আছে, জিয়া যেন তা শোনেন এবং অবিলম্বে মেনে নেন। জিয়া স্বভাবসুলভ ধীরস্থিরভাবে বলেন, তিনি একটু পরে সৈনিকদের সঙ্গে দেখা করবেন। বেতারের স্টুডিওতে আসার আগেই রাষ্ট্রপতির ভাষণ রেকর্ড করা হয়েছিল, যাতে আলোচনার সময় তাহের বা জাসদের সশস্ত্র সৈনিকেরা কোনো শর্ত বা দাবিদাওয়া নিয়ে চাপ না দিতে পারে। জিয়ার এই কৌশল ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল।[৩৪]

রাষ্ট্রপতির ভাষণ শেষ হওয়ার পর জিয়া খুব হালকা মেজাজে তাহেরকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। সেখানে জাসদপন্থী ২০-২৫ জন সশস্ত্র সৈনিক দাবিদাওয়ার একটা লম্বা তালিকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। জিয়া ঘরে ঢুকেই সৈনিকদের সঙ্গে হাত মেলালেন, কুশল জিজ্ঞেস করলেন এবং ছোট একটা টেবিলের ওপর বসে খোশমেজাজে হেসে হেসে তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। তিনি সৈনিকদের মধ্যে একজনকে দাবিদাওয়া পড়ে শোনাতে বললেন। পড়া শেষ হলেই জিয়া বললেন, দাবিগুলো খুবই ন্যায্য এবং তা অবশ্যই পূরণ করা উচিত। দাবিগুলোর মধ্যে একটি ছিল জেলে আটক জাসদ নেতা জলিল ও রবের মুক্তি। জিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মুক্তির নির্দেশ দিলেন। এতে জাসদপন্থী সৈনিকদের মধ্যে যেটুকু উত্তেজনা অবশিষ্ট ছিল, তা-ও মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। বাকি দাবিগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিবেচনা করা হবে—এই আশ্বাস দিয়ে জিয়া অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে

HE BANGLADES

NO PLACE FOR MIRZAFARS ON

ovt firm to restore

২৩ নভেম্বরের (১৯৭৫) মধ্যে জিয়া তাঁর অবস্থান গুছিয়ে ফেলেছেন

সৈনিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মেজর জুবায়ের সিদ্দিকী দেখলেন :

> জেনারেল জিয়ার এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কৌশলের কাছে কর্নেল তাহের একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে হতাশ এবং অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়লেন। আরও একটি সিগারেট ধরিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালে জমে ওঠা ফোঁটা ফোঁটা ঘাম মুছতে মুছতে পাশেই রাখা ক্রাচের মতো লাঠিটা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে জাসদপন্থীদের সিপাহি বিপ্লবের ফলাফলকে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার সর্বশেষ আশাটুকুও যেন কর্পূরের মতো উবে গেল। টু ফিল্ডের সৈনিকেরা চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকল যতক্ষণ না লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে কর্নেল তাহের তাদের দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে গেলেন।[৩৫]

ক্ষমতার কেন্দ্রে জিয়া

পঁচাত্তরের নভেম্বরে শুধু শাসক বদল হলো না, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি ভবিষ্যতে কেমন হবে, রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি কী হবে, তার বীজটি বোনা হয় এই সময়। এ জন্য অনুকূল জমি তৈরি করা দরকার হয়ে পড়ে। শুরুটা হয় সামরিক আইনের দ্বিতীয় ফরমানের তৃতীয় সংশোধনী আদেশ জারি করে। পঁচাত্তরের ৩১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি সায়েমের নামে জারি করা এই আদেশের কোপটা গিয়ে পড়ে

সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার (ঙ) উপদফার ওপর। এই অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথা বলা হয়েছিল। (ঙ) উপদফায় ছিল, কোনো ব্যক্তি সংসদে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য হবেন যদি :

> তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীনে যেকোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন।[৩৬]

রাষ্ট্রপতির আদেশে এই উপধারাটি বাতিল করা হলো। ফলে 'দালাল আইনে' অভিযুক্ত একাত্তরের পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সহযোগীদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকল না। এই সংশোধনীর ফলে পরবর্তী সময়ে রাজনীতির সমীকরণ অনেকটাই পাল্টে যায়। স্বাধীনতার বিরোধিতা করার কারণে রাজনীতির মঞ্চ থেকে যাঁরা ইতিপূর্বে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেরই রাজনীতিতে ফিরে আসার পথ তৈরি হয়ে যায়।

একটা ক্ষমতার বলয় তৈরি করার লক্ষ্যে জিয়াউর রহমান নানা দিকে হাত বাড়াতে থাকেন। পরামর্শের জন্যও তিনি অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছে ধরনা দেন। তাঁর পরিচিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে একজন ছিলেন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা—পাকিস্তানের সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রথম পরিচালক—আকবর কবির। জিয়ার বাবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। আকবর কবির নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে ও অনেক ব্যাপারে সাবধান করে জিয়াকে একটা চিঠি দেন। চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। এখানে এটা বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে, জিয়া বাংলা পড়তে বা লিখতে পারতেন না। তিনি শেষের দিকে যা কিছুতে সই করতেন, সেটা করতেন শুধু বাংলায় 'জিয়া' লিখে।[৩৭] চিঠিতে আকবর কবির জিয়াকে 'কমল' নামে সম্বোধন করেছিলেন। জিয়ার ডাকনাম ছিল কমল।

> ফেব্রুয়ারি ১১, ১৯৭৬
> মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান
> বি.ইউ., পিএসসি.
> চিফ অব স্টাফ, সেনাবাহিনী এবং উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
>
> আমার প্রিয় কমল,
>
> তোমার অনুরোধে আমি দেশের পরিস্থিতি এবং আমার পরামর্শ নিচে তুলে ধরছি। এখানে সব বিষয়ে আমি আলোকপাত করতে পারিনি। তবে তুমি যদি আরও ব্যাখ্যা চাও, আমি তা জানাতে পারলে খুশি হব।...
>
> প্রশাসন : প্রশাসনিক পুনর্গঠনের বিষয়ে আমি তোমাকে একটা পেপার দেব। তুমি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে, তুমি ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে নিয়ে যেতে চাও, এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টাদের মধ্যে তুমি

এমন তিনজনকে নিয়োগ দিয়েছ, যারা আইয়ুব সরকারে ছিল এবং এরা কেউই আহামরি মেধাসম্পন্ন নয়। সিভিল প্রশাসনের চূড়ায় তুমি যাকে বসিয়েছ, তার ব্যাপারে আমি তোমাকে আমার মৌখিক মতামত দিয়েছিলাম। তিনি একদল অযোগ্য কর্মকর্তাকে ক্ষমতা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন, যারা অতীতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল এবং যাদের যোগ্যতা নিয়ে বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্টে লেখালেখি হয়েছিল। তুমি আমলাদের একটা গ্রুপকে বেশি ক্ষমতা এবং দায়িত্ব দিচ্ছ। যেহেতু তোমাকে কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তোমার উচিত হবে সব ধরনের লোককে নিয়ে চলা। অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন ধারণা তৈরি হচ্ছে যে, পদক্ষেপগুলো খুব দ্রুত নেওয়া হচ্ছে, যার ফলে সাময়িক কিছু উপকার পাওয়া যেতে পারে, যদিও তা নিয়ে সন্দেহ আছে, কিন্তু আখেরে এসব ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে।

তথ্য : তথ্য মন্ত্রণালয় হচ্ছে সরকারের সবচেয়ে দুর্বল এবং খতরনাক সংস্থা। এই মন্ত্রণালয়ের লাগামহীন চাটুকারিতা এবং জনমতের তোয়াক্কা না করার কারণেই আইয়ুব এবং শেখ-এর পতন হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। সংবাদ প্রচারে বালখিল্যতার জন্য ভালো খবরও হাসির খোরাক হয়, এমন উদাহরণ আছে অনেক।

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, তথাকথিত পেশাদার সাংবাদিকরা আরও খারাপ। তারা চরিত্রহীন, ক্রয়যোগ্য এবং বিবেকবর্জিত।

আমি মনে করি, পক্ষপাত এবং নিজেদের জাহির করা এড়িয়ে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা উচিত।...

রাজনীতি : যেহেতু আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, শিক্ষার ওপর আমি বেশি জোর দেব।...রাজনীতি এবং নির্বাচন শুরুর আগে যা করতে হবে, তা হলো (১) অস্ত্র উদ্ধার এবং সহিংসতার সম্ভাবনা দূর করা, (২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে আইনের শাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, (৩) মানুষ যাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং ভোট দিতে পারে সে জন্য তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং (৪) একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সময় নেওয়া। এ জন্য আমি কমপক্ষে চার-পাঁচ বছর অপেক্ষা করা দরকার বলে মনে করি। গুটিকয়েক দুর্নীতিবাজ এবং লোভী রাজনৈতিক শকুন ছাড়া সবাই জনগণকে তৈরি করতে এই সময়টুকু মেনে নেবে বলে আমি নিশ্চিত। এটা বলা দরকার, রাষ্ট্রপতি এবং তার বিশেষ সহকারী অনেক বাতিল, দুর্নীতিবাজ, যারা অনেকেই বিদেশি শক্তির দালাল এবং অবাঞ্ছিত তথাকথিত রাজনীতিবিদদের বঙ্গভবনে দাপটের সঙ্গে চলাফেরা করতে দিচ্ছেন। এটা দেখে আমি খুবই হতাশ।...

আমি আগেই বলেছি, জনগণ এই সরকারকে পাকিস্তানপন্থী মনে করে। আমরা ভারতের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে দ্রুত পাকিস্তানের পকেটে ঢুকে যাচ্ছি—এমন ধারণা ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের প্রতি নতজানু মনোভাব দেখে জনগণ মনে করে, সরকার হয়তো এটাই চাইছে।

আমরা কি কারও তাঁবে না গিয়ে থাকতে পারি না?

তোমার প্রতি আমার পরামর্শ হলো, তুমি কামাল আতাতুর্কের ১৯২৩ সালের ইজমির ভাষণ, ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তোর ধাঁচ এবং তিউনিসিয়ার বারগুইবার কথা ভেবে দেখতে পারো।...[৩৮]

আকবর কবিরের চিঠি পড়ে মনে হয়, জিয়া রাজনীতির মাঠে নামবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন। তিনি রাজনীতিবিদদের দরজায় টোকা দিচ্ছেন। অনেক রাজনীতিবিদই বঙ্গভবনে ঘুরঘুর করা শুরু করে দিয়েছেন। এসব দেখে আকবর কবির রীতিমতো শঙ্কিত এবং তিনি জিয়াকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রশাসনের নানা বিষয়ে আকবর কবিরের পরামর্শ দেওয়া থেকে মনে হয়, জিয়া রাষ্ট্র পরিচালনায় তাবৎ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে জিয়া একজন সাধারণ উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সীমানার বাইরে পা ফেলছিলেন।

রাষ্ট্রপতি সায়েম তাঁর সরকারের অসামরিক চরিত্র যতটুকু বজায় রাখা যায়, তার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর তিনি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেন। ১০ নভেম্বর জিয়াউর রহমান, এম জি তাওয়াব এবং এম এইচ খান—এই তিনজন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। এই উপদেষ্টামণ্ডলী ছিল প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি সায়েমের মন্ত্রিপরিষদ। নভেম্বরের শেষে উপদেষ্টা পরিষদে যোগ দেন কয়েকজন খ্যাতিমান নাগরিক ও শিক্ষাবিদ। ২৬ নভেম্বর (১৯৭৫) উপদেষ্টা পরিষদে যোগ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আবুল ফজল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এন হুদা এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এম এ রশীদ। এ ছাড়া সাবেক মন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক, বিশিষ্ট চিকিৎসক মুহাম্মদ ইব্রাহিম, রাঙামাটির রাজমাতা বিনীতা রায়, আকবর কবির, মুহাম্মদ সাইফুর রহমান প্রমুখ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান। তাঁদের যোগ দেওয়ার ফলে সামরিক সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছিল। আকবর কবির ১৮ সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হন। তাঁকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

জিয়াউর রহমান কাগজে-কলমে যদিও ছিলেন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাষ্ট্রপতি সায়েমকে জিয়ার নির্দেশ মেনেই চলতে হতো। সায়েম এটা মেনে নিয়েই রাষ্ট্রপতির পদে চাকরি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আকবর কবিরের পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য আমলে নেওয়া যেতে পারে :

আমাকে প্রেসিডেন্ট সায়েমের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বানানো হয়।...জিয়া ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাজের চাপ কমাতে সাহায্যের জন্য আমাকে এ পরিষদে

জিয়াউর রহমান সস্ত্রীক এক অনুষ্ঠানে

যোগ দিতে অনুরোধ করেন।...জিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কের জন্য আমি তাঁকে না করতে পারিনি। তবে এক বছরের বেশি আমার পক্ষে ওই পরিস্থিতিতে থাকা সম্ভব হয়নি। প্রেসিডেন্ট সায়েম সম্পর্কে আমার খুবই নিচু ধারণা ছিল। তিনি বোধ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার এক ক্লাস নিচে ছিলেন। তবে চিনতাম না।...

একজন প্রধান বিচারপতি কী করে সামরিক আইনের আওতায় প্রেসিডেন্ট ও চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হন এবং তাঁর অধস্তন ডেপুটি চিফের কথামতো সব কাজ করেন, এটা আমাকে অবাক করেছিল।...

ওই আমলকে দ্বৈত শাসনের কাল বলা যায়, কেননা যেসব উপদেষ্টা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁরা যদি কোনো নির্দেশ দিতেন, ক্যান্টনমেন্ট থেকে তার বিপরীতে নির্দেশ দেওয়া হতো। জিয়া অবশ্য কোনো ক্ষেত্রেই আমার নির্দেশের বিপক্ষে মত দেননি।[৩৯]

কাগজে-কলমে বিচারপতি সায়েম যুগপৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থাকলেও ক্ষমতার নাটাইটা ছিল উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়ার হাতে। জিয়া সিদ্ধান্ত দিতেন, সেই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির নামে প্রচারিত হতো। দেশে সামরিক আইন থাকলে সেনাবাহিনীর হাতেই কর্তৃত্ব থাকে এবং সেনাপ্রধান সেই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন, এটা একটা সাধারণ ফর্মুলা।

নির্বাচন স্থগিত হলো

একাত্তরে যে কয়টি রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) তাদের অন্যতম। এর প্রধান নেতা ছিলেন আবদুল হক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আবদুল হক দলের নামের সঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটি রেখে দিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশ কোনো স্বাধীন দেশ নয়, এটা ভারত-সোভিয়েত অক্ষশক্তির একটি উপনিবেশ। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে এঁরা অনেকেই প্রকাশ্য রাজনীতিতে চলে আসেন।

রাজনীতি ও নির্বাচন নিয়ে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের নিজস্ব ভাবনা ছিল। তাঁর ইচ্ছার পালে বাতাস দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না। নির্বাচনের রাজনীতিতে যাঁরা কখনো এঁটে উঠতে পারেননি এবং যাঁদের নিকট ভবিষ্যতে এই অবস্থার হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তাঁরা তৎপর হলেন। আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচন হলে কোনো সুবিধা পাওয়া যাবে না, এই অনুমান থেকে নির্বাচন যাতে না হয়, সেটা নিশ্চিত করার জন্য তাঁরা আটঘাট বেঁধে নেমে পড়লেন।

১০ জুলাই ১৯৭৬ ঢাকায় শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মোহাম্মদ তোয়াহা একটা স্থিতিশীল সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়ার জন্য নির্বাচন দুই থেকে তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। পঁচাত্তরের আগস্টে সামরিক আইন জারির পর রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন, ১৫ আগস্ট ১৯৭৬ থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। এই প্রেক্ষাপটে সংবাদ সম্মেলনে তোয়াহা বলেন :

> আগামী মাসে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে সময় ঘোষণা করা হয়েছে, একটি সুষ্ঠু সাধারণ নির্বাচনের জন্য তা খুবই কম।...জনগণ যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের চরিত্র ও কর্মসূচি উপলব্ধি করতে পারে, সে জন্য সময় দেওয়া দরকার; তা না হলে নির্বাচনে একটি সরকার হয়তো গঠিত হবে, কিন্তু তা স্থিতিশীল হবে না। তা ছাড়া, নির্বাচনের জন্য ঘোষিত সময়ের মধ্যে 'মেরুকরণ' (পোলারাইজেশন) সম্ভব নয়। এর ফলে জনগণ একটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বে।[৪০]

সংবাদ সম্মেলনে তোয়াহা 'সকল দেশপ্রেমিক দলের' প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা জাতীয় কনভেনশন ডাকার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত কনভেনশনের পর একটা 'অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার' গঠন করা দরকার এবং এই সরকারই সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক করবে।[৪১]

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি সায়েম ২৮ জুলাই ১৯৭৬

'রাজনৈতিক দলবিধি' জারি করেন। এই বিধি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয় এবং নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে দলের গঠনতন্ত্র, কর্মসূচি, তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনার পদ্ধতি এবং ব্যাংক হিসাব জানানোর বিধান করা হয়।[৪২]

৩১ জুলাই ১৯৭৬ এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সাহায্য করতে সব রাজনৈতিক দল ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, নিছক রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের বদলে সংসদীয় ধাঁচের সরকার চালু করা হলেই জনগণ তা গ্রহণ করবে না; পবিত্র কোরআনের অনুশাসনবিরোধী কোনো সংবিধানই গ্রহণযোগ্য হবে না। 'আসন্ন নির্বাচনে শাসনতন্ত্রই নিঃসন্দেহে প্রধান ইস্যু হইবে' বলে ভাসানী উল্লেখ করেন।[৪৩]

পঁচাত্তরের মধ্য-আগস্ট থেকে আওয়ামী লীগ দিশেহারা ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেও এটাই ছিল দেশের সবচেয়ে সংগঠিত রাজনৈতিক দল। শেখ মুজিবুর রহমান মৃত হলেও তিনি ছিলেন দলটির জন্য একটা বড় শক্তি এবং প্রেরণা। মৃত মুজিবকে নিয়ে সামরিক সরকারের অস্বস্তি ও ভয় ছিল। মৃত মুজিবকে মোকাবিলা করার জন্য ৪ আগস্ট (১৯৭৬) ইতিপূর্বে জারি করা রাজনৈতিক দলবিধি সংশোধন করা হয়। প্রথমে জারি হওয়া দলবিধিতে ছিল, 'ক্ষতিকর কার্যকলাপে' লিপ্ত কোনো সংগঠনকে নিবন্ধন দেওয়া হবে না। ৪ আগস্টের সংশোধনীতে ক্ষতিকর কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ১০টি উপদফার উল্লেখ করা হয়। ১০ নম্বর উপদফায় বলা হয় :

> কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি বা উৎসাহিত করিবার জন্য পরিকল্পিত হয় কিংবা এইরূপ শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি বা উৎসাহিত করিতে পারে বলিয়া সম্ভাবনা রহিয়াছে।[৪৪]

দলের শক্তি পুনরুদ্ধারে শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ব্যবহার করা থেকে আওয়ামী লীগকে বিরত রাখার জন্যই রাজনৈতিক দলবিধিতে এই পরিবর্তন আনা হয়েছিল।

এ সময় মওলানা ভাসানী অসুস্থ হয়ে পড়েন। সরকার চিকিৎসার জন্য তাঁকে লন্ডনে পাঠায়। চিকিৎসা শেষে ১২ সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) ঢাকায় ফিরে ভাসানী বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন :

> দেশের জনগণ এ মুহূর্তে নির্বাচন চায় না। এ দেশের জনগণ মুসলিম লীগ ও বিগত আওয়ামী লীগ আমলেও নির্বাচনের কোনো সুফল পায়নি। দেশের মানুষ এই মুহূর্তে নির্বাচন চায় কি না, গণভোটের মাধ্যমে তা যাচাই করা দরকার।...

একটা 'বাজে' গণপরিষদ কর্তৃক জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সংবিধান বাতিল করে সরকারের ভেতরের ও বাইরের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে নতুন খসড়া সংবিধান তৈরির জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।[৪৫]

নির্বাচন হইলে হানাহানি-কাটাকাটি হইবে। ইহা শান্তিপ্রিয় জনগণ চায় না। এই ধরনের নির্বাচনে ইতিপূর্বে যাহারা ক্ষমতায় গিয়াছিল...আবার তাহারাই ক্ষমতায় আসিবে।[৪৬]

এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে, এরকম একটা 'আশঙ্কা' ছিল মওলানা ভাসানীর। তাই তিনি চেয়েছিলেন, নির্বাচন যাতে না হয়। ভাসানীর এই দাবি ছিল সামরিক সরকারের ইচ্ছারই প্রতিফলন।

ভাসানীর বক্তব্য রাজনীতির শান্ত জলাশয়ে ঢেউ তুলল। পত্রিকার পাতায় শুরু হলো কলম-যুদ্ধ, বিবৃতি আর পাল্টা-বিবৃতি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত রাজনীতিবিদদের ওই সময়ে দেওয়া কয়েকটি বিবৃতি এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হলো।

পীর মোহসেনউদ্দীন (দুদু মিয়া), প্রস্তাবিত ডেমোক্রেটিক লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য : অতীতে বহু রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। দেশ আর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ভার বহন করিতে পারিতেছে না। জনগণ এখন শান্তির অন্বেষায় ঘুরিতেছে। নির্বাচিত পার্লামেন্টকে 'বোগাস' পার্লামেন্ট বলার মাধ্যমে মওলানা সাহেব নির্বাচক, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং নির্বাচনের প্রতি তাঁহার অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। উস্কানি ও উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্গাতা মওলানা ভাসানী রাজনীতিতে মনে-প্রাণে নির্বাচন ও নিয়মতান্ত্রিকতার বিরোধী।[৪৭]

খান এ সবুর, প্রস্তাবিত মুসলিম লীগের সভাপতি : সাধারণ নির্বাচনের প্রতি মওলানার বিরোধিতার অর্থ হইল একটি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে তাঁহার অপারগতা এবং জনগণ যে তাঁহার স্ববিরোধী ভূমিকাকে গ্রহণ করিবে না, সেই সম্পর্কে তাঁহার সচেতনতা। সরকার এবং রাজনৈতিক গ্রুপদের দ্বারা খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য মওলানা ভাসানীর প্রস্তাব অগণতান্ত্রিক।[৪৮]

জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানী, প্রস্তাবিত জাতীয় জনতা পার্টির আহ্বায়ক : মওলানা সাহেবের নির্বাচিত গণপরিষদ ও শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত উক্তি দুঃখজনক। সীমিতভাবে হইলেও নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে, উহাকে সফল করা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি।[৪৯]

হাজী মোহাম্মদ দানেশ, প্রস্তাবিত জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়নের সভাপতি : অতীতে যাহারা জাতি ও জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। আমরা এই মতও পোষণ করি যে নির্বাচনের আরেকটি পূর্বশর্ত হইল বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান পরিবর্তন। বর্তমান সংবিধানকে পরিবর্তন করিয়াই নির্বাচন হইতে হইবে।[৫০]

মওলানা ভাসানী, প্রস্তাবিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) সভাপতি : চার বছরের কুশাসন, হানাহানি ও দুর্নীতির পর ১৯৭৫ সালের আগস্ট ও নভেম্বরের পরিবর্তন অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, প্রশাসনিক সচলতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের শুভ সূচনা করিয়াছে, যাহা স্থিতিশীল হইতে সময় দরকার। কিন্তু এই সব ব্যক্তি, যাহারা যেকোনো মূল্যে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত-ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা আমার বিবৃতির পর উন্মত্ত চিৎকার শুরু করিয়া দিয়াছেন।...প্রকাশ্য রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইবার পূর্বেই তাঁহারা যে কুৎসিত মুখ দেখিয়াছেন, উহাই ৪০টির বেশি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের জন্য প্রচারাভিযান শুরু করিলে অবস্থা কী হইবে, তাহার ইঙ্গিতবাহী। আমার বিপ্লবের ডাকে ও সংবিধান বাতিলের আহ্বানে কেবল শোষক ও সামাজিক পরগাছারাই ভীত-সন্ত্রস্ত হইবে। জনগণ ইহাতে উল্লসিত হইবে।[৫১]

মশিউর রহমান, প্রস্তাবিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) সাধারণ সম্পাদক : মওলানা ভাসানী নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্যই রাখেননি। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবে। সেই বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত থাকিতে পারেন। তিনি (মওলানা) আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারকে সকল দেশপ্রেমিক দলের সঙ্গে সহযোগিতা ও পরামর্শমতো কাজ করিবার অনুরোধ জানান। যদি নির্বাচন করিবার উপযুক্ত আইনশৃঙ্খলার উন্নতি না হয়, তবে নির্বাচন কিছুদিন পর করিলেও কোনো ক্ষতি হয় না। নির্বাচন কবে হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার অধিকার সরকারের। সুতরাং, এই ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্ত আমরা ও মওলানা সাহেব মানিয়া চলিবেন বলিয়া তিনি আমার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছেন। আমি আশা করি, এই বিতণ্ডার এখানেই শেষ হওয়া উচিত। ইহার কারণ জাতির আজ প্রয়োজন ঐক্য—সকল শ্রেণীর, সকল মতের, সকল বর্ণের মানুষের।[৫২]

মওলানা আবদুল মতিন, প্রস্তাবিত বাংলাদেশ লেবার পার্টির সভাপতি : তথাকথিত মুখচেনা দালালগোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী ঘৃণ্য ব্যক্তিরা, যাহারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছে...জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ম্যান্ডেটকে পদদলিত করিয়াছে, তাহারাই আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার মাটিতে নির্বাচনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি মায়াকান্না শুরু করিয়াছে দেখিয়া বাংলার জনগণ নির্বাচন সম্পর্কে চরমভাবে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে।[৫৩]

মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, প্রস্তাবিত গণ-আজাদী লীগের সভাপতি : তদানীন্তন মুসলিম লীগ বা আওয়ামী লীগ যে সুফল দিয়াছে, তাহা যেমন ইতিহাস হইতে মুছিয়া যাইতে পারে না, তেমনি তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট কুফলও জনগণ ভুলিতে পারিবে না। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের জন্য অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন।[৫৪]

মওলানা সিদ্দিক আহমদ, প্রস্তাবিত ইসলামি ডেমোক্রেটিক লীগের আহ্বায়ক: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান একমাত্র নির্বাচিত সরকারের দ্বারাই সম্ভব। দেশের স্বার্থেই নির্ধারিত সময়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান আবশ্যক।[৫৫]

এ এস এম সোলায়মান, প্রস্তাবিত কৃষক-শ্রমিক পার্টির সভাপতি: দেশের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য মওলানা ভাসানী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রসম্মত। বর্ষীয়ান নেতার এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহল যে কাদা ছোড়াছুড়ির সূচনা করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত দুঃখজনক ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর।[৫৬]

আতাউর রহমান খান, প্রস্তাবিত বাংলাদেশ জাতীয় লীগের আহ্বায়ক: অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচন স্থগিত রাখিলে বা পিছাইয়া দিলে যে সর্বনাশ ও ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, তাহা দেশের সরকার পরিচালনায় জনসাধারণের অংশীদারিত্বকে অস্বীকার করিয়া দেশকে গভীর হতাশা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিমজ্জিত করিবে। শুধু নিয়মিত অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশপ্রেমিক নাগরিকেরা পার্লামেন্ট ও সরকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করিতে পারিবেন। বর্তমান শাসনতন্ত্রে এমন অনেক বিধান রহিয়াছে, যাহা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন, এমনকি নাকচের আশু প্রয়োজন। এই সংশোধনীসমূহ নির্বাচনের পর গঠিত জাতীয় সংসদও সম্পন্ন করিতে পারিবে। কাজেই নির্বাচনের পূর্বে শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণ বাতিল করা কোনো রকমেই সংগত হইবে না।[৫৭]

আমেনা বেগম, প্রস্তাবিত বাংলাদেশ জাতীয় দলের আহ্বায়ক: গণতন্ত্রে মতবিরোধ থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক। ইহাতে কাহারো দেশপ্রেমে কটাক্ষ না করিয়া কিংবা অশালীন উক্তি না করিয়া একটি সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য মতে পৌঁছানোই হইল নেতৃত্বের পরিচয়।[৫৮]

কাজী জাফর আহমদ, প্রস্তাবিত ইউনাইটেড পিপলস পার্টি: নির্বাচন আমরা অবশ্যই চাই, কারণ নির্বাচন জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের একটি হাতিয়ার। তবে আমরা অধিকতর গুরুত্ব দিই গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে।[৫৯]

ড. আলীম আল রাজী, প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পিপলস লীগের সভাপতি: সরকার নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। নির্বাচন পিছাইয়ে দিলে কি দেশে কবরের শান্তি নামিয়া আসিবে?[৬০]

ইতিমধ্যে সরকার রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় বিভিন্ন দলকে অনুমোদন দেওয়া শুরু করে। বেশ কয়েকটি নতুন দলের জন্ম হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগ, সাবেক জামায়াতে

ইসলামী ও নেজামে ইসলাম পার্টির সদস্যদের নিয়ে গড়া ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) এবং মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) একটি অংশের বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল নামে আত্মপ্রকাশ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩ সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) সরকারি অনুমোদনের জন্য আবেদন করে। ঘোষণাপত্রে আওয়ামী লীগ 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি উল্লেখ করেছিল। সরকার আওয়ামী লীগকে অনুমোদন দিতে অস্বীকার করে। পরে আওয়ামী লীগ ঘোষণাপত্র থেকে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি বাদ দিয়ে আবার আবেদন করলে ৪ নভেম্বর দলটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়।[৬১] জাসদ অনুমোদন পায়নি। মূল জাসদ থেকে বেরিয়ে এসে এম এ আউয়াল একটা আহ্বায়ক কমিটি করে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলে তা অনুমোদন পায়।

৩০ অক্টোবর ১৯৭৬ ঢাকায় সাম্যবাদী দলের এক সংবাদ সম্মেলনে দলের প্রধান মোহাম্মদ তোয়াহা নির্বাচন স্থগিত রেখে 'দেশপ্রেমিকদের' নিয়ে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন। তোয়াহার প্রস্তাবে 'রুশ-ভারতবিরোধীদের' নিয়ে একটা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠান এবং 'মুজিব-শাসনতন্ত্র' বাতিল করে অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান তৈরির দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে তোয়াহা 'আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর), মণি সিংহের কমিউনিস্ট পার্টি ও জাসদ'—এই চারটি দলকে নিষিদ্ধ করে 'দেশপ্রেমিক দলগুলোকে কাজের সুযোগ দেওয়ার' দাবি জানান।[৬২]

সামরিক কর্তৃপক্ষ যা চেয়েছিল, তার পক্ষে সরব হওয়ার মতো রাজনীতিবিদের অভাব হলো না। আবু নাসের খান ভাসানী (ভাসানী-ন্যাপ), কাজী জাফর আহমদ (ইউনাইটেড পিপলস পার্টি), মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (গণ-আজাদী লীগ) এবং আমেনা বেগম (জাতীয় দল) নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানান।[৬৩] নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলে সামরিক শাসন প্রলম্বিত করার যে প্রক্রিয়া মওলানা ভাসানী শুরু করেছিলেন, তার পক্ষে বেশ কিছু লোকের সমর্থন জুটে গেল। তাঁদের হারানোর কিছু ছিল না। তাঁরা অনেকেই অতীতে কোনো সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হননি। ২১ নভেম্বর (১৯৭৬) বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি সায়েম সংসদ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার কথা ঘোষণা করেন। ভাষণে বিচারপতি সায়েম বলেন :

> নেতৃবৃন্দের ভাষণ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত অন্যান্য বিবৃতি, ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা, বিভিন্ন এলাকার জনগণের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি এবং প্রশাসনিক মূল্যায়ন—সবকিছু থেকে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হচ্ছে যে জনসাধারণ আশু

নির্বাচনের পক্ষপাতী নন। তাঁরা আশঙ্কা করেন যে আশু নির্বাচন শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করবে, অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেবে, শত্রুর হাত মজবুত করবে এবং সর্বোপরি দেশের সমূহ অকল্যাণ ডেকে আনবে।

নির্বাচন সম্পর্কে উত্থাপিত বিতর্ক ও নির্বাচন স্থগিত রাখার পক্ষে জনমতের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সামগ্রিক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে জনগণের মতামত আজ সুস্পষ্ট। তাঁরা মনে করেন যে আশু নির্বাচন দেশের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন করবে। তাঁদের সঙ্গে একমত হয়ে সকল প্রস্তুতি ও আয়োজন সত্ত্বেও আমি ঘোষণা করছি যে পূর্বঘোষিত সময়ে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সরকার ইতিপূর্বেই ঘোষণা করেছে যে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তারপর থানা পরিষদ গঠন করা হবে। এর কয়েক মাসের মধ্যে জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সরকার মনে করে যে এই পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনসাধারণের অংশগ্রহণ সহজ ও ত্বরান্বিত হবে এবং পরবর্তীকালে উপযুক্ত সময়ে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ নির্বাচনের পথ সুগম হবে।...[৬৪]

জিয়া রাষ্ট্রপতি হলেন

সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের অপেক্ষার পালা শেষ হতে চলল। প্রেসিডেন্ট সায়েমকে দিয়ে নির্বাচন স্থগিতের ঘোষণা জারির এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি প্রেসিডেন্টের ডানা ছেঁটে দিলেন। ঘটনা ঘটল একটু নাটকীয়ভাবেই। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর রাতে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। তখন এটাকে বলা হয়েছিল 'রক্তপাতহীন বিপ্লব'। ২৮ নভেম্বর (১৯৭৬) ঢাকার বঙ্গভবনে এই নাটকের পুনর্মঞ্চায়ন হলো।

জিয়া উপলব্ধি করলেন, বিচারপতি সায়েম একাধারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে থাকলে তাঁর (জিয়ার) জন্য এটা বিপজ্জনক হতে পারে। সায়েম হয়তো আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা করবেন। জিয়ার আকাঙ্ক্ষায় ক্রমেই ডালপালা গজাচ্ছিল। নির্বাচন হয়ে গেলে তাঁর স্বপ্ন এখানেই খানখান হয়ে যেতে পারে। জিয়াকে সরিয়ে অন্য কাউকে সায়েম সেনাপ্রধান নিয়োগ করতে পারেন, এরকম একটা কানাঘুষাও ছিল। জিয়া সিদ্ধান্ত নিলেন, সায়েমকে মাটিতে

নামিয়ে আনতে হবে। ২৮ নভেম্বর তিনি বঙ্গভবনে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনীর উপপ্রধান মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার আবুল মঞ্জুর, নবম পদাতিক ডিভিশনের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী, নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম এইচ খান ও বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদকে। রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী বিচারপতি আবদুস সাত্তারও ওই সময় বঙ্গভবনে উপস্থিত ছিলেন। জিয়া রাষ্ট্রপতিকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ছেড়ে দিতে বললেন। সায়েম রাজি হলেন না। তাঁর কথা হলো, 'আমি দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়েছি, দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার কাজ আমাকে শেষ করতে দিতে হবে।' জিয়া তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। মধ্যরাত পর্যন্ত কথা-কাটাকাটি চলল। বিচারপতি সাত্তার সায়েমকে বললেন, 'ভাই, জিয়া যখন সিএমএলএ-এর পদটা নিতে চাইছেন, পদটা আপনি তাঁকে দিয়ে দিন।' রাত একটার দিকে সায়েম রণেভঙ্গ দিলেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ হস্তান্তরের কাগজে সই করলেন। সাঙ্গ হলো মধ্যরাতের আরেকটি 'ক্যু'।[৬৫] ২৯ নভেম্বর (১৯৭৬) জারি হলো সামরিক আইনের তৃতীয় ফরমান। রাষ্ট্রপতি সায়েম ঘোষণা করলেন :

> ...যেহেতু আমি এখন উপলব্ধি করছি যে জাতীয় স্বার্থেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বিইউ, পিএসসি কর্তৃক প্রয়োগ করা উচিত;
>
> সেহেতু এক্ষণে আমি, আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, এই ক্ষেত্রে আমাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা বলে এবং ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট ও ৮ নভেম্বরের ফরমানসমূহের বিধানাবলি সংশোধনপূর্বক এতদ্বারা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বিইউ, পিএসসি-এর কাছে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ হস্তান্তর করছি...।[৬৬]

জিয়াউর রহমান সরকারপ্রধানের ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর একটি গ্রেপ্তার দিয়ে তাঁর কাজের অভিষেক হলো। ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় ঢাকা থেকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটা দল পাঠিয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদকে তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হলো। একই দিন গ্রেপ্তার হন মোশতাকের ডেমোক্রেটিক লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোশতাক সরকারের প্রতিমন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমান, আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাজেদা চৌধুরী, ন্যাপ (মোজাফফর) নেতা মতিয়া চৌধুরী এবং দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক মইনুল হোসেন। তাঁদের সবাইকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হলো।

মোশতাকের গ্রেপ্তারের বিষয়টি রাষ্ট্রপতি সায়েম জানতেন না। তাঁকে না জানিয়ে একজন সাবেক রাষ্ট্রপতিকে কেন গ্রেপ্তার করা হলো, সায়েমের এই প্রশ্নের জবাবে জিয়া বলেন, 'স্যার, এটা ঘটে গেছে। প্লিজ, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলবেন না।' জিয়ার জবাবে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে সায়েমের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে; সেনাবাহিনী তাঁকে আর চায় না। এসব গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে দুটো বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল। জিয়ার হাতে এখন সরকারের পুরো নিয়ন্ত্রণ এবং দ্বিতীয়ত, নির্বাচন নিয়ে যাঁরা জিয়ার জন্য অস্বস্তি তৈরি করতে চান, আপাতত তাঁদের কিছুদিন চুপচাপ থাকতে হবে। জিয়া তাঁর কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার আগেই আঘাত হানলেন। তিনি সেনাবাহিনীর মধ্যে নিজের জন্য একটা শক্ত ভিত তৈরির দিকে মনোযোগ দিলেন।[৬৭]

ক্ষমতার কেন্দ্রে এখন জিয়াউর রহমান। সায়েম নামেমাত্র রাষ্ট্রপতি। এবার জিয়া তাঁকে পুরোপুরি ছাঁটাই করে দিলেন। শাসকদের প্রচলিত ফর্মুলা অনুযায়ী সায়েম ২১ এপ্রিল (১৯৭৭) 'স্বাস্থ্যগত কারণে' পদত্যাগ করলেন এবং রাষ্ট্রপতি পদে জিয়াউর রহমানকে নিয়োগ দিলেন। জিয়ার টুপিতে এখন তিনটা পালক—রাষ্ট্রপতি, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ।

কী পরিস্থিতিতে বিচারপতি সায়েম 'পদত্যাগ' করেছিলেন, তার একটা বিবরণ তিনি নিজেই দিয়েছেন।

> ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল বিশেষ সহযোগীর (বিচারপতি সাত্তার) নেতৃত্বে উপদেষ্টা কাউন্সিলের কতিপয় সিনিয়র বেসামরিক সদস্য আমাকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার অনুরোধ করেন। তাঁরা বলেন, তাঁরা তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের অধীনে কাজ করতে চান।...আমি বিশেষ সহযোগীর মাধ্যমে জিয়াকে আসতে বলি।
>
> জিয়া আসার পর আমি প্রসঙ্গটি উত্থাপন করি যে, যেহেতু আমার পদত্যাগপত্র কাকে সম্বোধন করে লেখা হবে বা কার কাছে দাখিল করতে হবে সে প্রশ্ন রয়ে গেছে, কারণ সেরকম কেউ নেই, সুতরাং কীভাবে আমি পদত্যাগ করব? তা ছাড়া খন্দকার মোশতাক আহমদ আমাকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়ার সময় যেভাবে সামরিক আইন ঘোষণার আদেশে সংশোধনী এনেছিলেন, সেরকমটা আমি করতে পারি না।...
>
> জিয়া বললেন, তিনি ইতিমধ্যে যখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হয়ে গেছেন, তখন এরকম সংকট তিনি মোকাবিলা করবেন সামরিক আইনের কর্তৃত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে।...
>
> যেহেতু জিয়া প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছেন এবং আমার মনে হয়েছে যে

উপদেষ্টা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যই তাঁকে সমর্থন করেছেন, তাই আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করি যে তিনি নিজে কোনো হুমকির সম্মুখীন না হয়ে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বাবলি সামলাতে পারবেন কি না। তিনি হ্যাঁ-সূচক জবাব দেন। তবে আমার মনে হয়েছিল যে তাঁকে ভুল পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।...

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার আগ মুহূর্তে আমি জিয়াকে বলি, আমি যেহেতু নির্বাচন করে যেতে পারলাম না, আমি তাঁকে অনুরোধ করব যেন তিনি নির্বাচন দেন। তিনি আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন যে তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন। শুনে আমি খুশি হই। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে নির্বাচনে তিনি নিজেই অংশ নেবেন।[৬৮]

জিয়ার রাজনীতির মহড়া

পঁচাত্তরের ১১ নভেম্বর বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত ভাষণে জিয়া বলেছিলেন, 'আমি রাজনীতিবিদ নই। আমি একজন সৈনিক।...রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমাদের সরকার সম্পূর্ণ নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক।'[৬৯] ১৯৭৬ সালের ১ মে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক জনসভায় সেনাবাহিনীর জন্য নতুন চালু হওয়া কমব্যাট পোশাকে জিয়া ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি একজন শ্রমিক।' একজন 'সৈনিক' ও 'শ্রমিক' কেমন করে একটার পর একটা সিঁড়ি পেরিয়ে ক্ষমতার শীর্ষে চলে যেতে পারেন, তার একটা চিত্রনাট্য আগেই লিখে রেখেছিলেন পাকিস্তানের সেনাপতি আইয়ুব খান। জিয়া এই চিত্রনাট্য ধরেই এগোতে থাকেন এবং অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছে যান। এখন তাঁর কাজ হলো জনগণকে আস্থায় নেওয়া। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নেওয়ার এক দিন পর ২২ এপ্রিল (১৯৭৭) বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে জিয়া তাঁর মনের কথা খুলে বললেন :

দেশে জনগণের অধিকার সুনিশ্চিতভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়েছে।...

আমি ও আমার সরকার পূর্ণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং দেশে যথাসময়ে জনগণের নির্বাচিত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ। জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং সরকারের প্রতিটি কাজে ও নীতিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পুনঃপ্রতিফলন নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। সে উদ্দেশ্যে সরকার কতিপয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কতগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণে এ বছর অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন স্থগিত রাখতে হয়—এ কথা সবারই জানা। কিন্তু নীতি হিসেবে আমরা মনে করি, অন্যান্য নির্বাচনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সাধারণ

নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করাই যুক্তিসংগত। তাই আমি ঘোষণা করছি যে এ বছরের আগস্ট মাসে পৌরসভাসমূহের এবং ডিসেম্বর মাসে জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তারপর ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা আশা করব যে সর্বস্তরের নির্বাচনে জনদরদি ব্যক্তিরা দেশগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবেন।...

শাসনতন্ত্রের কিছু কিছু মৌলিক আদর্শ ও বিধান সম্পর্কে জনমনে যথেষ্ট অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেশের মানুষের মন ও মানসিকতা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী জারি করা হচ্ছে। আমার স্থির বিশ্বাস, এই ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ়তর করবে এবং জাতিগঠনের কাজে সবাইকে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হবে।

১৯৭৫ সালের মহান ৭ নভেম্বর থেকে বিভিন্ন সময়ে দেশ ও জাতি আমার ওপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে।...এখন আমার ওপর রাষ্ট্রপতির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

ইনশা আল্লাহ এবারও আমি আপনাদের সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করব। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের আস্থা যাচাই করার জন্য আগামী মাসের ৩০ তারিখে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশব্যাপী একটি গণভোট, অর্থাৎ রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হবে। আশা করি, আপনারা আপনাদের মতামত ব্যক্ত করে সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সাহায্য করবেন।

জাতি আশা করছে, রাজনীতিবিদেরা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি এবং জনসেবার ক্ষেত্রে এক গঠনমুখী আদর্শ স্থাপন করবেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সুশৃঙ্খল রাজনীতির পথ কখনো বিঘ্নিত হবে না এবং পর্যায়ক্রমে খোলা রাজনীতির পথ প্রশস্ত করা হবে।...[৭০]

জিয়া যখন রেডিওতে ভাষণ দিচ্ছেন, তার আগেই সংবিধানের খোলনলচে পাল্টে দেওয়ার আয়োজন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার-কাঠামো আমূল বদলে ফেলা হয়েছিল। ২২ এপ্রিল (১৯৭৭) জারি হওয়া এক আদেশে সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তিটাকেও পাল্টে দেওয়া হলো।

বাহাত্তরের সংবিধান শুরু হয়েছিল একটা 'প্রস্তাবনা' দিয়ে। ২২ এপ্রিলের সংশোধনীতে প্রস্তাবনার ওপর জুড়ে দেওয়া হলো একটা বাক্য—'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'; বন্ধনীর ভেতর দেওয়া হলো বাংলা তরজমা—'দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে।' ইসলামি রীতি অনুযায়ী বান্দাকে আল্লাহর নামে সব কাজ শুরু করতে হয়। সংবিধানে এই আপ্তবাক্য প্রয়োগ করা হলো। প্রস্তাবনায় প্রথম বাক্যে 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের' পরিবর্তে 'জাতীয় স্বাধীনতার

জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের'—এই শব্দগুলো বসানো হলো। এর ফলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল একাত্তরের ২৬ মার্চ এবং ওই দিন থেকে ইতিহাসের যাত্রা শুরু।

প্রস্তাবনার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফেও কিছু পরিবর্তন আনা হলো। বাহাত্তরের মূল সংবিধানে বলা হয়েছিল, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।' এই বাক্যের শেষ অংশটি পরিবর্তন করে লেখা হলো, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।' সংবিধানের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবেন'—এই বাক্যটি পরিবর্তন করে লেখা হলো, 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন।' বাহাত্তরের সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল :

> ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য
> (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা,
> (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান,
> (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার,
> (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।

২২ এপ্রিলের ফরমানে সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হলো।[৭১] মূল সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে নতুন একটা উপধারা যোগ করা হলো—'রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবে।' ফরমানে উল্লেখ করা হলো :

> ...সকল সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ এবং তৎসম্পর্কে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে, অথবা উহাদের নিকট, কোনো কারণেই কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।[৭২]

জিয়াউর রহমান স্বভাবে ছিলেন ধীর-স্থির। তিনি এক-পা, দুই-পা করে এগোচ্ছিলেন। তিনি মনে করলেন, তাঁর একটা ঘোষণাপত্র বা কর্মসূচি থাকা দরকার। জিয়া তাঁর চিন্তাভাবনা এবং লক্ষ্যগুলো শব্দবন্দী করার চেষ্টা করলেন। জোর দিলেন উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর। ২২ মে (১৯৭৭) 'আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে' জিয়া ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[৭৩]

জিয়াউর রহমানের হাতে এখন রাষ্ট্রক্ষমতাই শুধু নয়, ১৯ দফার মোড়কে তাঁর একটা ম্যানিফেস্টোও আছে। কিন্তু তিনি এখনো একজন সামরিক শাসক। সেনাবাহিনীতে দৃশ্যত তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ নেই। দেশের ভেতরে রাজনৈতিক বিরোধীরা বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন ও দিশেহারা। তথাপি রাজনৈতিক বৈধতার বিষয়টি জিয়ার সামনে বিরাট এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দেখা দিল। তাঁকে প্রমাণ করতে হবে, তাঁর পেছনে জনসমর্থন আছে; শুধু বন্দুকের জোরে তিনি ক্ষমতায় বসেননি।

ছক আগেই তৈরি করা ছিল। আইয়ুব খানেরই দেওয়া ফর্মুলা। জিয়া তাঁর ২২ এপ্রিলের ভাষণে গণভোটের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই কথা তিনি রাখলেন। ৩০ মে (১৯৭৭) গণভোটের আয়োজন হলো। তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা আছে কি না, তা যাচাইয়ের জন্য হ্যাঁ-না ভোট নেওয়া হলো। নির্বাচন কমিশন জানাল, শতকরা ৮৮ দশমিক ৫০ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ৯৮ দশমিক ৯ ভাগ ভোটার 'হ্যাঁ' ভোট দিয়েছেন।[৭৪] ভোটকেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতির এই হার উপমহাদেশে স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। গণভোটে যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকেন না, সে জন্য ভোট দেওয়ার ব্যাপারে ভোটারের তেমন আগ্রহও থাকে না। সুতরাং, ভোটার উপস্থিতির এই হার মোটেও বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। নিচের সারির আমলাদের অতি উৎসাহের কারণে ভোট বেশি পড়েছে বলে দেখানো হয়।[৭৫] জিয়া একজন সৈনিক। সামরিক কায়দায় লক্ষ্যে পৌঁছাতে তিনি অভ্যস্ত। রাজনৈতিক বৈধতার একটা ছাড়পত্রের দরকার ছিল তাঁর। গণভোটের মাধ্যমে তিনি এটা পেয়ে গেলেন।[৭৬]

জিয়া তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীতে অসামরিক আরও কিছু তারকা যোগ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মুহাম্মদ শামস-উল হক ২৫ মার্চ (১৯৭৭) উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া তাঁর উপদেষ্টা বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ১৯৭৭ সালের ৩ জুন উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। ২২ জুন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান এবং ২৮ জুন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট) উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান। অন্যদিকে অধ্যাপক আবুল ফজল ২২ জুন (১৯৭৭) রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।[৭৭]

রাজনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ

যুক্তরাষ্ট্রের নানান দলিলে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বারবার। ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে জিয়াউর রহমানের উত্থান এবং এর ধারাবাহিকতায় নতুন একটা

রাজনৈতিক দলের জন্মের ঠিকুজিও বাদ পড়েনি। ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা স্টিফেন আইজেনব্রাউনের দেওয়া তথ্য থেকে এসব জানা যায়। ১৯৭৬-৭৮ সালে তিনি ঢাকায় দূতাবাসের পলিটিক্যাল অফিসার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। ২০০৪ সালে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্রবিষয়ক কথ্য ইতিহাস কর্মসূচির পরিচালক চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিএনপির জন্মের সময়ের ঘটনাবলির সঙ্গে তাঁর ওয়াকিবহাল থাকার কথা জানান। বিভিন্ন সূত্র ও দলিল ঘেঁটে এ সম্পর্কে লেখক-সাংবাদিক মিজানুর রহমান খানের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন *প্রথম আলোয়* ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল ২০১০ সালের ১৯-২১ সেপ্টেম্বর। এই প্রতিবেদনে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে জিয়া হঠাৎ করে ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচন স্থগিতের ঘোষণা দেননি। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে জিয়া রাজনীতিতে আসছেন। জিয়ার সেনানিবাসের বাসায় ওই সময় মার্কিন কূটনীতিকদের বেশ যাতায়াত ছিল। আইজেনব্রাউনের ওপরওয়ালা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন অরভিং চেলস মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো এক বার্তায় (নম্বর ১৯৭৬ ঢাকা এ০৫৫৪৫) মন্তব্য করেছিলেন, 'জিয়া এখন অনেক বেশি নিরুদ্বেগ, সংকল্পবদ্ধ, আত্মবিশ্বাসী ও পেশাদার রাজনৈতিক নেতা। এই নতুন লোকটি আর ব্যারাকে ফিরে যাচ্ছেন বলে আমি মনে করি না।'[৭৮]

জিয়াউর রহমান রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে তিনি যাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা শুরু করেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন ভাসানী-ন্যাপের সভাপতি মশিউর রহমান (যাদু মিয়া)। জিয়ার সঙ্গে যাদু মিয়ার যোগাযোগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া যায় যাদু মিয়ার বড় ভাই মোখলেসুর রহমানের (সিধু ভাই) একটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা থেকে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম ও অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। এখানে সিধু ভাইয়ের ভাষ্য উদ্ধৃত করা হলো :

> খন্দকার মোশতাক তখন ক্ষমতা থেকে চলে গেছেন। জিয়াউর রহমান সাহেব ক্ষমতায় এসেছেন। জিয়াউর রহমান সাহেব এসে যাদু মিয়ার সঙ্গে ডায়ালগ ওপেন করেন।...জিয়াউর রহমান চাচ্ছিলেন যে তাঁকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হোক এবং যাদু মিয়া সেটা নিয়ে কোনো ব্যক্তিগত দর-কষাকষিতে যাতে না যান।...কথা চলছিল সংবিধানের রূপরেখা কী হবে, তা নিয়ে।...জিয়াউর রহমান সাহেবের কাছে ১৯৭২ সালের সংবিধান গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি এক ব্যক্তির হাতে আরও বেশি ক্ষমতা চাইছেন।...কিন্তু আলোচনা যখন চলছে, তখন জিয়াউর রহমান সাহেব হঠাৎ করেই যাদু মিয়ার সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করে দিলেন। এবং গণভোটের সিদ্ধান্ত নিলেন। আর সেটা কার বুদ্ধিতে নিলেন, সে

কথা আমি জানি না। যখনই গণভোট নিলেন, যাদু মিয়া তো একেবারে খেপে লাল। সে আমার বাসায় ছুটে এল। বলল, 'জিয়া আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি একটা প্রেস কনফারেন্স করব।'...

যাদু মিয়ার সেই প্রেস কনফারেন্সের বিবরণ কোনো দিন ছাপানো হয়নি। কারণ, সেটা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।...যাদু মিয়া তার প্রেস কনফারেন্সে বলল যে উনি তো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' যোগ করার কথা বললেন, তার আগে একটা লাইন ছিল 'আউজুবিল্লাহি মিনাস শায়তানির রাজিম'—ওটা দেন নাই কেন? মানে জিয়াকে নানাভাবে আক্রমণ করতে লাগল।...আমাকে এই বলে টেলিফোন করল যে 'আমি তো যা করার করছি। এখন আমার বাড়ি তো ঘেরাও।'...বলল 'সাদাপোশাকের পুলিশে আমার বাড়ি ঘেরাও। বাড়ি থেকে কাউকে বেরোতে দিচ্ছে না, কাউকে ভেতরে আসতেও দিচ্ছে না।'...

ডিজিএফআইয়ের প্রধান আমিনুল ইসলামের তরফ থেকে একটা ফাইল দেওয়া হলো জিয়াউর রহমানের কাছে। তাতে মশিউর রহমানকে মার্শাল লতে গ্রেপ্তার করার কথা বলা হলো। আমিনুল ইসলামের এই ফাইলটা পেয়ে জিয়াউর রহমান করলেন কি এরশাদ সাহেবকে ডাকলেন। তখন উনি ডেপুটি চিফ ছিলেন। মঞ্জুর ছিলেন সিজিএস। এরশাদ এনএসআই, কমিশনার অব পুলিশ এবং ডিআইজিএসবি—এঁদের সবাইকে ডাকলেন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এরশাদ সাহেব প্রথমেই নাকি বলেছিলেন, (আমার এটা যাদুর কাছ থেকে শোনা) 'যাদু মিয়া আমার আত্মীয়। কাজেই আমি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে থাকতে চাই না।'...

এরশাদ সাহেব উঠে চলে গিয়েছিলেন। দেন ইট কেম টু মঞ্জুর। মঞ্জুর বলেছিলেন, 'মশিউর রহমান সাহেব যে মার্শাল ল ভঙ্গ করেছেন, এটা আপনি কী করে জানলেন?'

জিয়া বললেন, 'আমার কাছে টেপ আছে।'

মঞ্জুর বললেন, 'টেপটা প্লে করেন।'

টেপ প্লে করা হলো। বাজানো টেপ শুনে দেখা গেল যে মার্শাল লকে উনি আক্রমণ করেননি।...যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত মঞ্জুরের মতামতই বজায় থাকল এবং মশিউর রহমান যাদু মিয়া ওয়াজ নট অ্যারেস্টেড আন্ডার মার্শাল ল ফর হোল্ডিং দ্যাট প্রেস কনফারেন্স। কিন্তু কয়েক দিন তাঁর দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়।...যা-ই হোক, রেফারেন্ডাম তো হয়ে গেল। জিয়াউর রহমান শতকরা ৯৬ না ৯৯ ভাগ ভোট পেলেন। ব্যাপারটা দেশেও কেউ বিশ্বাস করেনি, বিদেশে তো নয়ই। উনি গেলেন কমনওয়েলথ হেড অব স্টেটসের মিটিংয়ে। সেই সময় *ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান* লিখে দিল, উনি যে ভোট পেয়েছেন, সেটা ক্যালকুলেট করলে দেখা যাবে যে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একটা করে ভোট পড়েছে। যেটা ব্রিটেন কিংবা অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশেও আমরা দেখি না।...

জিয়াউর রহমান কমনওয়েলথ সম্মেলন থেকে ফিরে এসে যাদু মিয়াকে আবার ডাকলেন।...বললেন, 'যাদু ভাই, এবার আপনি ছাড়া কেউ আর আমার মানসম্মান রক্ষা করতে পারবে না।...আমাকে জনসাধারণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে দেন।'

জিয়ার সঙ্গে তাঁর এসব কথা হয়েছে অনেক রাত পর্যন্ত। খানাপিনাও হয়েছে। তারপর ভোর ছয়টার দিকে যাদু মিয়া টেলিফোন করে আমাকে বলল, 'আপনি একটু আসেন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'...

তখন তাঁর সঙ্গে মিলে একটা রাজনৈতিক কৌশল ঠিক করা হলো। কৌশলটা ছিল এরকমের, আওয়ামী লীগের শেষের দিকে যে কাজ-কারবার, তাতে করে একটা বিপুলসংখ্যক জনগণ রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।...আমি বললাম, 'যদি এই সাইলেন্ট মেজরিটিকে তুমি কনভার্ট করে তোমার পক্ষে আনতে পারো...তাহলে তোমার সাফল্যের সুযোগ আছে। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করাতে হবে। একটা রাজনৈতিক জোট গড়ে তুলতে হবে।'...

যাদু মিয়া বলল, 'মুসলিম লীগকে পারব।'

আমি বললাম, 'মুসলিম লীগ মানেই তো সবুর খান। সবুরকে তো বিশ্বাস করবে না বাংলাদেশের লোক।'

তখন ও বলল, 'একটা কাজ করা যায়, সবুর ভাইকে কিছু ভালো ব্র্যান্ডি-ট্র্যান্ডি দিয়ে তাঁর সঙ্গে আজকে রাতেই একটু কথা বললে হয় না? ওনাকে যদি কিছুদিনের জন্য সরিয়ে দিই, আর শাহ আজিজকে মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয়, অর্থাৎ চার্জ বুঝিয়ে সবুর খান সরে যান, তাহলে শাহ আজিজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।'

সবুর সাহেবের কাছে খুব ভালো ব্র্যান্ডি নিয়ে গেল যাদু মিয়া এবং রাতের মধ্যেই সবুর সাহেব দু-এক মাসের জন্য শাহ আজিজকে তাঁর দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে দেশের বাইরে চলে গেল। ইট ওয়াজ অল ফাইন্যান্সড বাই গভর্নমেন্ট অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান। এ ঘটনার পরপরই শাহ আজিজ যাদু মিয়ার সঙ্গে জয়েন করলেন। এই ঘটনা ঘটেছিল 'জাগদল' হওয়ার পর। এভাবে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলো। তার মধ্যে কাজী জাফর এল, তারপর যাদু মিয়া ন্যাপকে আনল।[৭৯]

জিয়ার লক্ষ্য ছিল দুটো—সামরিক বাহিনীতে নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা এবং সিভিল প্রশাসনে শৃঙ্খলা এনে তার ওপর কড়া নজরদারি রাখা। সামরিক বাহিনীর ভেতরে তাঁর প্রতিপক্ষ গ্রুপগুলোকে তিনি তত দিনে প্রায় ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালের মে মাসের মাঝামাঝি এক সরকারি আদেশে ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত মেজর ডালিম, মেজর শাহরিয়ার, মেজর রাশেদ চৌধুরী ও মেজর নূরকে সেনাবাহিনীর চাকরিতে ফিরিয়ে আনা হয়। ফারুক ও

রশিদ ছাড়া সবাইকে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনে চাকরি দেওয়া হয়।[৮০] এভাবেই জিয়া সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের খুশি রাখার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, সিভিল প্রশাসনের ওপর সামরিক গোয়েন্দাদের উৎপাত বেড়ে যায়। জিয়া যখন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি রাজনীতি করবেন, এ কাজেও তিনি সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীকে কাজে লাগান। প্রশাসন ও রাজনীতির এহেন 'সামরিকায়ন' সম্পর্কে আকবর কবির চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন।

> উপদেষ্টা পদে আমি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে আগে গৃহীত এক প্রস্তাব অনুযায়ী এর সম্পাদকের ভার দিয়েছিলাম প্রয়াত হাসান হাফিজুর রহমানকে। এ নিয়ে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কেননা, ডিজিএফআইর মহাপরিচালক, এনএসআইর মহাপরিচালক ও এসবি-ডিআইজি এবং আমার মন্ত্রণালয়ের সচিবও তাঁকে 'কমিউনিস্ট' বলে আখ্যায়িত করে বিরাট বিরাট নোট পাঠাতে শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট জিয়ার কাছে। আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকি এবং শেষ পর্যন্ত জিয়ার সম্মতি লাভ করি। আমি বুঝতে পারছিলাম গোলাম মোস্তফার সঙ্গে বহু বিষয়ে আমার মতের মিল হবে না। তিনি মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ আমলা। সুতরাং, আমি স্থির করলাম যে তাঁকে বদলানো দরকার। আমি তাই এঁকে অন্যত্র বদলি করে অন্য সচিব দেওয়ার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে জানাই। তারা অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি করে কাজী আজহার আলীকে আমার মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। আমি কবি শামসুর রাহমানকে *দৈনিক বাংলার* সম্পাদক নিযুক্ত করি। যদিও কোনো কোনো দিক থেকে এর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছিল, তবে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয়নি।...
>
> ঢাকায় কোনো নাট্যশালা না থাকায় গার্লস গাইড ভবন ও মহিলা সমিতি হলে নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এবং এখনো হয়। তখন শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক ছিলেন ড. সিরাজুল ইসলাম। এর প্রাঙ্গণে একটা টিনের ঘরে প্রেসক্লাব ছিল এবং তাদের প্রায় এক বিঘা জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু অর্থাভাবে ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে জাতীয় প্রেসক্লাবের মর্যাদা অনুযায়ী কোনো দালান গড়ে ওঠেনি। আমি প্রস্তাব দিই, তোপখানা রোড ও আবদুল গণি রোডের কোনো একটি সরকারি দালান প্রেসক্লাবকে দিয়ে ওই জায়গা শিল্পকলা একাডেমীকে দিলে সমগ্র খালি জায়গায় পনেরো শ দর্শক বসার উপযোগী একটি আধুনিক নাট্যশালা স্থাপন করা যায়। জিয়া সম্মতি দিলে প্রেসক্লাবকে তার বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়, যা পরে জাতীয় প্রেসক্লাবের মর্যাদা অনুযায়ী সুরম্য অট্টালিকা বানানো হয়।...
>
> একদিন জিয়া আমাকে জানালেন, সামরিক দপ্তরে আমার যোগাযোগ ভালো থাকা প্রয়োজন। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমার একজন স্টাফ অফিসার দরকার ও মেজর ওয়াহেদ নামে এক অফিসারকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করা ছাড়া কী কাজ করতেন জানি না। আমাকে

কখনো বিরক্ত করেননি। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, কিছু কিছু লোক আমার বিরুদ্ধে জিয়ার কান ভারী করছিলেন। বিশেষত, *দৈনিক আজাদ*-এর কলামিস্ট খোন্দকার আবদুল হামিদ (যিনি পরে মন্ত্রীও হয়েছিলেন) ছদ্মনামে ক্রমাগত আমাকে আক্রমণ করে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। যেহেতু জিয়া আমার নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো আদেশ দিতে পারছিলেন না, তিনি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছিলেন বোধ হয়। কেননা, এক রাতে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'আপনি বহু বছর সমাজকল্যাণে কাজ করেছেন, আপনার দপ্তর পাল্টে দিই।' আমি এ সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলাম। আমি তাঁকে বললাম, কোনো প্রয়োজন নেই, আমি কালই পদত্যাগপত্র পাঠাব। আমি শুনেছিলাম, আমার জায়গায় শামসুল হুদা চৌধুরী সাহেবকে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

এর কয়েক মাস আগে থেকেই উপদেষ্টা পরিষদের সভার শুরুতে জিয়া সদস্যদের মতামত চাচ্ছিলেন একটি রাজনৈতিক দল গঠন সম্পর্কে। এ যেন আইয়ুব খানের কপি। আমি বলেছিলাম, যারা বর্তমানে বা আগে কোনো রাজনৈতিক দলে ছিল, তাদের বাদ দিয়ে আপনার গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ ও ডেপুটি কমিশনারদের মাধ্যমে জনগণের কাছে কোনো বদনাম নেই এবং আগে কোনো দলে ছিলেন না—এমন সব ব্যক্তিকে নিয়ে যদি দল গঠন করা যায়, তবে তাতে আমার পূর্ণ সম্মতি আছে, যদিও আমি নিজে যোগ দেব না।

আমার এই প্রস্তাব জিয়ার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কেননা, ইতিমধ্যে তিনি বিভিন্ন দল থেকে সদস্য নির্বাচন প্রায় সমাধা করে ফেলেছিলেন।[৮১]

রাজনীতির হাটে নেতা বেচাকেনা নতুন নয়। এক দল ছেড়ে অন্য দলে ভিড়ে যাওয়ার কারণে ১৯৫৬-৫৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঘন ঘন সরকারের পতন হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে যাঁরা ঢাকঢোল পিটিয়ে বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন, মধ্য আগস্টে গণেশ উল্টে যাওয়ায় তাঁরা অনেকেই বাকশালের গালমন্দ করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, নতুন শাসকদের কৃপা পাওয়া। জিয়াউর রহমান এসব রাজনীতিবিদকে দেখতেন কিছু করুণা আর কিছু ঘৃণা নিয়ে। তিনি সম্ভবত পুরোনো প্রবাদেই আস্থা রেখেছিলেন—ভাত ছিটালে কাকের অভাব হয় না। পারিবারিক সূত্রে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আকবর কবির 'রাজনৈতিক শকুনদের' ব্যাপারে তাঁকে সাবধান করে দিলেও তিনি এদের অনেককে তাঁর সঙ্গে ভিড়িয়েছিলেন এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর তাদের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে একটুও দ্বিধা করেননি।

জিয়ার কাছে যাঁরা ভিড়েছিলেন বা ভিড়তে চেয়েছিলেন, তাঁদের কারও কারও অভিজ্ঞতা ছিল বেশ তেতো। তাঁদের একজন ছিলেন ছাত্রলীগের একসময়ের ডাকাবুকো নেতা ও প্রথম জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন।

পঁচাত্তরের নভেম্বরে ক্ষমতা হারিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগ নামে একটা রাজনৈতিক দল তৈরি করেছিলেন। শাহ মোয়াজ্জেম এই দলের সাধারণ সম্পাদক হন। পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনীতির নতুন সমীকরণে মোশতাক এবং জিয়া ছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের পথ পরিষ্কার করার জন্য জিয়া মোশতাককে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে মোশতাকের পাঁচ বছরের সাজা হয়। হাইকোর্টের রায়ে পরে তিনি ছাড়া পান। জিয়া সামরিক ফরমানের বলে একটা সিদ্ধান্ত জারি করেন যে ন্যূনপক্ষে ছয় মাস রাষ্ট্রপতি পদে বহাল না থাকলে কোনো রাষ্ট্রপতি পরবর্তী সময়ে কোনো রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাবেন না। এর ফলে জিয়া বঙ্গভবন থেকে সাবেক রাষ্ট্রপতি মোশতাকের ছবি সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ পান।

১৯৭৭ সালে জিয়া যখন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন, একপর্যায়ে শাহ মোয়াজ্জেমের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়। মোশতাক তখন জেলে। ঠিক হয়, ডেমোক্রেটিক লীগের পক্ষ থেকে শাহ মোয়াজ্জেম, মোহাম্মদ উল্লাহ, অলি আহাদ এবং কে এম ওবায়দুর রহমান বঙ্গভবনে জিয়ার সঙ্গে দেখা করবেন ও কথাবার্তা বলবেন। কিন্তু নিমেষেই শাহ মোয়াজ্জেমের স্বপ্নের বেলুন ফুটো হয়ে যায়। এ ব্যাপারে শাহ মোয়াজ্জেমের বয়ান তুলে ধরা হলো :

> দলের মধ্যে উৎসাহের লক্ষণ টের পেলাম। বঙ্গভবনে যাওয়ার দিন সকালে গোসলাদি সেরে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। ওনারা সকলেই আমার বাসায় আসবেন এবং আমরা একসঙ্গে রওনা হব। তখনো প্রায় ঘণ্টা খানেক বিলম্ব আছে। দেখলাম গাড়ি করে কয়েকজন লোক নেমে দোতলায় আমার ঘরে চলে এসেছে। মনে মনে প্রেসিডেন্টের সৌজন্যবোধে খুশি হলাম। তিনি গাড়িসহ লোক পাঠিয়েছেন। তারা এসে বলল, স্যার, আপনি দেখি প্রস্তুত হয়েই আছেন। চলুন, যাওয়া যাক।
>
> বললাম, আমার আরও তিনজন সহকর্মী এখানে আসবেন, তাঁরা এলে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।
>
> তারা পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করে বলল, স্যার, আপনি চলুন, অন্য গাড়ি ও লোক রেখে যাচ্ছি, ওনাদের নিয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে হয়তো পূর্বেই প্রেসিডেন্ট সাহেব একটু আলাপ করবেন। চলুন, যাওয়া যাক।
>
> বঙ্গভবনে যাচ্ছি বলে আনন্দিত হয়েই গাড়িতে গিয়ে বসলাম। বসে বসে ভাবছিলাম আলাদা কী আলোচনা করতে পারেন প্রেসিডেন্ট সাহেব! ওয়ারী থেকে বঙ্গভবন পাঁচ মিনিটের রাস্তা। কিন্তু দশ মিনিটের ওপর হয়ে গেল গাড়ি চলছেই। বিষয় কী? বাইরে তাকাতেই বুঝতে পারলাম, বঙ্গভবনের রাস্তা এটা

নয়—অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, আমার তো বঙ্গভবনে যাওয়ার কথা, আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

তারা এবার আর মিথ্যার আশ্রয় নিল না। বলল, স্যার, যাবেন আপনি ঠিকই, তবে বঙ্গভবনে নয়। আপাতত ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। গাড়ি সেদিকেই যাচ্ছে।...কিছুক্ষণের মধ্যেই জেলগেটে এসে গেলাম।...

ঘৃণায় তাদের দিকে ফিরেও তাকালাম না।...এ ঘৃণা সেই লোকটির জন্য, যে এত বড় উচ্চাসনে অবস্থান করেও এমনই নিচু স্তরের প্রবঞ্চনা এবং অহেতুক নিপীড়নের পন্থা বেছে নিতে পারে।...[৮২]

বিরোধীদের শায়েস্তা

রাজনীতির মঞ্চে জিয়াউর রহমানের উত্থানে সমসাময়িক রাজনীতিবিদেরা তেমন বাধা হয়ে উঠতে পারেননি। বাধা এসেছিল সেনাবাহিনীর ভেতর থেকেই। ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত সেনা কর্মকর্তাদের অনেকেই দেশে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। জিয়া এতে রাজি ছিলেন না। তিনি চাননি দেশে ফিরে এসে তাঁরা আবার ঘোঁট পাকাক ও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো 'ষড়যন্ত্র' করুক। তিনি অবশ্য তাঁদের নানাভাবে খুশি রেখে বাইরে থাকাটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। অভ্যুত্থানকারীরা ওই সময় লিবিয়ায় ছিলেন। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াব লিবিয়া সফরে যান এবং ত্রিপোলিতে ফারুক, রশিদ ও ডালিমের সঙ্গে দেখা করেন। জিয়া ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৬) সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলাম শিশুকে লিবিয়ায় পাঠান। শিশু অভ্যুত্থানকারীদের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে চাকরির প্রস্তাব দেন। ফারুক ও রশিদ ছাড়া অন্যরা এই প্রস্তাবে রাজি হন। ফারুক-রশিদ একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছেন। তাঁরা আবার অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করতে থাকেন।

২০ এপ্রিল (১৯৭৬) রশিদ ঢাকায় আসেন। এর তিন দিন পর ২৩ এপ্রিল আসেন ফারুক। ২৫ এপ্রিল অন্য একটি বিমানে ডালিম ঢাকায় আসেন। একই বিমানে আসেন তাওয়াব। ২৭ এপ্রিল বগুড়া সেনানিবাসে ট্যাংক রেজিমেন্টে গোলমাল শুরু হয়। রশিদ ও ডালিমকে ঢাকায় আটক করে বিমানে ব্যাংকক পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জিয়া ফারুককে বগুড়ায় পাঠান বেঙ্গল ল্যান্সার্সের সৈনিকদের শান্ত করার জন্য। ফারুককে পেয়ে তারা আরও উৎসাহিত হয়ে পড়ে। ফারুক সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকেন।[৮৩] এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য পনেরো ও ষষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই

রেজিমেন্ট দুটির কমান্ডিং অফিসার ছিলেন যথাক্রমে লে. কর্নেল আনোয়ার ও লে. কর্নেল হান্নান শাহ।[৮৪] ফারুক আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকেও ব্যাংককগামী একটা বিমানে তুলে দেওয়া হয়। জিয়া ৩০ এপ্রিল তাওয়াবকে বরখাস্ত করেন। তাঁকে জোর করে লন্ডনগামী একটা বিমানে উঠিয়ে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

১৯৯৭ সালের ৩ জুন ফারুক আবার ছদ্মবেশে ব্যাংকক থেকে ঢাকায় আসেন। তাঁর সঙ্গে কিছু বন্দুক, লিফলেট ও মিথ্যা পরিচয়পত্র ছিল। বিমানবন্দরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। একটা বিশেষ সামরিক আদালতে তাঁর পাঁচ বছরের সাজা হয়।[৮৫]

সেনাবাহিনীতে চাপা অসন্তোষ ছিল। ৭ নভেম্বরের (১৯৭৫) সিপাহি বিদ্রোহের রেশ থেকে গিয়েছিল তখনো। ১৯৭৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ২২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকেরা বগুড়া সেনানিবাসে বিদ্রোহ করে। তারা দুজন কর্মকর্তাকে হত্যা করে, ব্রিগেড কমান্ডারসহ অনেক কর্মকর্তাকে বন্দী করে এবং পঁচাত্তরের সিপাহি বিদ্রোহে সাজাপ্রাপ্ত কয়েকজনকে জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে আনে। এদিকে ঢাকা সেনানিবাসে সিগন্যাল কোরের সৈনিকেরা বিদ্রোহ করে। কুর্মিটোলা বিমানঘাঁটির প্রায় ৭০০ সৈনিক তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তেজগাঁও বিমানবন্দরের টারমাকে তারা বিমানবাহিনীর ১১ জন কর্মকর্তাকে হত্যা করে। ২ অক্টোবর কয়েক ঘণ্টার জন্য তারা ঢাকা বেতারকেন্দ্রও দখলে রাখে। জিয়ার অনুগত সৈন্যরা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করে। বিদ্রোহে জড়িত থাকার সন্দেহে ১,১৪৩ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। অনেককে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৮৬] সেনাবিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত থাকার ব্যাপারে জাসদ, ডেমোক্রেটিক লীগ ও সিপিবির প্রতি জিয়ার সন্দেহ হয়। ১৩ অক্টোবর (১৯৭৭) জিয়া দল তিনটিকে নিষিদ্ধ করে এক ফরমান জারি করেন। ফরমানে বলা হয়:

> যেহেতু প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করার কারণ রহিয়াছে যে ডেমোক্রেটিক লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত আছে;
>
> সেহেতু, এক্ষণে, ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দল প্রবিধানের (১৯৭৬ সালের ২২ নং সামরিক আইন প্রবিধান) ১০(১) অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক উপরোক্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে অবিলম্বে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।[৮৭]

আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ঢালাও অভিযোগ ছিল। তাঁদের 'শায়েস্তা' করার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন জিয়াউর রহমান। ২৮ নভেম্বর (১৯৭৭) তিনি 'জননেতা অবৈধভাবে সম্পত্তি অর্জন প্রবিধান' শিরোনামে ১০ নম্বর সামরিক আইন প্রবিধান জারি

করেন। এই বিধানে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বরের আগে যাঁরা কোনো রাষ্ট্রীয় পদে ছিলেন অথবা গণপরিষদ বা জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন, তাঁদের দেশের ভেতরে বা বাইরে নিজের বা অন্য কারও নামে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দ্বারা গঠিত নির্ধারিত সেলের কাছে জমা দিতে হবে। সম্পদের বিবরণ জমা না দিলে বা তথ্য গোপন করলে দুই বছরের জন্য কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড, পাঁচ থেকে সাত বছরের জন্য রাষ্ট্রীয় কোনো পদে নিযুক্তি বা জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করা হতে পারে।[৮৮] একই দিন এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই আদেশ জারির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয় :

> সাবেক সংসদ সদস্যসহ রাষ্ট্রীয় পদে থাকা ব্যক্তিদের অর্জিত সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ জানতে জনগণের দাবির বিষয়টি সরকার বিবেচনা করেছে।
>
> জনগণ এই আশা নিয়ে ওই সব ব্যক্তিকে ভোট দেন যে, তাঁরা তাঁদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সৎভাবে ও সর্বোত্তম জাতীয় স্বার্থে পালন করবেন। কিন্তু আশঙ্কা করা হচ্ছে যে অতীতে কিছু-সংখ্যক সংসদ সদস্য ও রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার ও জনগণের দ্বারা তাঁদের ওপর বিশ্বাস করে ন্যস্ত সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করেছিলেন।
>
> এইরূপ আশঙ্কা কতখানি সত্য, তা যাচাই করার জন্য এবং যাঁরা বিশ্বাসের বরখেলাপ করে প্রশাসনের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন, তাঁদের শাস্তি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এই প্রবিধান জারি করেছেন।[৮৯]

অবৈধভাবে সম্পত্তি অর্জন-সংক্রান্ত এই সামরিক ফরমানের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো। বাংলাদেশ জাতীয় দলের আহ্বায়ক আমেনা বেগম, ইউনাইটেড পিপলস পার্টির (ইউপিপি) সভাপতি ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক কাজী জাফর আহমদ, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়নের সভাপতি হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল হোসেন খান, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল বাশার ও সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান মজুমদার, সাম্যবাদী দলের (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) সম্পাদক নগেন সরকার ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য খন্দকার আলী আব্বাস এবং ভাসানী ন্যাপের সেক্রেটারি জেনারেল আবু নাসের খান ভাসানী জিয়াউর রহমানের এই পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দেন।[৯০] বাংলাদেশ পিপলস লীগের প্রধান ড. আলীম আল রাজী এক বিবৃতিতে বলেন, কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া জননেতাদের সম্পদের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ, তদন্ত কমিটির কাছে পছন্দমতো আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ এবং দোষী সাব্যস্ত হলে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার

সুযোগ দিতে হবে।[৯১] জাতীয় জনতা পার্টির প্রধান জেনারেল (অব.) ওসমানী একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের আগে এবং পঁচাত্তরের ৬ নভেম্বরের পরে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদেরও এই আইনের আওতায় নিয়ে আসার দাবি জানান এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের সমন্বয়ে একটি প্রকাশ্য বিচার বিভাগীয় আদালতে অভিযুক্তদের বিচারের প্রস্তাব করেন।[৯২]

সামরিক সরকারের এই প্রবিধান যে আওয়ামী লীগের নেতাদের হয়রানি করার জন্যই জারি করা হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, উল্লিখিত সময়ে তাঁরাই ছিলেন ক্ষমতায়। ১২ ডিসেম্বর (১৯৭৭) আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন এক বিবৃতিতে বলেন :

> দুর্নীতি বাংলাদেশের সমাজজীবনে বিস্তারের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। তার সঙ্গে রাজনীতি কতখানি জড়িত আমরা জানি না। তবে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের অনেকেই যে তাহার সহিত যুক্ত আছেন, সেই নজিরের অভাব নাই।
>
> বঙ্গবন্ধুর সরকারের নির্দেশেও জনপ্রতিনিধিরা তাঁহাদের সম্পত্তির হিসাব দাখিল করেন। আমরা বিশ্বাস করি যে তাহার রেকর্ডপত্র বর্তমান সরকারের হাতের নাগালেই রহিয়াছে। ইতিমধ্যে আড়াই বৎসর ধরিয়া আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের তদন্ত চালানো হইয়াছে।
>
> এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দাবি, ১৯৪৭ সাল হইতে আজ পর্যন্ত যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন বা হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের এবং যে সমস্ত আমলা ও ব্যবসায়ী দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে রাতারাতি ভাগ্য পরিবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের সম্পত্তির হিসাব নেওয়া উচিত।[৯৩]

স্থিতিশীলতা

৭ নভেম্বরের (১৯৭৫) পর থেকে জিয়াউর রহমান যেভাবে নানা রকমের বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যকার বিভিন্ন গ্রুপের বিরুদ্ধে রীতিমতো লড়াই করে ক্ষমতা সংহত করেন, একে ইতিবাচকভাবেই কেউ কেউ মূল্যায়ন করেছিলেন। সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটিতেও এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। তাদের মন্তব্য ছিল, 'জিয়া প্রধান সামরিক শাসকের পদ গ্রহণ করায় স্বাধীনতা নস্যাৎ হওয়ার তথা চরম প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলোর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার বিপদ হ্রাস পেয়েছে।'[৯৪] সিপিবির এই মূল্যায়নের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যায় জাসদ-ছাত্রলীগের নেতা কামালউদ্দিন আহমেদের বর্ণনায় :

> সামরিক আইন অমান্য করার অভিযোগে আমি তখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের 'বিশ' সেলে। এটা ১৯৭৭ সালের ঘটনা। 'বিশ' সেলে তখন মণি সিংহসহ

সিপিবির আরও কয়েকজন নেতা বন্দী ছিলেন। একদিন মণি সিংহ আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'তোমার হাতের লেখা ভালো, একটা চিঠি ড্রাফট করে দিতে হবে।' উনি ডিকটেশন দিলেন, আমি লিখলাম। জিয়াকে উদ্দেশ করে একটা চিঠি। বিষয়বস্তু ছিল, আমরা আপনার ১৯ দফা সমর্থন করি। তাহলে আমরা জেলে কেন ইত্যাদি। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁরা ছাড়া পেয়ে যান এবং জিয়ার খালকাটা কর্মসূচিতে অংশ নেন। আমার দুই বছরের সাজা হয়েছিল। ছাড়া পাই ১৯৭৮ সালের মার্চে।[৯৫]

খন্দকার মোশতাককে হটিয়ে জিয়া ক্ষমতার শীর্ষে চলে আসায় পরিস্থিতির একটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির মূল্যায়ন ছিল যে জিয়া 'পরিবর্তনের ধারা'র সূচনা করেছেন। ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির মূল্যায়নে বলা হয় :

> ...আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী গোষ্ঠীগুলি জাতীয় স্বাধীনতার সুফলসমূহ, রাষ্ট্রীয় চার নীতি, জাতীয়করণ, জোট-নিরপেক্ষ প্রগতিশীল বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতা নস্যাৎ এবং পুনরায় পাকিস্তানি আমলের মতো অবাধ পুঁজিবাদী শোষণ কায়েমের জন্য যেভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিল, তা কতক পরিমাণে প্রতিহত হয়েছে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী গোষ্ঠীগুলি বর্তমানে কিছুটা কোণঠাসা হয়েছে।[৯৬]

সিপিবির এই মূল্যায়নে খন্দকার মোশতাকের তুলনায় জিয়াউর রহমানকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতার প্রশ্নে জিয়ার ভূমিকাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয়।

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট

জিয়াউর রহমান ইতিপূর্বে ১৯ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটা রূপরেখা দিয়েছিলেন। এটা বাস্তবায়নের জন্য তাঁর একটি বাহনের দরকার ছিল। দরকার ছিল তৃণমূল পর্যায়ে একটা ভিত তৈরি করা। এই লক্ষ্যে তিনি এগোচ্ছিলেন ধাপে ধাপে।

৩০ মে (১৯৭৭) গণভোট অনুষ্ঠানের পর দেশের ৭৭টি পৌরসভা ও একটি পৌর করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে জানুয়ারি মাসেই ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার একটা মজবুত ভিত এবং উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে একটা প্রভাববলয় তৈরি করার এই ফর্মুলা অতীতে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান চালু করেছিলেন। জিয়া তাঁকেই অনুসরণ করলেন।

জিয়া তাঁর উপদেষ্টা পরিষদে কয়েকটি নতুন মুখ ঢোকালেন। ৯ ডিসেম্বর (১৯৭৭) উপদেষ্টা পরিষদে নিয়োগ পেলেন এনায়েতউল্লাহ খান, ডা. এম আর খান, জাকারিয়া চৌধুরী, বি এম আব্বাস এ টি, ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ক্যাপ্টেন (অব.) নূরুল হক এবং মেজর জেনারেল (অব.) মজিদ উল হক। মওদুদ আহমদ উপদেষ্টা পরিষদে নিয়োগ পান ৩০ ডিসেম্বর।[৯৭]

জিয়া রাজনৈতিক দল তৈরির আগেই একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের চিন্তা করেন, যাতে করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটা বিস্তৃত প্ল্যাটফর্ম বানানো যায়। একটা নির্দিষ্ট দর্শন ও কর্মসূচির চেয়ে তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের পাল্টা একটা বড়সড় মঞ্চ তৈরি করা। বিজয় দিবসের আগের সন্ধ্যায় ১৫ ডিসেম্বর (১৯৭৭) বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া দেড় ঘণ্টার এক দীর্ঘ বক্তৃতায় 'ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার' আহ্বান জানিয়ে জিয়া বলেন :

> এই অগ্রগতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন সুসংহত সংগঠনের যাতে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকবে। বলা বাহুল্য, দেশে একটি রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করার মধ্য দিয়েই এই শূন্যতার অবসান সম্ভব। দেশের সঠিক উন্নয়নকল্পে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমি দেশের বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী, ব্যক্তিত্ব ও কর্মীকে সংঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করছি।...
>
> কাজেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে এবং আমাদের মহান জনগণের উপর পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে আমি একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের এই ফ্রন্টের মূল কথা হচ্ছে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। আমাদের এই রাজনৈতিক ফ্রন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ অচিরেই প্রকাশ করা হবে।...
>
> ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে সকল বাংলাদেশি—যাঁরা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, তাঁরা এই ফ্রন্টে যোগ দিতে পারেন।[৯৮]

মার্কিন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করলে এটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে জিয়া তাঁর রূপান্তরের প্রক্রিয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অবহিত রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁর ওপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারেরও নজরদারি ছিল। মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল অফিসার আইজেনব্রাউনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। আইজেনব্রাউন যাদু মিয়ার কাছ থেকে খবরাখবর পেতেন এবং তা ওয়াশিংটনকে জানাতেন। '৭৮ সালের বসন্তে আইজেনব্রাউনকে যাদু মিয়া বলেছিলেন, 'জিয়াউর রহমান দল করতে চান। কিন্তু জিয়ার জানা নেই যে এটা কীভাবে করতে হবে। সুতরাং রাজনীতিতে যাঁরা অবসরে গেছেন, তিনি তাঁদের একটা সভা ডাকলেন। এই সভা ডাকা হয়েছিল গভীর রাতে। জিয়া তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ নিলেন। সেই বৈঠকে

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, যাদু মিয়া আমার কাছে তাঁদের নাম প্রকাশ করলেন।' মওদুদ আহমদের মতে, 'ক্ষমতায় আসার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে জিয়া ব্যক্তিগতভাবে ও গোপনে নিজের অফিস ও বাড়িতে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে দেখা করে সলাপরামর্শের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন।'[৯৯]

আইজেনব্রাউনের সাক্ষাৎকারে এ বিষয়টি বেশ খোলামেলাভাবেই ফুটে উঠেছে :

> যাদু মিয়া আমাকে বললেন, সেনানিবাসে অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিস্তারিত আপনার কাছে প্রকাশ করতে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যাদু মিয়ার সঙ্গে বৈঠক শেষে আমি দূতাবাসে ফিরলাম। সব কথা খুলে বললাম ক্রেইগ বেক্সটারকে (পলিটিক্যাল কাউন্সিলর)। তিনি তা জানিয়ে দিলেন রাষ্ট্রদূতকে।
>
> এ সম্পর্কে তখন পর্যন্ত আমাদের কিছুই জানা ছিল না। সুতরাং, আমরা এ কথা দ্রুত জানিয়ে দিলাম ওয়াশিংটনকে। এর কয়েক দিন পর যাদু মিয়া আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তখন আমাকে সেনানিবাসে অনুষ্ঠিত রাত্রিকালীন ধারাবাহিক বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন। জিয়া কী করতে চান, কার কী চিন্তাভাবনা, কে কী বলেছেন ইত্যাদি। আমি তখন এসব আলাপ-আলোচনার বিষয় সম্পর্কে রিপোর্ট করেছি ওয়াশিংটনকে।[১০০]

ছাত্রসংগঠন তৈরির চেষ্টা

জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দল তৈরির প্রক্রিয়াটিতে বৈচিত্র্য ছিল। তিনি সব কটি ডিম এক ঝুড়িতে রাখতে চাননি। দল তৈরির কাজে অনেক ব্যক্তি ও মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলাম শিশুর অফিসে রাতের বেলায় রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা আসতেন এবং কথাবার্তা বলতেন। জিয়াও কখনো-সখনো সেখানে উপস্থিত থাকতেন। জিয়ার একান্ত সচিব কর্নেল অলি আহমদের সঙ্গে মাঠপর্যায়ের অনেক লোকের যোগাযোগ ছিল। তাঁর মাধ্যমেও জিয়া অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ (সিজিএস) ব্রিগেডিয়ার আবুল মঞ্জুরও জিয়াকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। মঞ্জুর রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন না। তাঁর যোগাযোগ ছিল অসামরিক আমলাদের সঙ্গে। তাঁকে ডাকা হতো 'পণ্ডিত' নামে। কর্নেল অলি জিয়ার সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সিনিয়র লেকচারার (সহকারী অধ্যাপক) আরিফ মঈনুদ্দীনকে পরিচয় করিয়ে দেন। এর আগে ১৯৭৬ সালের আগস্টে অলি আরিফকে রাজনীতিতে আসার জন্য বলেছিলেন। আরিফ তখন একটা কোর্সে

কানাডায় ছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে এলে অলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। পারিবারিক সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন মামা-ভাগনে। তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রাথমিক কথোপকথন ছিল এরকম :

অলি : ইউ বিলং টু আ পলিটিক্যাল ফ্যামিলি। উই ওয়ান্ট ইউ উইথ আস।

আরিফ : মামু, আমাদের ফ্যামিলি তো আওয়ামী লীগার (আরিফের মা বেগম তোফাতুন্নেসা আজিম ছিলেন চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ আইনসভার সদস্য এবং ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন)। আম্মা অ্যালাও করবেন না।

অলি : নানিকে জিজ্ঞেস করে আসেন।

আরিফ তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করে অলির প্রস্তাবটি জানান। তাঁর মা বলেন, 'তুই যাইতে পারস, তুই তো আওয়ামী লীগে চান্স পাবি না।' আরিফ অলির কাছে ফিরে আসেন।

আরিফ : মামু, শি হ্যাজ অ্যাগ্রিড।

অলি : ওয়েলকাম টু দ্য পার্টি।[১০১]

তখনো দলের কোনো খবর নেই। অলির সঙ্গে আরিফের আলাপ থেকে মনে হয়, জিয়া দল করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং এ কাজে কর্নেল অলিকে নিয়োগ করেছেন। দিন দশেক পরে চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে জনৈক মেজর মুনিম আরিফকে ফোন করে বললেন, 'দিস ইজ অ্যান অফিশিয়াল কল। দ্য চিফ ইজ গোয়িং টু মিট ইউ টুমরো ইভিনিং অ্যাট সিক্স অ্যাট ভিভিআইপি গেস্টহাউস। কাম হাফ অ্যান আওয়ার আর্লিয়ার।' আরিফ যথাসময়ে যথাস্থানে হাজির হলেন। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান ফজল করিম, *পিপলস ভিউ*-এর মালিক-সম্পাদক নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পরে পিডিপিতে যোগদানকারী মাওলানা আবু তাহের এবং শিল্পপতি জহিরউদ্দিন খান। জিয়া আরিফকে স্বাগত জানিয়ে একান্তে ডেকে নিলেন। তাঁদের মধ্যে যে কথাবার্তা হলো :

জিয়া : আই হ্যাভ মেট ইউ সামহোয়্যার। হ্যাভন্ট আই?

আরিফ : ইয়েস, টোয়াইস।

জিয়া : আই লাইক টু আসক ইউ টু অর্গানাইজ দ্য ইয়ুথ অব ইয়োর এরিয়া।

আরিফ : হাউ অ্যাবাউট অর্গানাইজিং দ্য স্টুডেন্টস?

জিয়া : নো নো, আই ওয়ান্ট দেম টু স্টাডি।

জিয়া আরিফকে যেভাবে বললেন, তাঁকে আগে কোথাও দেখেছেন, তা শুনে আরিফের মনে হলো, জিয়া একজন পাকা রাজনীতিবিদ। তা না হলে এটা মনে রাখার কথা নয় এবং মনে না থাকলে বলার কথা নয়।[১০২]

১৯৭৭ সালের নভেম্বরে জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা জামালউদ্দিন আহমদ চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে একটা সভা ডাকেন। আরিফ কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে সেখানে যান। ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন ফজলে করিম চৌধুরী। তিনি সব কাজে আরিফকে সাহায্য করতেন। জামালউদ্দিন তখন শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। তিনি আরিফকে বললেন, 'আমরা ফ্রেঞ্চ টাইপের একটা সরকার-ব্যবস্থার কথা ভাবছি।' তিনি আরিফকে একটা র‍্যালির আয়োজন করতে বলেন। আরিফ নভেম্বরেই চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে একটা ছাত্রসমাবেশ ডাকার পরিকল্পনা করেন। তিনি এ কাজে ড. নাজমুল আহসান মল্লিককে লাগালেন। মল্লিক একসময় জাসদ করতেন। র‍্যালির জন্য একটা সংগঠনের নাম ব্যবহার করার প্রয়োজন হলো। মল্লিক একটা গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র, পতাকা, ব্যানার ইত্যাদি তৈরির ব্যবস্থা করলেন। আরিফ মঈনুদ্দীনের ভাষ্য অনুযায়ী :

> র‍্যালির জন্য চিটাগাংয়ের সব জায়গা থেকে লোক আনতে হবে। খাওয়ার জন্য মেজবান আয়োজন করতে হবে। খাওয়ার জন্যই লাগবে বিশ হাজার টাকা। মল্লিক এক লাখ টাকার একটা এস্টিমেট দিল। আমি বঙ্গভবনে অলি সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। অলি বললেন, আমরা তো ন্যাশনালিস্ট পলিটিকস করব। নাম দ্যান, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। তিনি ডিজিএফআই চিফ ব্রিগেডিয়ার মহব্বত জান চৌধুরীকে এক লাখ টাকা দিতে বললেন। উনি টাকাটা ক্যাশ দিয়ে দিলেন। র‍্যালির আমন্ত্রণপত্রে জিয়া সাহেবের নাম দিতে চাইলাম। জিয়া সাহেব বললেন, 'আমি ইউনিফর্মে আছি, যেতে পারব না। সাত্তার সাহেবকে পাঠাব।'
>
> যথাসময়ে র‍্যালি হলো। জাস্টিস আবদুস সাত্তার এবং তথ্য উপদেষ্টা শামসুল হুদা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। প্রায় পাঁচ হাজার লোক জমায়েত হয়েছিল। আমি সভাপতিত্ব করলাম। সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিলাম। ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) আনোয়ারুল হক কাদেরিকে চিটাগাং শহরের ভার দিলাম। চট্টগ্রাম উত্তরের জন্য বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের ওসমান গনি, দক্ষিণের দায়িত্ব জাসদ-ছাত্রলীগের সিরাজুল ইসলাম এবং কক্সবাজারের দায়িত্ব নিল জাসদ-ছাত্রলীগের শাহজাহান চৌধুরী। কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব দিলাম জাসদ-ছাত্রলীগের তারেক আহমদ চৌধুরীকে।
>
> জাস্টিস সাত্তার আমাকে নিয়ে বঙ্গভবনে এলেন। জিয়া সাহেব বললেন এক মাসের ছুটি নিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অর্গানাইজেশন করেন।[১০৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব সংগঠনই ছিল জিয়ার সামরিক শাসনবিরোধী। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ভাসানী ন্যাপ-সমর্থিত জাতীয় ছাত্রফ্রন্ট। আরিফ মঈনুদ্দীন ঢাকায় এসে তাঁর ভাগনে শাহরিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

শাহরিয়ার তাঁকে পরামর্শ দিল, হেমায়েত উল্লাহ আওরঙ্গ যদি সাপোর্ট দেয়, তাহলে আপনি প্রটেকশন পাবেন। কীভাবে আওরঙ্গকে রাজি করানো যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে শাহরিয়ার বলল, 'আব্বুজি (শাহরিয়ারের বাবা) যদি বলে দেন, তাহলে আওরঙ্গ শুনবে। আওরঙ্গ তাঁকে পীরের মতো মানে।' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শাহরিয়ারের বাবা মেজর (অব.) মো. আফসারউদ্দিন একাত্তর সালে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন লে. জেনারেল নিয়াজির কোর্সমেট। আওরঙ্গ একাত্তর সালে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিল। মেজর আফসার তাকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন। এ জন্য তাঁর প্রতি আওরঙ্গ খুবই কৃতজ্ঞ ছিল। যাহোক, আওরঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো। আরিফের বর্ণনা অনুযায়ী :

> ভেবেছিলাম আওরঙ্গ দেখতে দৈত্যের মতো হবে। কিন্তু দেখলাম হ্যান্ডসাম ইয়াংম্যান, বেশ ভদ্র। আমাকে মামা বলে সম্বোধন করল। অলি বললেন, 'বঙ্গবন্ধু নেই। জিয়া দেশের জন্য কাজ করতে চায়। হোয়াই ডোন্ট ইউ হেল্প আস? রাজ্জাক-তোফায়েলের পেছনে পলিটিকস করে কী লাভ?' আওরঙ্গ বলল, 'আমার শর্ত আছে।' ভাবলাম, কত টাকা না চেয়ে বসে! আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'মামা, আমাদের কেসগুলো উইথড্র করাতে হবে।' অলি বললেন, 'যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে, তাহলে এই মুহূর্ত থেকে তোমাদের প্রবলেম সলভ্‌ড। নোবডি উইল টাচ ইউ।' আওরঙ্গ খুব ইমপ্রেসড হলো। বঙ্গভবনে ওই সময় ডেপুটি অ্যাডভাইজর, হোম, কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান, ডিজিএমএসআই হাকিম সাহেব, ডিজিএফআই চিফ মহব্বত জান চৌধুরী—এঁরা সবাই ছিলেন। আওরঙ্গ বলল, 'মামা, আপনাকে প্রত্যেক হলে নিয়ে যাব।' কর্নেল মুস্তাফিজ বললেন, 'তোমাদের নামের লিস্ট দাও, আমি ব্যবস্থা করছি।'
>
> আওরঙ্গের কথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিন যথাসময়ে সূর্য সেন হলের গেটের সামনে একটা পানের দোকানে তার কথা জিজ্ঞেস করতেই একজন এসে বলল, 'আমি মিলন, আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।' তার মুখে বসন্তের চিহ্ন, গলার কাছে কাটা দাগ। জেনেছিলাম, সে 'মুরগি মিলন' নামেই পরিচিত। সে আমাকে গাইড করে জহুরুল হক হলের একটা কামরায় নিয়ে গেল। ওখানে উপস্থিত কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হলো—হান্নান, লিয়াকত, সিরাজ, মানিক এবং মেডিকেলের খোকন। আওরঙ্গ এল মিনিট দশেক পর। সে আমাকে এসএম হলে নিয়ে গেল। তাকে দেখে প্রভোস্ট-ট্রভোস্ট সবাই দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ওরা আমাকে প্রত্যেক হলে নিয়ে গেল। ওরা কারফিউ পাস নিয়ে রাতে দেয়ালে চিকা লিখত—কথা নয় কাজ, এখন থেকে কথার রাজনীতি নয় কাজের রাজনীতি। রাতেই পুলিশ লেখাগুলো মুছে দিত। এটা শুনে অলি সাহেব বললেন, এখন থেকে পুলিশ আর মুছবে না।

> আওরঙ্গ বলল, একটা মিছিল করব। সে অনুযায়ী সূর্য সেন হল থেকে মধুর ক্যানটিনের দিকে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে সিভিল পোশাকে ডিজিএফআই-এর আর্মড লোক ছিল। 'নিপা' ভবনের পাশ দিয়ে আর্টস বিল্ডিংয়ের পেছনের গেটের কাছে আসতেই ব্রাশফায়ারের শব্দ। মিলন বলল, 'জাসদের গণবাহিনী, মান্নাও আছে ওখানে।' মিলনও গুলি ছুড়ছে। ওরা ম্যাচবক্সের ভেতর গুলি রাখত, পকেটেই থাকত। গুলির শব্দ শুনে আমি 'নিপা' ভবনের সীমানার দেয়াল টপকে ওপাশে যাওয়ার সময় এপাশে আমার সানগ্লাসটা পড়ে গেল। খোকনের গায়ে গুলি লেগেছিল। তাকে মেট্রোপলিটন ক্লিনিকে পাঠানো হলো। ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দেওয়া হলো—'সায়নে ডাই'। ছাত্রদের হল ভ্যাকেট করে চলে যেতে বলা হলো। দুদিন পরেই জাগদল হলো। আমরা জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ছাত্রদল, অর্থাৎ জাগ ছাত্রদল তৈরি করলাম। কর্নেল মুস্তাফিজের সঙ্গে আওরঙ্গদের যোগাযোগের জন্য মুস্তাফিজ সাহেবের একটা কোড নাম দেওয়া হলো—'বড় ভাই'।[১০৪]

এই ঘটনার একটা ভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন জাসদ-ছাত্রলীগের কর্মী এবং ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শাহীন রাজা। তাঁর ভাষ্য হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলি করার মতো অবস্থা তখন তাঁদের ছিল না। ছাত্রদলের প্রায় দেড় শ জনের একটা মিছিল যখন বের হয়, জাসদ-ছাত্রলীগ তখন খায়রুজ্জামান বাবুলের নেতৃত্বে একটা প্রতিবাদ মিছিল বের করে। ছাত্রলীগের মিছিল থেকে ছাত্রদলের মিছিলের ওপর ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। মিলন, লিয়াকত, হান্নানরা নির্মাণাধীন লেকচার থিয়েটার হলের পেছন থেকে গুলি চালায়। ছাত্রলীগের ১৩ জন কর্মী আহত হয়। এদের মধ্যে শফিকুর রহমান বাবুল এবং জুয়েলের গায়ে গুলি লাগে। আওরঙ্গ তখন মধুর ক্যানটিনে বসা ছিল। প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী ছাত্রলীগের এই গ্রুপটির সাহায্য নিয়ে জিয়াপন্থীরা ওই দিন মধুর ক্যানটিনের দখল নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মেজর কামরুল ইসলাম আওরঙ্গদের সব রকমের সহায়তা দেন। আওরঙ্গকে ঘনিষ্ঠজনেরা 'পানু' নামে ডাকত। কর্নেল মুস্তাফিজের স্ত্রীর সঙ্গে সে 'বোন' সম্পর্ক পাতিয়েছিল।[১০৫]

আওরঙ্গদের পথে প্রধান বাধা ছিল জাসদ-ছাত্রলীগ। জাসদ-ছাত্রলীগকে ঠেকানোর জন্যই ডিজিএফআই আওরঙ্গদের সব ধরনের সাহায্য দেয়। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। এর কিছুদিন পর হোটেল সাকুরার পেছনে এক গলিতে কথা-কাটাকাটির সময় আওরঙ্গ সেনাবাহিনীর এক হাবিলদারকে গুলি করে ভারতে পালিয়ে যান। ফিরে আসেন ১৯৮১ সালের মে মাসে।[১০৬]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর ছাত্রলীগ-যুবলীগের 'মাসলম্যান' হিসেবে এ কে হেমায়েত উল্লাহ আওরঙ্গের উত্থান হয়েছিল। ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগের টিকিটে এবং ২০০১ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তিনি শরীয়তপুরের একটি আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৭ সালে তিনি বিএনপিতে যোগ দেন এবং পরে এই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ২০০৮ সালে তিনি বিএনপির টিকিটে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে হেরে যান।

জাগদল

জিয়া একদিকে 'সমমনা' দলগুলোকে নিয়ে রাজনৈতিক জোট তৈরির কাজ করছেন, অন্যদিকে তিনি নিজস্ব একটা রাজনৈতিক দল তৈরির বিষয়টাও খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখলেন। তাঁর মনে হলো, জোটের মধ্যে শতভাগ অনুগত একটা দল না থাকলে জোটকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এই লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল' নামে নতুন একটা রাজনৈতিক দল তৈরির ঘোষণা দেন। তিনি নিজে থাকলেন নেপথ্যে। জিয়ার উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকজন সদস্য এই দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন। দলটির সংক্ষিপ্ত নাম হলো 'জাগদল'।

বেশ কিছুদিন ধরেই দল তৈরির চেষ্টা চলছিল। শুরুতে বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীকে সভাপতি ও মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে দল তৈরির পরিকল্পনা হয়েছিল। বিচারপতি সিদ্দিকীর সঙ্গে জিয়ার বেশ কয়েকবার বৈঠক হয়। তিনি জিয়াকে তেমন পাত্তা দেননি। মিজান চৌধুরীও রাজি হননি।[১০৭]

বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে আহ্বায়ক করে জাগদলের ১৯ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। জাগদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল মোমেন খান, শামসুল আলম চৌধুরী, ক্যাপ্টেন (অব.) নুরুল হক, এনায়েতউল্লাহ খান, মওদুদ আহমদ, জাকারিয়া চৌধুরী, ড. এম আর খান, সাইফুর রহমান, জামালউদ্দিন আহমদ, আবুল হাসনাত, এম এ হক, ক্যাপ্টেন (অব.) সুজাত আলী, আলহাজ এম এ সরকার ও আবুল কাশেম।[১০৮] জাগদল কেন তৈরি করা হলো, তার কারণ ব্যাখ্যা করে এর ঘোষণাপত্রে বলা হলো :

> জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে এমন একটি জাতীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে, যা কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও কর্মজীবী মানুষকে একতাবদ্ধ করে স্বাধীন জাতীয় বিকাশ নিশ্চিত করতে সক্ষম

হবে। বাংলাদেশের জাতীয় বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীকে একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করা সম্ভব নয়। আমাদের এই জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক পার্টির মাধ্যমেই কেবল জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় বিকাশ সম্ভব।[১০৯]

জাগদল রাজনীতিতে তেমন ঢেউ তুলতে পারেনি। জাগদলে যোগ দেওয়া রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টাদের অনেকেই ছিলেন অপরিচিত। রাজনীতির মাঠের চেনামুখগুলো জাগদলে খুব কমই যোগ দিয়েছিলেন।

জাগদল বেশ উৎসাহ নিয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে যোগ দেয়। ফ্রন্টে অন্যান্য দলকে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা-তদবির চলে। যাদু মিয়ার নেতৃত্বে ন্যাপ (ভাসানী) ফ্রন্টে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে ন্যাপ নেতা নূরুর রহমান ও আনোয়ার জাহিদ বেঁকে বসেন। যাদু মিয়া তাঁদের ছাড়াই দলের বড় অংশটিকে নিয়ে ফ্রন্টে যোগ দেন। নূরুর রহমান ও আনোয়ার জাহিদ ভাসানীপন্থী ন্যাপের একটা গ্রুপকে নিয়ে আলাদা থেকে যান।

মুসলিম লীগের শাহ আজিজুর রহমান অল্প কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রন্টে যোগ দেন। সবুর খানের মুসলিম লীগের বড় অংশটি আলাদা থেকে যায়। কাজী জাফর আহমদ তাঁর দল ইউপিপি নিয়ে ফ্রন্টে যোগ দিতে চাইলে তাঁর দল ভেঙে যায়। মাওলানা মতিনের বাংলাদেশ লেবার পার্টি এবং রসরাজ মণ্ডলের তফসিল জাতি ফেডারেশন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে যোগ দেয়। ফ্রন্টে যোগ দেওয়া দলগুলোর মধ্যে মশিউর রহমানের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ (ভাসানী) ছিল সবচেয়ে বড় দল। শাহ আজিজকে নেওয়া হয়েছিল শুধু 'মুসলিম লীগ' নামটাকে জড়ানোর জন্য। মশিউর রহমান উদ্যোগী হয়ে রসরাজ মণ্ডলকে ফ্রন্টে ভিড়িয়েছিলেন এটার একটা 'অসাম্প্রদায়িক' চেহারা দেওয়ার জন্য। শুধু সংখ্যা বাড়ানোর জন্যই লেবার পার্টিকে সঙ্গে রাখা হয়।[১১০]

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে যোগ দেওয়া নিয়ে ইউপিপি ভেঙে যায়। দলের অন্যতম নেতা হায়দার আকবর খান রনো এই ভাঙন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেন :

ইউপিপির অধিকাংশই তখন কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে সরকারে যাওয়ার পক্ষে ছিল। এর আগে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আমাদের কয়েক দফা দেখা হয়েছে। অধিকাংশ সময় কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেনন কথাবার্তা বলেছেন। আমি মাত্র দুবার এরকম বৈঠকে ছিলাম।...সে সময় জিয়াউর রহমানের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক লোকদের সঙ্গে যিনি যোগাযোগ রাখতেন, তিনি হচ্ছেন মেজর জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু। তাঁকে আমি স্কুলজীবন থেকে চিনতাম।...জেনারেল নুরুল ইসলাম তাঁর পরিচিত ও পছন্দের অনেককেই মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধক্রমে মেনন একবার জিয়াউর রহমানের ভাষণ লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাষণটি যখন রেডিও-টিভিতে

শুনলাম, তখন দেখি মেননের লেখার একটি বর্ণও সেখানে নেই।...

১৯৭৮ সালের কোনো একদিন। তারিখটা মনে নেই। পুরানা পল্টনে ইউপিপির অফিসে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক চলছে। আলোচনার বিষয়বস্তু জিয়াউর রহমান প্রস্তাবিত ফ্রন্ট।...এরই মধ্যে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী ও কাজী জাফর আহমদ উঠে গেলেন। কথা ছিল ফিরে এসে রিপোর্ট করবেন আলোচনার বিষয়বস্তু। আমাদের সভা কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দেওয়া হলো। আমরা বসে আছি অপেক্ষায়। কখন তাঁরা ফিরে আসবেন। কিন্তু কাজী জাফর আহমদ আর ফিরলেন না। কিছু পরে রেডিওতে শুনলাম তাঁরা জিয়াউর রহমানের ফ্রন্টে যোগদান করেছেন। পরে কাজী জাফর ও ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

রেডিওর এই সংবাদের প্রতিবাদে ইউপিপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চারজনের একটি বিবৃতি পত্রিকা অফিসে পাঠানো হলো। রাশেদ খান মেনন, নজরুল ইসলাম, হায়দার আনোয়ার খান জুনো ও আমার বিবৃতি।...এ সময় মেননকে নিয়ে বেশ টানাটানি শুরু হয়। কাজী জাফর আহমদ স্বয়ং চলে এলেন মেননের বাসায়। মেননের পরিবারের পক্ষ থেকেও প্রবল চাপ ছিল যাতে মেনন এমন সুযোগ হাতছাড়া না করেন। মেনন অবশ্য পারিবারিক চাপকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।....ভেঙে গেল ইউপিপি।...সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে আমরা গঠন করলাম 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন' নামে একটি মঞ্চ।[১১১]

জিয়া নিজেই নিজেকে ১৯৭৮ সালের ২৮ এপ্রিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিলেন। যদিও এ-সংক্রান্ত গেজেটটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় এক বছর পর, ১৯৭৯ সালের ১৯ এপ্রিল। ১ মে (১৯৭৮) জিয়াউর রহমানকে চেয়ারম্যান করে আনুষ্ঠানিকভাবে 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' ঘোষণা করা হলো। জিয়া যদিও সেনাবাহিনীর প্রধান, তিনি পুরোদস্তুর রাজনীতিবিদ বনে গেলেন। একসময় তিনি বলেছিলেন, 'আই উইল মেক পলিটিকস ডিফিকাল্ট।' নানান বিধিনিষেধের বেড়াজালে অনেকের জন্যই রাজনীতি কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু জিয়া রাজনীতিতে তাঁর উত্তরণ ঘটান খুব সহজেই। রাজনীতিবিদ হতে হলে মাঠে-ঘাটে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়। হাতের তর্জনী তুলে গর্জন করতে হয়। জিয়া এ বিষয়ে একেবারেই নবিশ। অথচ রাজনীতিতে পারঙ্গম হতে হলে জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। না চাইলেও দেখাতে হবে যে তিনি মানুষের কত কাছের, কত আপনজন। রাজনীতিবিদ হিসেবে জিয়ার উত্তরণের এই প্রক্রিয়া ফুটে উঠেছে মোখলেসুর রহমান সিধু ভাইয়ের সঙ্গে যাদু মিয়ার আলাপচারিতায় :

জিয়া বাংলা লিখতে-পড়তে জানতেন না। প্রথম দিকে তিনি বাংলায় যে বক্তৃতা দিতেন, সেগুলো উর্দুতে লিখতেন। লিখে তারপর তা-ই দেখে ভাষণ

THURSDAY, APRIL 19, 1979

PART III

Notifications issued by the Ministry of Defence other than those included in Part I

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

Dacca, the 9th April 1979.

No. 7/8/D-1/75/270.—BA-69 Major General Ziaur Rahman, BU, psc is promoted to the rank of Temporary Lieutenant General with effect from 28th April 1978.

2. This cancels this Ministry's Notification No. 7/8/D-1/75/160, dated 28th February 1979.

No. 7/8/D-1/75/271.—BA-69 Temporary Lieutenant General Ziaur Rahman, BU, psc is retired from the service of the Bangladesh Army with effect from 29th April 1978.

By order of the President
A. H. F. K. SADIQUE
Defence Secretary.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

লে. জেনারেল হিসেবে জিয়াউর রহমানের পদোন্নতি ও অবসরে যাওয়ার গেজেট বিজ্ঞপ্তি

দিতেন।...ভালো করে বক্তৃতা দিতে পারতেন না। দিতে গেলে খালি হাত-পা ছুড়তেন। এসব দেখেটেখে যাদু একদিন আমাকে বলল যে, 'এরকম হলে কী করে তাঁকে আমি চালিয়ে নেব?'

আমি বললাম, 'দেখো, জিয়া বক্তব্য দিতে পারেন না ঠিক আছে। তিনি সবচেয়ে ভালোভাবে কী করতে পারেন, সেটা খুঁজে বের করো।'

জবাবে যাদু বললেন, 'হাঁটতে পারেন একনাগাড়ে ২০ থেকে ৩০ মাইল পর্যন্ত।'

আমি বললাম, এই তো পাওয়া গেল সবচেয়ে ভালো একটা উপায়, তুমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পাড়াগাঁয়ে হাঁটাও। হাঁটাও আর যেটা পারে তাঁকে দিয়ে সেটাই করাও। গাঁও-গেরামের রাস্তা দিয়ে যাবে আর মানুষজনকে জিজ্ঞেস করবে, 'কেমন আছেন।'

প্রেসিডেন্ট দেশের মিলিটারি লিডার, তিনি গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, কানাকানচি দিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন আর লোকজনের ভালোমন্দের খোঁজখবর করছেন, তাতেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।

এভাবে দেখতে দেখতে তিনি বক্তব্য দেওয়াটাও রপ্ত করে ফেললেন। কিন্তু এ তো ঘটনার এক দিক। অন্য দিকটা হলো, যেখানে কোনো দিন যাননি ইউনিয়ন বোর্ডের একজন চেয়ারম্যানও, সেখানে খোদ দেশের প্রেসিডেন্ট যাচ্ছেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্য আরও অনেকেই যাচ্ছেন। সেটা একটা বিশাল ব্যাপার। এসব দেখেটেখে গ্রামের লোকজন ভাবল, জিয়াউর রহমান এমন লোক, যিনি আমাদের খোঁজখবর রাখেন।[১১২]

জিয়াউর রহমান ১৭ এপ্রিল (১৯৭৮) দ্বিতীয় সামরিক ফরমানের দ্বাদশ সংশোধনী জারি করেন। এই আদেশের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল, রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল করা এবং প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেওয়ার ঘোষণা। সংশোধনীতে আরও বলা হলো, সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বাতিল করা হবে, প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ প্রথমে গণপরিষদ ও পরে পার্লামেন্ট হিসেবে কাজ করবে, আগামী ৩ জুনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ দুই বছর।[১১৩]

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

২৮ এপ্রিল (১৯৭৮) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণা করা হলো। ২ মে জিয়াসহ ১১ জন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেন। একজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। নির্বাচনী দৌড়ে টিকে থাকেন ১০ জন।[১১৪] তাঁদের অনেকেই ছিলেন 'ডামি ক্যান্ডিডেট', যাঁদের নির্বাচিত হওয়ার

সামান্যতম সম্ভাবনা ছিল না। নির্বাচন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে, এটা দেখানোর জন্যই অনেককে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। জিয়া ছাড়া একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রার্থী ছিলেন জেনারেল (অব.) ওসমানী। ২ মে (১৯৭৮) তড়িঘড়ি করে আওয়ামী লীগ, সিপিবি, জাতীয় জনতা পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর), গণ-আজাদী লীগ ও পিপলস লীগ—এই ছয়টি দল মিলে তৈরি করে 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট'। ওসমানী এই ঐক্যজোটের প্রার্থী হন।[১১৫]

৬ মে (১৯৭৮) ঢাকায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে ছয়টি রাজনৈতিক দল একসঙ্গে মিলে তৈরি করে 'জাতীয় যুক্তফ্রন্ট'। ছয় দলের পক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগের (আইডিএল) মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, বেআইনি-ঘোষিত ডেমোক্রেটিক লীগের পীর মোহসেন উদ্দীন, জাতীয় দলের আমেনা বেগম, কৃষক-শ্রমিক পার্টির এ এস এম সোলায়মান ও পাকিস্তান আমলের কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা শামসুল হুদা একটি যৌথ বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।[১১৬]

৭ মে (১৯৭৮) জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের আদর্শ ও কর্মসূচির একটা রূপরেখা ঘোষণা করেন। ঘোষণায় বলা হয়, 'জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত পার্লামেন্ট হবে সার্বভৌম।...ভবিষ্যৎ সরকার-পদ্ধতি নির্ধারণ ও পরবর্তী মেয়াদ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদ্ধতিও এই পার্লামেন্ট নির্ধারণ করতে পারবে।'[১১৭]

ইতিমধ্যে মূলধারার জাসদ রাজনৈতিক দলবিধি অনুযায়ী সরকারি অনুমোদন পেয়ে যায়। ১১ মে (১৯৭৮) জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ও গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের সমালোচনা করে 'এই দুই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার স্বার্থে একটি শক্তিশালী ও যথার্থ গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট নিশ্চিত করা'র দাবি জানান। তিনি আরও বলেন, জাসদ এই নির্বাচনে অংশ নেবে না।[১১৮]

১৩ মে (১৯৭৮) প্রকাশিত হয় গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের ঘোষণাপত্র। ঘোষণাপত্রে বলা হয়, '১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে যেরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, অনুরূপভাবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এমন একটি সার্বভৌম সংসদের নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি সরকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যাহার নিকট সরকার সরাসরি দায়ী থাকিবে এবং রাষ্ট্রপতি দেশের কার্যনির্বাহী প্রধান না হইয়া শুধুমাত্র সাংবিধানিক প্রধান হইবেন।' ঘোষণাপত্রে সব রাজবন্দীর মুক্তি, সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আপিল করার অধিকার এবং বঙ্গবন্ধু ও জেলে নেতৃবৃন্দের হত্যার তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করা হয়।[১১৯]

শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের ফার্স্ট সেক্রেটারি সিদ্দিকুর রহমান ১৫ মে এক সংবাদ সম্মেলনে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে 'অর্থহীন ও ক্ষমতায় টিকে থাকার একটা ন্যক্কারজনক নিম্ন শ্রেণির রাজনৈতিক চাতুরীর খেলা' বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, 'আওয়ামী বাকশালীদের একদলীয় শাসন ও প্রেসিডেন্ট জিয়ার গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো তফাত নেই।'[১২০]

আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন জাতীয় যুক্তফ্রন্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনো প্রার্থী দেয়নি। তাঁদের কথাবার্তায় অবশ্য মনে হয় প্রকারান্তরে তাঁরা জিয়াকেই সমর্থন দিচ্ছেন। ফ্রন্টের নেতারা ২৭ মে এক যৌথ বিবৃতিতেও এই আভাস দেন। বিবৃতিতে বলা হয়:

> আওয়ামী বাকশালী আমলের ধ্বংস ত্রাসের রাজত্ব এবং সেই সময়ের দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা জনসাধারণ ভুলিতে পারে নাই।...
>
> নির্বাচনে যিনিই জয়যুক্ত হোন না কেন, বর্তমানে সত্যিকারের গণতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবে আমরা নিশ্চিত যে, জনগণ সঠিক ব্যক্তিকেই ভোটদান করিবেন। জনসাধারণ অন্তত দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক থাকিবেন।[১২১]

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ৩১ মে (১৯৭৮) ইশতেহার প্রকাশ করে। ইশতেহারে 'আওয়ামী-বাকশালীদের জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা, সীমাহীন দুর্নীতি, হত্যা, লুণ্ঠন ও হাজারো অন্যায়-অবিচারের' উল্লেখ করে বলা হয়, 'গণতন্ত্র হত্যাকারী ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিসর্জনকারী বাকশালীরা' '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের ফলে' ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়ে যায়। 'এই নির্বাচনে আওয়ামী-বাকশালীদের রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী জিয়াউর রহমানকে জয়ী করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।[১২২]

কয়েকটি বামপন্থী দল—বিশেষ করে মূলধারার জাসদ ও সাম্যবাদী দল—জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ও গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটকে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলে পরোক্ষভাবে জিয়াকেই সমর্থন দেয়।[১২৩] ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের পর জাসদ প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অনেক নেতা-কর্মী তখন জেলে। জাসদ ওই সময় জিয়ার সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসে। সমঝোতার শর্ত হিসেবে নির্বাচনে জাসদ 'নিরপেক্ষ' থাকে। বিনিময়ে জাসদের নেতা-কর্মীরা এক-এক করে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে থাকেন।

গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটে আওয়ামী লীগের প্রাধান্য ছিল। নির্বাচনী প্রচারে ১৯৭২-৭৫-এর আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা এবং শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণের রেকর্ড বাজানোর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ওসমানীর

কাঁধে সওয়ার হয়ে নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা চালায়। মূলত দলকে পুনর্গঠিত করে তোলাই ছিল আওয়ামী লীগের প্রধান লক্ষ্য। ওসমানী আওয়ামী লীগের সাধারণ নেতা-কর্মীদের মধ্যে তেমন গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়ে দাঁড়ায় শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতা। ওসমানী ছিলেন উপলক্ষমাত্র।

৩ জুন (১৯৭৮) অনুষ্ঠিত হলো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। জিয়াউর রহমান ১ কোটি ৫৭ লাখ ৩৩ হাজার ৮০৭টি ভোট (শতকরা ৭৬ দশমিক ৩৩ ভাগ) পেয়ে জয়ী হলেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ওসমানী পেলেন ৪৪ লাখ ৫৫ হাজার ২০০টি ভোট (২১ দশমিক ৭০ ভাগ)। বাকি আটজন প্রার্থী মিলে শতকরা মাত্র ১ দশমিক ৬৭ ভাগ ভোট পেলেন। তাঁরা হলেন আজিজুল ইসলাম, আবুল বাশার, অধ্যক্ষ এ হামিদ, হেকিম মাওলানা খবিরউদ্দিন, মোহাম্মদ আবদুস সামাদ, মোহাম্মদ গোলাম মোরশেদ, শেখ মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক ও সৈয়দ সিরাজুল হুদা। আবুল বাশার ও সিরাজুল হুদা রাজনীতি করতেন। বাকিরা সবাই অখ্যাত। আটজনের কেউই এক লাখ ভোটও পাননি। তাঁদের সবার জামানত বাজেয়াপ্ত হলো। নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল শতকরা ৫৩ দশমিক ৪৪ ভাগ।[১২৪]

জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়নের (জাগমুই) প্রার্থী আবুল বাশার ও বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রার্থী সৈয়দ সিরাজুল হুদা ভোট পেয়েছিলেন যথাক্রমে ৫১ হাজার ৯৩৬ ও ৩৫ হাজার ৬১৮। তাঁরা দুজনই সংবাদ সম্মেলন ডেকে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করেন। সিরাজুল হুদা পুনরায় ভোট গণনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানান। জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়নের নেতা আবুল বাশার অভিযোগ করেন, 'নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দুই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ভারত-রাশিয়া চক্রের আওয়ামী-বাকশালীদের "গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট" এবং ভারত-মার্কিন চক্রের তাঁবেদার "জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের" বিরুদ্ধে ও জনগণের জাতীয় গণতান্ত্রিক স্বার্থের পক্ষে "জাগমুই" সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি হাজির করায় এই চক্রান্তকারীরা আমাদের বিরুদ্ধে অসাধু পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।'[১২৫]

ঢাকার মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ৬ জুন এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনে অনিয়ম ও অসদুপায় অবম্বলনের অভিযোগ করে ওসমানী বলেন, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেনি। সাংবাদিকদের কাছে তিনি ১৩টি অভিযোগ লিখিতভাবে তুলে ধরেন। তাঁর প্রথম অভিযোগটি বেশ গুরুতর—'পোলিং অফিসারদের সই ও সিল মারার জন্য কমপক্ষে এক দিন আগে ব্যালট পেপার দেওয়া হয়েছে, ফলে জাল ভোট দেওয়ার কাজ সহজ হয়েছে'।[১২৬]

১৫-১৬ জুন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর্যালোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়:

> গত ৩ জুনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে একটি রাজনৈতিক ধোঁকা, প্রতারণা ও প্রহসন জানা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে...কতিপয় শর্তসাপেক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।...যেভাবে ও যে পন্থায় সরকারি ফ্রন্ট এই নির্বাচন পরিচালনা করেছে, তা এ দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে নজিরবিহীন। সরকারি হিসাবে প্রাপ্ত শতকরা ৫৪ ভাগ ভোটারের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিতির ঘোষণা নিতান্তই অবিশ্বাস্য ও সত্যের অপলাপ।[১২৭]

১২ জুন (১৯৭৮) জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। ২৯ জুন তিনি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ওই দিন ২৮ জন মন্ত্রী ও দুজন প্রতিমন্ত্রী শপথ নেন।[১২৮] জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের শরিকদের মধ্য থেকে অনেককেই মন্ত্রী বানানো হয়। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন জাগদলের, তিনজন ভাসানী-ন্যাপের, দুজন ইউপিপির, দুজন মুসলিম লীগের ও একজন তফসিলী ফেডারেশনের। এ ছাড়া সাতজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী নেওয়া হয়। শরিকদের মধ্যে একমাত্র লেবার পার্টির কাউকেই মন্ত্রী বানানো হয়নি। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন মশিউর রহমান যাদু মিয়া, আবদুল আলীম, হাবিবুল্লাহ খান, রসরাজ মণ্ডল, আবদুর রহমান, মির্জা গোলাম হাফিজ, কে এম ওবায়দুর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, আবদুল হালিম চৌধুরী, এস এ বারী এ টি, এ এস এম মুস্তাফিজুর রহমান, ড. আমিনা রহমান ও কাজী জাফর আহমেদ।[১২৯] কাউকে প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়নি। যাদু মিয়াকে 'সিনিয়র মিনিস্টার' নিয়োগ করা হয়।

ছাত্রদল ও যুবদলের জন্ম

১৯৭৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আহমেদ মীর্জা খবিরকে আহ্বায়ক করে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ছাত্রদলের (জাগ ছাত্রদল) ১০১ সদস্যের কমিটি তৈরি করা হয়। যুগ্ম আহ্বায়ক হন মিয়া শহীদ হোসেন, গিয়াসুদ্দিন কাদের চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, এনামুর রশীদ চৌধুরী ও আবদুর রাজ্জাক। বিএনপি তৈরি হওয়ার পর জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ছাত্রদলের নাম বদলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল রাখা হয়। ১ জানুয়ারি (১৯৭৯) কাজী আসাদ ছাত্রদলের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমানের লোক।[১৩০]

ছাত্রদলের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল ছিল। ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি এনামুল করিম শাহিদকে সভাপতি এবং গোলাম হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে

ছাত্রদলের একটা 'সমঝোতার' কমিটি হয়। এই দলে ভাসানী ন্যাপপন্থী জাতীয় ছাত্রদল একীভূত হয়। এনামুল করিম এসেছিলেন জাতীয় ছাত্রদল থেকে। গোলাম হোসেন আওয়ামী-সমর্থিত ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিন মাসের মধ্যে সম্মেলন করতে না পারায় জিয়াউর রহমান এই কমিটি ভেঙে দেন এবং গোলাম সরোয়ার মিলনকে আহ্বায়ক করে ২১ সদস্যের একটা কমিটি তৈরি করে দেন। মিলনও এসেছিলেন জাতীয় ছাত্রদল থেকে। কথা ছিল, তাঁরা ছয় মাসের মধ্যে একটা সম্মেলন করবেন। সেটা তাঁরা পারেননি। শেষমেশ ১৯৮১ সালের ৩০ মে ছাত্রদলের সম্মেলনের তারিখ ঠিক করা হয়। ওই দিন চট্টগ্রামে জিয়া নিহত হওয়ায় সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়। পরে ৬ ডিসেম্বর (১৯৮১) পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনে গোলাম সরোয়ার মিলনকে সভাপতি এবং আবুল কাসেম চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রদলের নতুন কমিটি তৈরি হয়।[১৩১]

ছাত্রদল তৈরি হওয়ার পর থেকেই এর সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের তোপের মুখে পড়ে। জাসদ-ছাত্রলীগ ছিল তখন সবচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী ছাত্রসংগঠন। ওই সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মো. ওবায়দুল হক ভূঁইয়া বলেন :

> আমরা মিছিল বের করলেই জাসদ-ছাত্রলীগের ছেলেরা হামলা করত, গায়ে গরম পানি ঢেলে দিত। বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক মহল থেকে বলা হলো, ওরা যখন হলের রুমে থাকবে না, তখন তাদের ঘরে ঢুকে সব তছনছ করে দিয়ো। আমরাও তা-ই করতে শুরু করলাম। রুমে রুমে ঢুকে দরজা-জানালা সব ভেঙে দিয়ে আসতাম। এর পর থেকেই অনেকে হুড়মুড় করে আমাদের দলে ভিড়তে লাগল। আমাদের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল, সিনিয়র ছাত্রনেতাদের সঙ্গে যেন আমরা খারাপ ব্যবহার না করি, তিনি যে দলেরই হোন না কেন। মেজর কামরুলের সঙ্গে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ থাকত। তবে সবকিছু সমন্বয় করতেন কর্নেল মুস্তাফিজ। আড়াই বছরের মাথায় আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় দল হয়ে গেলাম। ১৯৮১ সালের ডাকসু নির্বাচনে জগন্নাথ হল ও ইকবাল হল ছাড়া অন্য সব হলে আমরা একচেটিয়া বিজয় পেয়েছিলাম। এর আগে ১৯৮০ সালের ডাকসু নির্বাচনে আমরা পাঁচটা হলে জিতেছিলাম।[১৩২]

জাগদল প্রতিষ্ঠার পরপরই জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক যুবদল (জাগ যুবদল) তৈরি করা হয়। জাগ যুবদলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ছিলেন আবুল কাসেম এবং ঢাকা নগরের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন সাইফুর রহমান। সাইফুর একসময় জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের ঢাকা নগর শাখার সভাপতি ছিলেন। সেপ্টেম্বরে (১৯৭৮) বিএনপি তৈরি হলে আবুল কাসেমকে সভাপতি ও সাইফুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়।

যুবদলের ঢাকা নগর শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন যথাক্রমে মির্জা আব্বাস ও কামরুজ্জামান আয়াত আলী।[১৩৩]

বিএনপির জন্ম

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গ্রুপের একটা প্ল্যাটফর্ম। তাঁদের একতার একটাই ভিত্তি ছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এককাট্টা। ফ্রন্টভুক্ত দলগুলোর মধ্যে আগেও নানাবিধ কারণে কোন্দল ছিল। ফ্রন্ট তৈরি হওয়ার পরেও দলাদলি, কোন্দল অব্যাহত থাকে। নানান মত ও পথের এই ফ্রন্ট নিয়ে জিয়া স্বস্তিতে ছিলেন না। তিনি 'একমনা' লোকদের নিয়ে আলাদা দল তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন।

দল তৈরির জন্য যাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছিল, তাঁদের অন্যতম ছিলেন তানভীর আহমদ সিদ্দিকী। তিনি দলের নাম 'জাস্টিস পার্টি' রাখার প্রস্তাব করেন। নামটি কিছুটা পানসে মনে হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। দলের নামের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী থাকাটা জরুরি ছিল। শেষমেশ স্থির হয়, দলের নাম হবে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল'।[১৩৪] জিয়াউর রহমান নিজেই দলের নামকরণ করেছিলেন।[১৩৫]

২৮ আগস্ট ১৯৭৮ বিচারপতি সাত্তার ফ্রন্টের অন্যতম শরিক 'জাগদল' বিলুপ্তির ঘোষণা দেন। ৩০ আগস্ট 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)' নামে আইন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের আবেদন জানিয়ে ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়। আবেদনপত্রে জিয়া সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনামন্ত্রী অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বড় মগবাজারের বাসার ঠিকানা ব্যবহার করা হয়। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নামে একটি সংবাদ সম্মেলনের জন্য আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়।[১৩৬] ৩১ আগস্ট বিএনপি সরকারি অনুমোদন পায়।[১৩৭] ১ সেপ্টেম্বর ঢাকার রমনা রেস্তোরাঁ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে জিয়াউর রহমান বিএনপির প্রধান হিসেবে দলের নাম, গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। 'জাগদল' তাঁরই উৎসাহে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও আরেকটি নতুন দল গঠনের কী প্রয়োজন, সংবাদ সম্মেলনে এই প্রশ্নের জবাবে জিয়া বলেন, '৩রা জুনের নির্বাচনের পরেই সবাই আমরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করে ভেবেছি এটাই শ্রেয়। দ্রুতগতিতে জাতীয় ঐক্য আরো সুসংগঠিত করা ও জাতীয় কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে হলে নতুন ও ব্রড-বেজ্‌ড জাতীয় দল গঠন করাই উত্তম।'[১৩৮]

বিএনপির গঠনতন্ত্র তৈরির প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন নয়জন। এঁরা হলেন জিয়াউর রহমান, বিচারপতি সাত্তার, নাজমুল হুদা, হাবিবুল্লাহ খান, আবদুল মোমেন খান, জামালউদ্দিন আহমদ, মওদুদ আহমদ, আবুল হাসনাত এবং ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী। বঙ্গভবনে একাধারে ২১ দিন কাজ করে গঠনতন্ত্র তৈরি করা হয়। কাজ শুরু হতো রাত আটটায়। কাজ করতে করতে ভোর হয়ে যেত।[১৩৯]

১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জিয়াউর রহমানকে আহ্বায়ক করে বিএনপির ৭৬ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন: ১. বিচারপতি আবদুস সাত্তার, ২. মশিউর রহমান যাদু মিয়া, ৩. মোহাম্মদ উল্লাহ, ৪. শাহ আজিজুর রহমান, ৫. ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরী, ৬. রসরাজ মণ্ডল, ৭. আবদুল মোমেন খান, ৮. জামালউদ্দিন, ৯. ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ১০. মির্জা গোলাম হাফিজ, ১১. ক্যাপ্টেন (অব.) নূরুল হক, ১২. মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, ১৩. কে এম ওবায়দুর রহমান, ১৪. মওদুদ আহমদ, ১৫. শামসুল হুদা চৌধুরী, ১৬, এনায়েতুল্লাহ খান, ১৭. এস এ বারী এ টি, ১৮. ড. আমিনা রহমান, ১৯. আবদুর রহমান, ২০. ডা. এম এ মতিন, ২১. আবদুল আলীম, ২২, ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত, ২৩. আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, ২৪. নূর মোহাম্মদ খান, ২৫. আবদুল করিম, ২৬. শামসুল বারী, ২৭. মজিবুর রহমান, ২৮. ডা. ফরিদুল হুদা, ২৯. শেখ আলী আশরাফ, ৩০. আবদুর রহমান বিশ্বাস, ৩১. ব্যারিস্টার আবদুল হক, ৩২. ইমরান আলী সরকার, ৩৩. দেওয়ান সিরাজুল হক, ৩৪. এমদাদুর রহমান, ৩৫. অ্যাডভোকেট আফসার উদ্দিন, ৩৬. কবির চৌধুরী, ৩৭. এম আর খান, ৩৮. ক্যাপ্টেন (অব.) সুজাত আলী, ৩৯. তুষার কান্তি বাড়ৈ, ৪০. সুনীল গুপ্ত, ৪১. রেজাউল বারী ডিনা, ৪২. আনিসুর রহমান, ৪৩. আবুল কাসেম, ৪৪. মনসুর আলী সরকার, ৪৫. আবদুল হামিদ চৌধুরী, ৪৬. মনসুর আলী, ৪৭. শামসুল হক, ৪৮. খন্দকার আবদুল হামিদ, ৪৯. জুলমত আলী খান, ৫০. নাজমুল হুদা, ৫১. মাহবুব আহমেদ, ৫২. আবু সাঈদ খান, ৫৩. মোহাম্মদ ইসমাইল, ৫৪. সিরাজুল হক মন্টু, ৫৫. শাহ বদরুল হক, ৫৬. আবদুর রউফ, ৫৭. মোরাদুজ্জামান, ৫৮. জহির উদ্দিন খান, ৫৯. সুলতান আহমেদ চৌধুরী, ৬০. শামসুল হুদা, ৬১. সালেহ আহমেদ চৌধুরী, ৬২. আফসার আহমেদ চৌধুরী, ৬৩. তরিকুল ইসলাম, ৬৪. আনোয়ারুল হক চৌধুরী, ৬৫. মইন উদ্দিন খান, ৬৬. এম এ সাত্তার, ৬৭. হাজী জালাল, ৬৮. আহমেদ আলী মণ্ডল, ৬৯. শাহেদ আলী, ৭০. আবদুল ওয়াদুদ, ৭১. শাহ আবদুল হালিম, ৭২. জমিরউদ্দিন সরকার, ৭৩. আতাউদ্দিন খান, ৭৪. আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী, ৭৫. আহমেদ আলী।[১৪০]

২৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এক জনসমাবেশে জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'জনতার ইচ্ছাতেই জাতীয়তাবাদী দল গঠন করা হয়েছে। অতএব, এ মুহূর্তে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের কোনো প্রয়োজন নেই।'[১৪১]

বিএনপি তৈরি হওয়াতে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের আর তেমন কার্যকারিতা ছিল না। শরিকেরা প্রায় সবাই নতুন এই দলে একীভূত হলেন। ব্যতিক্রম ছিল ইউপিপির কাজী জাফর আহমদের গ্রুপ এবং লেবার পার্টির মাওলানা মতিন। মতিনকে মন্ত্রিপরিষদে না নেওয়ায় এমনিতেই তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। নতুন দলে তাঁর কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না। এক বিবৃতিতে তিনি ফ্রন্টের বিলুপ্তিকে 'ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার অশুভ খেলা' বলে মন্তব্য করেন।[১৪২]

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিলুপ্ত হওয়ায় সবচেয়ে হতাশ হলেন কাজী জাফর আহমদ। ২৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে ইউপিপি নেতারা বলেন, 'ফ্রন্ট বিলুপ্ত করায় জনগণের মধ্যে হতাশা ও আস্থাহীনতার সৃষ্টি হইল।'[১৪৩]

১১ অক্টোবর (১৯৭৮) কাজী জাফর সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ফ্রন্টে যোগ দেওয়া ও পরে সরকার থেকে পদত্যাগ করায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন তিনি। তাঁর 'আম-ছালা' দুটোই গেল। ফ্রন্টে যোগ দেওয়ায় ইউপিপি একবার ভাঙনের মুখে পড়ে। সে সময় রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো প্রমুখ নেতা কাজী জাফরকে ছেড়ে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন' নামে আলাদা দল করেছিলেন। দ্বিতীয়বার কাজী জাফরের ইউপিপি আবার ভাঙল। তাঁর সহকর্মী লে. কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন, ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী প্রমুখ বিএনপির সঙ্গে থেকে গেলেন।

বিএনপি এমন একটি দল, যার জন্ম স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয়নি। এই অঞ্চলে সব দলের জন্ম হয়েছে ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে, রাজপথে কিংবা আলোচনার টেবিলে। বিএনপি সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। দলটি তৈরি হলো ক্ষমতার শীর্ষে থাকা একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা, যিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি রাজনীতি করবেন।

ভিত্তি

বিএনপির দর্শন

একটি রাজনৈতিক দলের পরিচয় সাধারণত পাওয়া যায় তার ঘোষণাপত্র বা ম্যানিফেস্টোর মধ্যে। এই ঘোষণাপত্র সচরাচর কেউ পড়েন না। এমনকি দলের অনেক নেতা-কর্মীও এটা পড়েন না বা পড়ার প্রয়োজন দেখেন না। দলের প্রধান নেতার প্রতি আনুগত্য ও তাঁর গুণকীর্তনেই দলে টিকে থাকা ও ওপরে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা হয়।

একটা দল সম্পর্কে জনমনে আবছা ধারণা তৈরি হয় দলের স্লোগান শুনে ও নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি শুনে কিংবা পড়ে। এ দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্লোগান ছিল 'জয় বাংলা'। এই স্লোগানটি বাঙালি জাতীয়তাবোধের স্মারকে পরিণত হয়েছিল।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর রাষ্ট্রীয় সব অনুষ্ঠান ও গণমাধ্যম থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগানটি বাদ দেওয়া হয়। নতুন শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অনুগামী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তখন থেকে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলা শুরু করে। 'জয় বাংলা' এ দেশের সাধারণ মানুষের স্লোগান ছিল। আওয়ামী লীগ এই স্লোগানটি রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করলেও এই স্লোগানের আড়ালে তাদের অনেক নেতা-কর্মী প্রশ্নবিদ্ধ কাজ করে বেড়িয়েছেন। 'জয় বাংলা' স্লোগানটি আওয়ামী লীগের সমার্থক হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ-বিরোধীরা আওয়ামী লীগকে ভারত-তোষণের দায়ে অভিযুক্ত করত। কেননা, এই স্লোগানদানকারীকে অনেকেই 'ভারতের দালাল' বলে মনে করতেন।

'জিন্দাবাদ' একটা নিরীহ স্লোগান। এ দেশে ডান-বাম সব দলের মানুষই একসময় 'জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়েছেন। বামপন্থীরা একসময় 'জয় বাংলা' স্লোগানের মধ্যে সংগত কারণেই উগ্র স্বাদেশিকতার গন্ধ পেতেন এবং সে জন্য আদর্শগত কারণে এই স্লোগানটি দিতেন না। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর পরিস্থিতি অন্য রকম হলো। জিন্দাবাদ হয়ে দাঁড়াল 'মুসলিম আইডেন্টিটি' এবং

ভারতবিরোধী জোশের প্রতীক। 'জিন্দাবাদ' আর নিরীহ থাকল না। জিয়াউর রহমান প্রথম থেকেই 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' স্লোগানটি দিয়ে তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি শেষ করতেন। এই স্লোগানটি বিএনপির অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো।

এ সময় আরেকটি বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বাংলাদেশের নাগরিকদের জাতীয়তা 'বাঙালি' না 'বাংলাদেশি'—এ নিয়ে সমাজটা দুই ভাগ হয়ে যায়। বাহাত্তরের সংবিধানে বলা হয়েছিল, এ দেশের মানুষের জাতিগত পরিচয় হলো 'বাঙালি'। জিয়া একটা সামরিক ফরমানের মাধ্যমে 'বাঙালি'র বদলে 'বাংলাদেশি' করলেন। এর ফলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে ঝগড়ার আরও একটা জমি তৈরি হলো।

একাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলো। অনেকেই বলাবলি শুরু করলেন, পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হওয়ায় দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশ এই অঞ্চলের সব বাংলাভাষীর জাতীয় রাষ্ট্র হয়নি। নিকট ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্লোগান উঠেছিল সংগত কারণেই। তখন শত্রু ছিল অবাঙালি পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। তারাই এই অঞ্চলের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্লোগানে তাদের হারানোর কিছু ছিল না। ওই সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মোড়কে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল বাঙালি মুসলমানের জাতীয় রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'। ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসমাবেশে দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান।...বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র।'[১] তিনি স্পষ্টতই জাতীয়তার বহুমাত্রিক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।

জাতীয়তাবাদ নিয়ে অনেক বিতর্ক-কুতর্ক হয়েছে; এখনো হচ্ছে। এখানে অবশ্য নাগরিকদের জাতিগত আইডেন্টিটি নিয়ে প্রশ্ন আছে—এ দেশের মানুষ 'বাঙালি মুসলমান' না 'মুসলমান বাঙালি'। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, এই জনপদে ভাষা ও ধর্মের যুগপৎ লেবাসে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্ফুরণ ঘটেছে। এটা অনেকে না বুঝলেও নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঠিকই বুঝেছিলেন। ১৯৬৬ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে কলকাতার *আনন্দবাজার পত্রিকায়* 'পূর্ববঙ্গের সমস্যা' নামে তাঁর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঁচ কিস্তিতে ছাপা হয়। প্রবন্ধে তিনি বাংলার হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্ব এবং এ নিয়ে ভবিষ্যতে কী কী প্রশ্ন উঠতে পারে, সে বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

দুঃখের বিষয়, আজও এমন সব বাঙালি আছেন, যাঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি সমাজ নয়, এমনকি হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া কোনও সমাজই নাই, আছে শুধু ভারতীয় সমাজ। মূঢ়তার শেষ এখনো হয় নাই। হিন্দু হিন্দু, মুসলমান মুসলমান, এই কথাটা সরল মনে, সহজভাবে স্বীকার না করিবার ফলে স্বাধীনতার প্রাক্কালে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের রূপ বাস্তবক্ষেত্রে এমনই দাঁড়াইল যে তখন ছাড়াছাড়ি ভিন্ন আর কোনও পথ দেখা গেল না।...

ধরিয়াই লওয়া যাক যে, পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি এতটুকু আছে যে, উহার পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব। যদি স্বাধীন হয়ই, তাহা হইলে স্বাধীন বাঙালি মুসলমান কি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর সহিত যুক্ত হইবে? বর্তমান অবস্থায় যুক্ত হইবার অর্থ শুধু পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হওয়া নয়, ভারতবর্ষেরও অন্তর্ভুক্ত হওয়া। ইহার স্পষ্ট উত্তর, কখনো নয়। পাকিস্তানের সহিত বিমুক্ত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের সহিত ভারতবর্ষভুক্ত হইবার কোনো আগ্রহ পূর্ববঙ্গের মুসলমানের নাই, এবং হইতে পারে না। তাহা হইলে যে উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে ভাগ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং যাহার জন্য পূর্ববঙ্গের সহিত পাকিস্তানের বিরোধ, সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

এই উদ্দেশ্য বাঙালি মুসলমানের বিশিষ্ট জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি বজায় রাখিয়া উহার বিকাশ সাধন। এই উদ্দেশ্যের পথে পাকিস্তান হইতে পূর্ববঙ্গের যে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি বিপদের আশঙ্কা ভারতবর্ষ হইতে।...মুসলমানের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার বেলাতে হিন্দুস্থানিপ্রধান ভারতবর্ষ কী মূর্তি ধারণ করিবে, তাহা মুসলমানের পক্ষে অনুমান করা কঠিন নহে। গোহত্যা, আমিষ ভোজন ইত্যাদি ব্যাপারে হিন্দুস্থানি হিন্দুর গোঁড়ামি বাড়িয়া চলিয়াছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া পূর্ববঙ্গের মুসলমানের এইটুকু বুঝিতে কোনো অসুবিধা নাই যে, ভারতবর্ষ বর্তমানে তাহাদের প্রতি যে সমবেদনা দেখাইতেছে, উহা আসলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধাচরণ, তাহাদের প্রতি করুণা, ভালোবাসা বা সহযোগিতা নহে। বর্তমানে পূর্ববঙ্গে মুসলমানের যে প্রাধান্য আছে, তাহা ভারতবর্ষে আসিয়া উহারা হারাইবে কেন?

ভারতবর্ষ হইতে ভয় ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর মনোভাব সম্বন্ধেও পূর্ববঙ্গের মুসলমান নিশ্চিন্ত নহে। স্বীকার করিতেই হইবে, দুই বাংলার মধ্যে এখন যথেষ্ট বিরুদ্ধভাব বর্তমান। হিন্দু-মুসলমান দুই পক্ষের কোনো পক্ষই এখন পর্যন্ত পূর্বেকার ও বঙ্গবিভাগপ্রসূত অভিযোগ ভোলে নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে যেসকল মধ্যবিত্ত হিন্দু বিতাড়িত হইয়াছে, তাহাদের ঘরবাড়ি, ধনসম্পত্তি হারাইবার শোক ও ক্রোধ এখনো শান্ত হয় নাই। এত শীঘ্র হইবারও নহে। অপর পক্ষে পূর্ববঙ্গের মুসলমান কৃষক বহুকাল ধরিয়া হিন্দু মহাজন জমিদারের শোষণ হইতে দুঃখকষ্ট পেয়েছে, তাহার স্মৃতিও লোপ হয়নি। সুতরাং দু'পক্ষের

কোনো পক্ষই অতীত ভুলিয়া ভাই ভাই হইবার মতো মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়া পায় নাই।[২]

লেখক নীরদ চৌধুরী বাঙালির (হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে) মনস্তত্ত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। এ জন্য মুসলিম লীগের সভাপতি ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্থপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজন নেই। জয় বাংলা আর জিন্দাবাদ স্লোগানের আড়ালে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানটি বুঝতে খুব কষ্ট হয় না। বাংলাদেশের স্লোগাননির্ভর রাজনীতিতেও এই বিভাজন স্পষ্ট। দুই পক্ষ দুটো স্লোগান নিয়ে পরমানন্দে রণশিঙ্গা বাজিয়ে চলছে। এক পক্ষের ঢাল 'জয় বাংলা', অন্য পক্ষের তলোয়ার 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। একদল মনে করে, যাঁরা 'জিন্দাবাদ' বলেন তাঁরা সবাই পাকিস্তানের দালাল এবং অবধারিতভাবেই যুদ্ধাপরাধী ও মানবতার শত্রু। অন্য দলটি মনে করে, 'জয় বাংলা' শব্দে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের গন্ধ আছে, অতএব স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব কামিয়াব রাখার জন্য এই স্লোগান অবশ্যই পরিত্যাজ্য; 'জয় বাংলা' হচ্ছে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' ডঙ্কা, 'জিন্দাবাদ' হচ্ছে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের' হুংকার। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আহমদ শরীফের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে:

> 'জিন্দাবাদ ও ইনক্লাব' (বিপ্লব) এ দুটো ফারসি ও আরবি শব্দ চালু করেন ব্রিটিশ ভারতের বিপ্লবীরা। এ শব্দগুলোতে জাতীয়তা বা শাস্ত্রিক স্বাতন্ত্র্যচেতনার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সম্বন্ধ নেই। জয় বাংলা'তেও নেই হিন্দুয়ানি। সংস্কৃত জি+অল=জয়। এতে সাফল্যের কাঙ্ক্ষা আছে মাত্র, দেবতার সহায়তা নেই। কাজেই ১৯৬৯-৭০-৭১ সালে যে জয় বাংলাতে পাকিস্তান সমর্থক মুসলিমরা জয় কালীর ছায়া দেখেছিল, তা ছিল তাদের চরম অজ্ঞতাপ্রসূত।
>
> যাহোক, এখন 'জিন্দাবাদ' ও 'জয় বাংলা' রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ সম্পৃক্ত হয়ে যোগরূঢ় সংজ্ঞা সংজ্ঞার্থ লাভ করেছে। কাজেই মৌল অভিধাচ্যুত হয়ে এ স্লোগান বা 'জিকির' দুটো এখন বিশিষ্ট মতের পথের, আদর্শের ও সিদ্ধান্তের প্রতীক প্রতিম ও প্রতিভূ হয়ে উঠেছে। একটি বাঙালির, অপরটি রাষ্ট্রিক বাঙালির অভিধাজ্ঞাপক।...[৩]

আহমদ শরীফের মত হলো, 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' কিংবা 'জয় বাংলা' কোনোটাতেই দেশের বা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বের কথা নেই। দেশের ও দেশবাসীর চিরসাফল্যের ও চিরকাল বেঁচেবর্তে থাকার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে।[৪]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আওয়ামী লীগ বা বাকশাল সরকারের আমলে বাংলাদেশের নাগরিকদের পাসপোর্টে 'জাতীয়তা' প্রসঙ্গে 'সিটিজেন অব বাংলাদেশ' সিল দেওয়া হতো। জাতীয়তার পরিচয় হিসেবে 'বাঙালি' লেখা হয়নি। এখন সেখানে 'বাংলাদেশি' সিল দেওয়া হয়।

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ

আওয়ামী লীগ 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর কথা বলত। এর বিপরীতে বিএনপি 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ-এর স্লোগান নিয়ে রাজনীতির মাঠে নামল। এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে নতুন এই দলটি জনমানসে নিজস্ব প্রভাববলয় তৈরির চেষ্টা করে। রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে আওয়ামী লীগবিরোধী একটা মোর্চা গড়ে তোলার বিষয়টি সহজেই অনুমান করা যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে চাই জুতসই স্লোগান। কিন্তু কেবল স্লোগাননির্ভর চটকদার কথাবার্তা বলে একটি দল তার অবস্থান টেকসই করতে পারে না; এ জন্য দরকার নাগরিকদের জন্য নতুন রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব তৈরি করা, অথবা অবচেতনে থাকা মনস্তত্ত্বকে জাগিয়ে দিয়ে একটা তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর তাকে দাঁড় করানো। এই প্রেক্ষাপটেই বিএনপি 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের' ঘোষণা দিল।

'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে এর প্রবক্তা জিয়াউর রহমানের একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে। তিনি তাঁর প্রস্তাবিত বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে 'সার্বিক জাতীয়তাবাদ' হিসেবে দাবি করেছেন এবং 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' এ দেশের মানুষের জাতিসত্তার খণ্ডিত পরিচয়ই তুলে ধরে বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি তাঁর অনুসারী ও দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে মাঝেমধ্যে রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন এবং তাঁর লক্ষ্য-দর্শন ব্যাখ্যা করতেন। এরকম একটি আলোচনায় 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে তিনি তাঁর ধ্যানধারণা খোলামেলাভাবে প্রকাশ করেন। জিয়া মনে করতেন, 'জনগণের জাতীয়তাবোধ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাসের বিবর্তন, অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং জনগণের মনস্তাত্ত্বিক ধ্যানধারণার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছে।'[৫] বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে জিয়ার চিন্তাভাবনা এখানে তুলে ধরা হলো :

> এখন প্রশ্ন হলো : জাতীয়তাবাদ কী? ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, এ বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে। 'রেসিয়াল' বা জাতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই এসে যায়। আরব ও জার্মান জাতীয়তাবাদ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।...এরপর আসে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্লোগান এ ধ্যানধারণা থেকেই উৎসারিত। এ কারণেই আওয়ামী লীগাররা বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বপ্নে এখনো বিভোর রয়েছে। আবার মুসলিম লীগ, আইডিএল এবং জামায়াতিরা বলে থাকে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা।
>
> ...সত্য করে বলতে গেলে বলতে হয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ কায়েম করতে গিয়ে বাংলাদেশকে শোষণ ও শাসন চালানো হলো। কিন্তু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের নামে 'পলিটিকস অব এক্সপ্লয়েটেশন'

পাকিস্তানকে এক রাখতে পারল না। প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। একটি অঞ্চলকে ভিত্তি করেও রাজনীতি চলতে পারে, গড়ে উঠতে পারে এক নতুন জাতীয়তাবাদ।...তাই আমরা বলি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ হলো সার্বিক জাতীয়তাবাদ।

আমাদের আছে জাতিগত গৌরব, রয়েছে সমৃদ্ধশালী ভাষা এবং আছে ধর্মীয় ঐতিহ্য। ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের বাসিন্দা। আমাদের আছে নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার স্বপ্ন। আর এসব রক্তাক্ত স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনায় অবগাহিত। একটা জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যে এ উপাদানের সমাবেশ ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি।

তাই কেউ যদি বলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ধর্মকে অবলম্বন করে হচ্ছে না, তবে ভুল হবে। ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মের প্রতি অনুরক্ত থাকা বাংলাদেশি জাতির এক মহান ও চিরঞ্জীব বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা আছে: 'লা ইকরা ফিদ্দীনে', অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। সুতরাং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ একদিকে যেমন ধর্মভিত্তিক নয়, তেমনি আবার ধর্মবিমুখও নয়। এ জাতীয়তাবাদ প্রত্যেকের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় অধিকারকে নিশ্চিত করে। একই সঙ্গে কেউ যদি বলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ কেবল ভাষাভিত্তিক, তবে সেটাও ভুল বলা হবে। আবার কেউ যদি বলে আমাদের কেবল একটা অর্থনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে, কিন্তু কোনো দর্শন নেই, সেটাও ভুল। আমাদের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ফিলসফিতে এবজরশন পাওয়ার আছে। এক্সপো রুমও রয়েছে। যদি কোথাও ঘাটতি থাকে, অন্যটি থেকে এনে পুরো করে দিতে পারবেন। আমাদের অলটারনেটিভ আছে। সে কারণেই আমরা টিকে আছি, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করছে।...

জাতীয়তাবাদের টার্গেট হবে জনগণ। কারণ জনগণই সকল শক্তির উৎস। এ জন্যই আমরা গ্রামে গ্রামে সংগঠন করছি। প্রতিষ্ঠা করেছি সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বনির্ভর গ্রাম সরকার।

প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতির একটা স্বপ্ন থাকে। তেমনি আমাদের মনেও রয়েছে অনেক স্বপ্ন। সে স্বপ্নই হলো দর্শন। এ দর্শন দিয়েই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বাস্তবায়িত করতে হবে।...আমরা স্বপ্ন দেখছি একটা শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের: সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সকলের অধিকার নিশ্চিত করার।...

দুনিয়া প্রত্যেক দিন একই থাকে না।...আল্লাহ তাআলা যখন নেচারই চেঞ্জ করছেন, তখন আপনার টার্গেটগুলোকে চেঞ্জ করবেন না কেন? আপনার চাহিদার ক্ষেত্রেও তো রদবদল হয়েছে।...খালি পেটে দর্শন হয় না, কাজও করা যায় না। রাজনীতি তো করা যায়ই না। তাই সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি আমাদের দর্শনের মধ্যে ধর্মীয় দর্শনও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে।...আমরা মানুষকে যে

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শন দিতে চাচ্ছি, তাতে তিন ধরনের খোরাক আছে। যেমন: (১) ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অন্নের সংস্থানের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান, (২) স্বাবলম্বী জীবনযাপনের জন্য অনুপ্রেরণা এবং (৩) পারলৌকিক জগতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে আত্মার শান্তি অর্জনের প্রচেষ্টা। এ কারণেই আমরা বলছি, ধর্মের এলিমেন্ট যদি রাজনীতিতে না থাকে, তবে সেটাও ভুল হবে। 'সেকুলার স্টেট' বলে অনেক দেশের পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ডের কথাই ধরা যাক। '৭৭ সালে গিয়েছিলাম কমনওয়েলথ সিলভার জুবিলি উৎসবে। কথায় কথায় বাইবেল। কোনো কিছুই শুরু হয় না বাইবেল ছাড়া। তারা সেকুলার হলো তাহলে কোথায়? এরপর আসুন প্রতিবেশী ভারতের কথায়। সারা দুনিয়ায় 'সেকুলার স্টেট' বলে সে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু আসলে কি তা-ই? না, আমার মতে ভারত সেকুলার নয়। একজন ভারতীয় সাংবাদিককে বলেছিলাম এ কথা। বলেছিলাম ভারতে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বক্ষেত্রেই হিন্দুধর্মমত প্রতিপালন করা হচ্ছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রতিবছর কতশত সংখ্যালঘু মারা যায়। এতে উক্ত সাংবাদিক রুষ্ট হলেন। কিন্তু রুষ্ট হলে কী করা যাবে? আমাদের সাধারণ মানুষের চেয়ে ভারতীয়দের অবস্থা ভালো না হলেও তারা এটম বোম, ট্যাঙ্ক বানিয়ে চলেছে।

আমাদের কথা হলো, মানুষের হাত-পা বেঁধে কোনো কিছু করতে চাই না।[৬]

জিয়া তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতিতে প্রায়ই 'উন্নয়নের রাজনীতি'র কথা বলতেন। তিনি এটাও মনে করতেন যে জাতীয়তাবাদ কেবল একটা ধারণাগত বিষয় নয়, এটা এমন একটা প্রণোদনা, যা মানুষকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। ১৯৮১ সালে মার্কাস ফ্রান্ডাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'এটা আমাদের দেশ আমাদের ভূমি।...আমাদের ভূমি অনেক বিজেতা এসে নষ্ট করেছে। এখন সুযোগ এসেছে আমাদের এই ভূমি আমরা চাষাবাদ করি এবং এর উৎপাদনশীলতা বাড়াই। শিল্প গড়ে তুলি এবং মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াই।...আমাদের আস্থা রাখতে হবে নিজেদের শক্তিতে...কোনো বিদেশিবাদ নয়।'[৭]

রাজনৈতিক মেরুকরণ

'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' প্রচারের পেছনে বিএনপির রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। জিয়াউর রহমানের সরকার জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে একধরনের মেরুকরণ চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ তির্যক মন্তব্য করেছেন:

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী দল, আওয়ামী লীগের 'বাঙালি' জাতীয়তার অভিসন্ধিমূলক প্রতিবাদে 'বাংলাদেশি' জাতীয়তা বলে প্রচার করে এবং রাজাকার ও ইসলামপন্থীদের নিয়ে সেনানী শাসক জিয়াউর রহমান সেক্যুলার রাষ্ট্রকে ইসলামি ও মুসলিম আবরণে ও আভরণে সজ্জিত করে বাঙালি সত্তার ও মুক্তিযুদ্ধের অবমাননা করে বিজয়ের উল্লাস অনুভব করেন। কিন্তু অন্য এক তাৎপর্যে 'বাংলাদেশি' জাতীয়তা জনগ্রাহ্য হওয়ার দাবি রাখে কারণ এ রাষ্ট্রিক জাতীয়তায়—প্রান্তিক আদিবাসীরাও গোত্র-ভাষা-সংস্কৃতিনির্বিশেষে সমমর্যাদায় ও সমঅধিকারে স্বীকৃতি পায়—জিম্মি থাকে না। কিন্তু প্রতারণা ও বিভ্রান্তিমূলক অসঙ্গতি রয়েছে বলেই এ অঙ্গীকার বা স্বীকৃতি প্রতারণারই নামান্তর বলেই মানতে হবে—কেননা 'বিসমিল্লাহ' যুক্ত সংবিধানে অমুসলিমরা পূর্ণ নাগরিক রূপে মানসিক অধিকার ও মানসিক স্বাধীনতা সমানভাবে পায় না।...[৮]

জাতীয়তাবাদের ইসলামীকরণ

বিএনপি মতাদর্শ হিসেবে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'কে আঁকড়ে ধরল। ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জিয়াউর রহমান সংবিধানের অষ্টম অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে যে ফরমান জারি করেছিলেন, তা-ই হয়ে দাঁড়াল দলটির দার্শনিক ভিত্তি। এই অনুচ্ছেদের সংশোধিত ও পরিবর্তিত ধারাগুলো ছিল :

(১) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার—এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এইভাবে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(১ক) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।

জিয়াউর রহমানের মনে হয়েছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান নাগরিকদের ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করলে সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী অবশ্য এ ব্যাপারে আরও খোলামেলা ছিল। তারা সাংবিধানিকভাবেই দেশকে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করেছিল। বাংলাদেশও কার্যত ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ধারণাটিকে গ্রহণ করল কয়েকটি শব্দের মারপ্যাঁচে। জনমনে একটি ধারণা হলো, জিয়াউর রহমান একজন সাচ্চা মুসলমান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল। এ কাজটি করতে গিয়ে জিয়াউর রহমান এ দেশে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের যে ধারাটি গড়ে উঠেছিল, তার বিপরীতে অবস্থান নিলেন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনাবিরোধী

বুদ্ধিজীবীদের নানাভাবে প্রণোদনা দিতে শুরু করলেন। এই প্রবণতাকে আহমদ শরীফ দেখলেন উসকানি হিসেবে। তিনি মন্তব্য করলেন :

> বিএনপি সরকার জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য মোল্লাদলকে আশ্রয় দিয়ে, প্রশ্রয় দিয়ে, উসকিয়ে দিয়ে, উত্তেজনা দিয়ে সাধারণভাবে প্রগতিশীল রুচিমান ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের জনজীবন দুর্বিষহ ও বিপন্ন করে তুলেছে।[৯]

এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বেতারে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে শাসকগোষ্ঠী মনে করত একজন 'ভারতীয় হিন্দু' এবং তাঁর সাহিত্য পাকিস্তানের সংহতিবিরোধী। পাকিস্তানি শাসকদের রবীন্দ্রনাথ বর্জনের পক্ষে ৪০ জন বুদ্ধিজীবী একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিটি ২৯ জুন (১৯৬৭) *দৈনিক পাকিস্তান*-এ ছাপা হয়েছিল। বিবৃতিতে তাঁরা বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি।' এই বিবৃতিতে যাঁরা সই দিয়েছিলেন, তাঁদের একজন হলেন ড. আশরাফ সিদ্দিকী।[১০] জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে আশরাফ সিদ্দিকীকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন। 'আমার সোনার বাংলা'—রবীন্দ্রনাথের এই গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণকারী এক ব্যক্তিকে বাংলা একাডেমির মতো একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে বসানো হলো। আশরাফ সিদ্দিকী দীর্ঘ ছয় বছর ওই পদে বহাল ছিলেন।

বেতার ও টেলিভিশনে নামাজের সময় আজান প্রচার শুরু হয়। জিয়া 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে বক্তৃতা আরম্ভ করতেন। বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস উপলক্ষে, বিশেষ করে ঈদে মিলাদুন্নবী, শবে বরাত, শবে কদর এবং আশুরা পালন বেশ ঘটা করেই শুরু হয় এবং জিয়া এ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে 'বাণী' দেওয়া চালু করেন। বিভিন্ন সেনানিবাসে কেরাত প্রতিযোগিতা চালু করা হয়।

পাকিস্তান আমলে দেশে একটি 'ইসলামিক একাডেমি' ছিল। ১৯৭২ সালে এটা বন্ধ হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন।[১১] জিয়াউর রহমান এই ফাউন্ডেশনকে আরও কার্যকর করেন। তিনি স্বতন্ত্র একটি ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় তৈরি করেন। মাদ্রাসার সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যায়। ১৯৭৫ সালে দেশে ১,৮৩০টি মাদ্রাসায় ২,৯১,১৯১ জন ছাত্র পড়াশোনা করত। ১৯৭৮ সালে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়ে হয় ২,৩৮৬ এবং ছাত্রসংখ্যা হয় ৪,৪১,২০০।[১২]

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার অপরাধে অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন; নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছিল কারও কারও। নাগরিকত্ব বাতিল হওয়াদের একজন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে

ইসলামীর আমির গোলাম আযম। একাত্তরের ২২ নভেম্বর তিনি এ দেশ ছেড়ে চলে যান। পাকিস্তানি পাসপোর্টে তিন মাসের ভিসা নিয়ে তিনি ১৯৭৮ সালের ১১ জুলাই ঢাকায় আসেন।[১৩] গোলাম আযমের ফিরে আসা এবং রাজনীতিতে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠার ফলে পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নতুন মেরুকরণ হয়। এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

তাত্ত্বিক বলয়

জিয়াউর রহমান কি 'পাকিস্তানপন্থী' রাজনীতির উল্টোযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন, নাকি ১৯৭১-পরবর্তী নতুন বাস্তবতার স্বরূপ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন—এরকম একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধের ফলে কি ১৯৭১-পূর্ববর্তী বাস্তবতা পাল্টে গিয়েছিল?

আওয়ামী লীগের মতো একটা জনভিত্তির রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালে চরম লক্ষ্যে পৌঁছেছিল। আওয়ামী লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনীতির নিষ্পত্তি হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু ওই ধরনের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আবেদন একাত্তর-পরবর্তী বাস্তবতার সঙ্গে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। বায়ান্ন, ছেষট্টি-উনসত্তরের স্মৃতি নিয়ে বসে থেকে তো আর জাতিরাষ্ট্র তৈরি করা যায় না। এ জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা, যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের প্রয়োজনে সমঝোতা ও ঐক্যের রাজনীতি এবং জনপ্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। বলা চলে, আওয়ামী লীগ সরকার দেশের বৃহত্তর নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। ঐক্যের বদলে গোষ্ঠীতন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। জাতীয় ঐক্য তো দূরের কথা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রধান শক্তিটিও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এর ফলে জাসদের মতো একটি রাজনৈতিক প্রবণতার জন্ম হয়।

বাহাত্তরে প্রয়োজন ছিল নতুন রাজনীতি, নতুন কৌশল। একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান তার কার্যকারিতা সম্পন্ন করেছিল। আওয়ামী লীগ এরপর পুরোনো মনস্তত্ত্বের ঘেরাটোপ থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। ১৯৪৭ সালের পর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মনে করতে শুরু করে, মুসলিম লীগের বিরোধিতা মানেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, দেশদ্রোহ। একাত্তরের পর আওয়ামী লীগও বিরোধীদের সমালোচনার মধ্যে সব সময় ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেতে থাকে। সরকারবিরোধিতা আর রাষ্ট্রদ্রোহ একাকার

করে ফেলে। এখান থেকেই শুরু রাজনৈতিক সংকটের। এর ধারাবাহিকতা চলছে আজও।

'পাকিস্তান' নিয়ে ১৯৪৭-পরবর্তী কয়েক বছর এ দেশে যেরকম মাতামাতি ছিল, খোদ পাকিস্তানেও বোধ হয় সেরকমটি ছিল না। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পাকিস্তানের প্রতি বাঙালির ঘোর কাটতে থাকে।

১৯৭১-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ নিয়ে অপরিসীম আবেগ লক্ষ করা গেছে। যেকোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই দীর্ঘকাল মানুষকে আবেগে আচ্ছন্ন করে রাখে না। দু-এক বছর যেতে-না-যেতেই বাঙালি মুসলমান নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হলো। অবচেতনে লুকিয়ে থাকা মুসলমানি জাত্যভিমান চোখ মেলতে শুরু করল। পঁচাত্তরের মধ্য আগস্টের পর এই মনস্তত্ত্ব আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এর সবটাই ষড়যন্ত্র ছিল না। কোটি কোটি মানুষ তো আর ষড়যন্ত্রকারী হতে পারে না? এই অবস্থার একটা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক-রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ। একাত্তর-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন :

> ...প্রকৃত অবস্থাটা এই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাংগে নাই; 'দ্বিজাতিত্ত্ব'ও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর প্রস্তাব মত দুই পাকিস্তান হইয়াছে। ভারত সরকার লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য করিয়াছে। তারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দুই রাষ্ট্রের নামই পাকিস্তান হয় নাই, তাতেও বিভ্রান্তির কারণ নাই। লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটার উল্লেখ নাই, শুধু 'মুসলিম-মেজরিটি রাষ্ট্রের' উল্লেখ আছে। তার মানে রাষ্ট্র-নাম পরে জনগণ দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা। পশ্চিমা জনগণ তাদের রাষ্ট্র-নাম রাখিয়াছে 'পাকিস্তান'। আমরা পূরবীরা রাখিয়াছি বাংলাদেশ। এতে বিভ্রান্তির কোনো কারণ নাই।[১৪]

বিস্তার

সংসদ নির্বাচন

১৯৭৮ সালের ১৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইতিপূর্বে ঘোষণা করা রাজনৈতিক দলবিধি সংশোধন করে নতুন একটা অধ্যাদেশ জারি করেন। এই আদেশের কয়েকটি ধারা ছিল এরকম :

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বা নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর এমন কোনো মতামত প্রচারের উদ্দেশ্যে কিংবা এমন কাজে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করা হবে না।
- কোনো ব্যক্তি কোনো বিদেশি সাহায্য নিয়ে দল তৈরি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠা বা আহ্বান করতে পারবেন না এবং এইরূপ কোনো দলের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত হবেন না।
- কোনো রাজনৈতিক দলই কোনো গুপ্ত বা অপ্রকাশ্য সংগঠন, গোষ্ঠী বা এজেন্সি পোষণ করবে না, বা কোনো গোপন বা অপ্রকাশ্য কাজে জড়িত হবে না।

  অথবা
- কোনো নামেই এমন কোনো সশস্ত্র ক্যাডার, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বা অন্য কোনো সংগঠন তৈরি বা পোষণ করবে না, যা কোনো শৃঙ্খলা বাহিনীর মতো কাজ করে।
- রাজনৈতিক দলের তহবিল তফসিলভুক্ত ব্যাংকে রাখতে হবে এবং সেই ব্যাংকের মাধ্যমেই পরিচালনা করতে হবে।[১]

এই অধ্যাদেশ জারির পর রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের শর্তটি তুলে নেওয়া হয়। তবে ১৭ নভেম্বরের অধ্যাদেশে কী কী করা যাবে না, সে বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। জিয়া নিজে এসব খুব একটা মেনে চলতেন না। বিএনপি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করেছিলেন। এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন মেজর জেনারেল নূরুল ইসলাম।[২]

১ ডিসেম্বর (১৯৭৮) জিয়া সেনাবাহিনীর উপপ্রধান মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। এরশাদকে সেনাপ্রধান করায় অনেকেই ক্ষুণ্ন হন। এ প্রসঙ্গে সেনা সদর দপ্তরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর ভাষ্য উল্লেখ করা হলো :

> ছলনা ও চতুরতার মাধ্যমে এরশাদ জিয়ার খুব প্রিয়পাত্র হলেন। জিয়াও তাঁকে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন। একসময় জিয়া এরশাদকে সেনাপ্রধান করে নিজে ওই পদ থেকে সরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এ পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে জিয়া একদিন আর্মি হেডকোয়ার্টারের সামনের লনে হাঁটতে হাঁটতে কথা প্রসঙ্গে আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি জেনারেল মঞ্জুরকে সেনাপ্রধান করার কথা বললাম। জিয়া আমার ওই মতামতকে অন্যভাবে নিলেন। ভাবলেন, আমি আর মঞ্জুর একই পক্ষের। তাই জিয়া আমার দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করে বললেন, তোমরা দুজনেই চিফ হবে, তবে অপেক্ষা করতে হবে। শুধু আমি নই, জিয়ার অন্যান্য সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষী, অনুগত ও বন্ধুবান্ধবও এরশাদকে সেনাপ্রধান করার বিপক্ষে ছিলেন। এরশাদ তখন জিয়া সরকারের দুর্নীতি দমনের (কো-অর্ডিনেশন সেল) প্রধান সমন্বয়কারী, অথচ তাঁর বিরুদ্ধেই অনেক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীতে কথাবার্তা হতো। এ ছাড়া তাঁর নৈতিক চরিত্র নিয়ে অনেক কানাঘুষা ছিল।[৩]

আগেই সরকার ঘোষণা করেছিল, ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদের নির্বাচন হবে। নির্বাচনের বিষয়টি সামনে রেখে জিয়াউর রহমান আরও একবার সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেন। ১৫ ডিসেম্বর জারি হলো সামরিক আইনের দ্বিতীয় ফরমানের পঞ্চদশ সংশোধনী। সংশোধনীতে বলা হলো, জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন; মন্ত্রিসভার সদস্যদের এক-পঞ্চমাংশের বেশি সদস্য সংসদের বাইরে থেকে নেওয়া যাবে না; মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করবে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর; জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসন থাকবে পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য ইত্যাদি।[৪]

আওয়ামী লীগ সংবিধান সংশোধনীর প্রতিবাদ করে। ১৭ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মালেক উকিল বলেন, সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নামে এটা নিছক একটা 'ধাপ্পা' এবং সংসদকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির কবজায় নেওয়ার জন্য এই সংশোধনী জারি করা হয়েছে।[৫]

১৯৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছিল, ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন হবে।[৬] কিন্তু সামরিক আইনের আওতায় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে অনেকেরই আপত্তি ছিল। অবশ্য কোনো কোনো

দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজেদের মধ্যে নির্বাচনী জোট তৈরি করতে থাকে। ৫ জানুয়ারি (১৯৭৯) এক ঘোষণায় নির্বাচনের তারিখ বদল করে ১৮ ফেব্রুয়ারি ধার্য করা হয়। ১৫ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন ৩০টি দলকে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করে।[৭]

১৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনে নির্বাচন হয়। নির্বাচনে বিএনপি ২০৭টি আসন পেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। আওয়ামী লীগে তখন দুই ভাগ। আবদুল মালেক উকিলের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসনে জয়ী হয়। অন্যদিকে মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের অন্য গ্রুপটি মাত্র দুটি আসন পায়। ফলে আওয়ামী লীগ (মালেক) মূলধারার আওয়ামী লীগ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। আইডিএল-মুসলিম লীগের জোট গণতান্ত্রিক ইসলামী ফ্রন্ট ২০টি এবং জাসদ আটটি আসনে জয়ী হয়। প্রদত্ত ভোটের ৪১ শতাংশ পায় বিএনপি। আওয়ামী লীগ, গণতান্ত্রিক ইসলামী ফ্রন্ট ও জাসদ পায় যথাক্রমে ২৫, ১০ ও ৫ শতাংশ ভোট। ১৬ জন নির্দলীয় প্রার্থী জয়ী হন। বিএনপি থেকে নির্বাচিতদের ৪০ শতাংশ ছিলেন অরাজনৈতিক ব্যক্তি; ১৬ শতাংশ এসেছিলেন মুসলিম লীগ থেকে, ১৫ শতাংশ এসেছিলেন ন্যাপ ভাসানী থেকে এবং ৯ শতাংশ আগে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছিলেন।[৮]

আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মালেক উকিল সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি দলের অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, নির্বাচনের আগেই বঙ্গভবনে ফলাফল সম্পর্কে যে নীলনকশা তৈরি হয়েছিল, সেটাই বাস্তবায়ন করা হয়েছে; সবকিছুই নির্ধারিত হয়েছে নির্বাচনের আগে নেওয়া বিভিন্ন সংস্থার জরিপের ভিত্তিতে।[৯]

নির্বাচনে জয়-পরাজয় কেমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, সে ব্যাপারে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায় মোখলেসুর রহমানের (সিধু ভাই) সাক্ষাৎকার থেকে। যাদু মিয়ার সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায় প্রসঙ্গটি এসেছে :

> যাদু মিয়াকে বলেছিলাম, 'আর যা-ই করো আর না করো, দেয়ার ক্যান নট বি এনি ডেমোক্রেসি উইদাউট অ্যান অপজিশন।...তোমরা আমাকে একটা কথা দাও যে দেশে একটা অপজিশন বা বিরোধী দল থাকবে।'
>
> ও বলেছিল, 'থাকবে মানে থাকবে।'
>
> আমি বললাম, শেখ মুজিবের কাছেও একটা গ্রুপকে আমি পাঠিয়েলিাম।...তাদের দিয়ে একটা কথাই শেখ মুজিবকে বলানো হয়েছিল যে যাতে বিরোধী দল থেকে ৩০-৪০ জন সংসদ সদস্য সংসদে এসে কথা বলতে পারেন, আপনি তার সুযোগ রাখবেন।

যাঁরা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, শেখ মুজিব নাকি তাঁদের বলেছিলেন, 'বিরোধী দলের তারা যদি ভোট না পায়, আমি কি বাক্স ভেঙে তাদের পক্ষে ভোট দেব।' যাদু মিয়াও আমাকে একই কথাই বলেছিল, 'অপজিশন আমরা ক্রিয়েট করব মানে?'

আমি বললাম, 'বিরোধী দলকে আসতে দিতে হবে, বলতে দিতে হবে।'

যাদু বলল, 'তারা যদি ভোট না পায়।'

আমি বললাম, 'ভোট তো তারা পাবে যাদু মিয়া, তোমরা যদি ভোটারের ভোট কেড়ে না নাও।' তারা আমার এই কথাটা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছিল, অ্যান্ড দে অ্যালাউড দ্য অপজিশন টু কাম।

কিছু লোক সত্যিকারভাবে নিজেদের জোরে এসেছিলেন আর কিছু জায়গায় ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে ঘটেছিল। যেমন খান সবুর সাহেবের কথাই ধরুন। তিনি মুসলিম লীগার। এই মর্মে চুক্তি হয়েছিল যে তাঁকে তিন জায়গা থেকে পাস করিয়ে আনতে হবে। তাঁকে তিন জায়গা থেকেই পাস করিয়ে আনা হয়েছিল।

আমাদের রংপুরে মুসলিম লীগের কাজী আবদুল কাদেরের কথাই ধরা যাক। সেখানে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছিলেন যিনি, তিনিই আমাকে এসব কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁকে টাকা দেওয়া হয়নি। শুধু তা-ই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে গভর্নমেন্ট অফিসাররা পর্যন্ত কাজ করেছেন। সবাই কাজ করেছেন কাজী কাদেরের পক্ষে।

আওয়ামী লীগের কিছু লোক নিজেদের শক্তির বলেই এসেছেন। কিছু লোককে পুলিশ রেকর্ড-টেকর্ড দেখে আনা হয়েছে। ফলে একটা উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক বিরোধীদলীয় সদস্যও সংসদে আসার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৮০ জনের মতো।...[১০]

মোখলেছুর রহমানের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, জিয়া যাদু মিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। যাদু মিয়া তাঁর বড় ভাইকে একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, জিয়ার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল যে 'প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী নমিনেট করবেন; কিন্তু পার্লামেন্টে গিয়ে তাঁকে ৩০ দিনের মধ্যে আস্থা ভোট নিতে হবে।' ওই সময় শাহ আজিজুর রহমান সেখানে ছিলেন। তিনি জিয়াকে বলেছিলেন, 'স্যার, এর আবার কী দরকার? আপনি নমিনেট করবেন, তার আবার আস্থা ভোটের কী দরকার? দ্যাট ইজ এনাফ। ইয়োর নমিনেশন ইজ এনাফ।' যাদু মিয়াকে দেওয়া কথা জিয়া রাখেননি। তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যাদু মিয়া এই প্রস্তাবে রাজি হননি। ১৩ মার্চ (১৯৭৯) তাঁর মৃত্যু হয়।[১১] জিয়ার মন্ত্রিপরিষদে যাদু মিয়াকে 'সিনিয়র মিনিস্টার' পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ২ এপ্রিল (১৯৭৯)। মির্জা গোলাম হাফিজ স্পিকার ও শাহ আজিজুর রহমান সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের আসাদুজ্জামান খান বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন।

প্রথমবারের মতো কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রধান নেতা সংসদে জায়গা পান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রাশেদ খান মেনন, সাম্যবাদী দলের মোহাম্মদ তোয়াহা, জাতীয় একতা পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং জাসদের শাজাহান সিরাজ। আওয়ামী লীগের সভাপতি মালেক উকিল নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন।

৫ এপ্রিল জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল উত্থাপন করা হয়। এই বিলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে এযাবৎ জারি হওয়া সব আদেশ বৈধ করার প্রস্তাব করা হয়। আওয়ামী লীগের উভয় গ্রুপ (মালেক ও মিজান), জাসদ, ন্যাপ (মোজাফফর), গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও একতা পার্টি বিলের বিরোধিতা করে ওয়াকআউট করে। গণতান্ত্রিক ইসলামী ফ্রন্ট, জাতীয় লীগ, সাম্যবাদী দল ও গণফ্রন্টের ২০ জন সদস্য ভোটদানে বিরত থাকেন। বিলটি সংসদে ২৪১-০ ভোটে পাস হয়।[১২] জিয়াউর রহমান ৬ এপ্রিল সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেন।[১৩]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর জিয়াউর রহমান বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন। তিনি নিজে এর চেয়ারম্যান বহাল থাকলেন। ১২ সদস্যের একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি (স্থায়ী কমিটি) তৈরি করা হলো। এটাই ছিল দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কমিটি। এই কমিটির সদস্য ছিলেন বিচারপতি আবদুস সাত্তার, শাহ আজিজুর রহমান, আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী, জমিরউদ্দিন সরকার, একরামুল হক, শেখ রাজ্জাক আলী, সৈয়দ মহিবুল হাসান, আমিনা রহমান, এ এস এম ইউসুফ এবং নাজমুল হুদা। অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে জিয়া দলের মহাসচিব নিয়োগ করেন।[১৪] চেয়ারম্যান এবং মহাসচিব পদাধিকারবলে স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন। মহাসচিব নিযুক্ত হওয়ার পর ২৩ আগস্ট (১৯৭৯) বদরুদ্দোজা চৌধুরী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।[১৫]

দলের তহবিল

জাতীয় সংসদে বিএনপি সবচেয়ে নতুন ও সবচেয়ে বড় দল। বাইরেও এর অবস্থা রমরমা। এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী দলের মহাসচিব। কিন্তু দল চলে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার ওপর ভিত্তি করে। দলের

অন্যান্য নির্বাহীর মধ্যে অন্যতম জামালউদ্দিন আহমদ, মওদুদ আহমদ, এস এ বারী এ টি প্রমুখ মন্ত্রিসভার সদস্য। দলের শাখা অফিস সব জায়গায় চালু হচ্ছে। টাকাকড়ি খরচ হচ্ছে অনেক। জিয়া একসময় একটা মন্তব্য করেছিলেন, 'মানি ইজ নট আ প্রবলেম।' কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, দল চালানোর জন্য এত যে টাকার দরকার, তা আসছে কোথা থেকে। একজন সৎ শাসক হিসেবে জিয়ার অন্য রকম ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। জিয়া কীভাবে টাকাপয়সা জোগাড় করতেন, তার একটা বিবরণ পাওয়া যায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম প্রধান ও পরে জিয়া সরকারের জাহাজ চলাচলমন্ত্রী ক্যাপ্টেন নূরুল হকের কাছ থেকে। লেখক-গবেষক বি জেড খসরুকে দেওয়া নুরুল হকের এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টা উঠে এসেছে :

> জিয়া একদিন ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'আমার দশ লাখ টাকা দরকার।' চাকরি বাঁচাতে ক্যাপ্টেন হককে রাজি হতে হলো। টাকা জোগাড়ের জন্য তাঁর একটাই পথ খোলা ছিল, জাহাজমালিকেরা। তিনি উপমন্ত্রী, চট্টগ্রামের লোক, আরিফ মইনুদ্দীনকে চট্টগ্রামে পাঠালেন স্টিভডোর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ঢাকায় নিয়ে আসতে।
>
> হকের কাছে বৃত্তান্ত শুনে সমিতির নেতারা টাকা দিতে রাজি হলেন। কিন্তু তাঁরা একটা রশিদ চাইলেন, যাতে তাঁরা তাঁদের সদস্যদের বলতে পারেন যে, তারা টাকাটা মেরে দেননি। হক বললেন, 'আমি রশিদ দেব কেমন করে?' তাঁরা একটা উপায় বের করলেন। টাকাটা সরাসরি প্রেসিডেন্ট জিয়াকে দিলে কেমন হয়? জিয়া নিজেই যদি টাকাটা নেন, তাহলে সদস্যদের এটা বলা যাবে যে, প্রেসিডেন্টের কাছে তো আর রশিদ চাওয়া যায় না। ক্যাপ্টেন বুঝলেন, এটা হচ্ছে জিয়ার কাছাকাছি যাওয়ার একটা বাহানা। কিন্তু তিনি রাজি হলেন।
>
> জিয়াকে এটা বলতেই জিয়া রাগে ফেটে পড়লেন, 'আমি কেন টাকা নেব?' সমিতির নেতারা ক্যাপ্টেনের কাছে টাকার বস্তা রেখে সরে পড়লেন। পরদিন ক্যাপ্টেনের বোনের এক জামাতা, যিনি ছিলেন পুলিশের একজন এসপি এবং তাঁর কাজ ছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখা, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করে হালকা মেজাজে বললেন, 'মামা, গতকাল আপনি স্টিভডোর অ্যাসোসিয়েশন থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়েছেন।' ক্যাপ্টেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি জানলে কীভাবে?'
>
> ভাগনে জবাব দিল, 'স্পেশাল ব্রাঞ্চে আপনার নামে একটা ফাইল খোলা হয়েছে।'
>
> জিয়া এভাবেই তাঁর লোকদের শাসনে রাখতেন। জিয়ার রাজনীতির জন্য টাকা জোগাড় ক্যাপ্টেন শুধু একাই করতেন না। সব মন্ত্রীকেই এ কাজ করতে হতো। ব্যতিক্রম ছিলেন সাবেক মুসলিম লীগের বস্ত্রমন্ত্রী আবদুল আলীম। তহবিল জোগাড়ের আদেশ শুনে তিনি বলেছিলেন, 'স্যার, আমার কিছু জমিজমা

আছে। যদি চান, তাহলে সব বেচে আপনাকে টাকা দেব। কিন্তু আমি চাঁদা তুলতে পারব না।'[১৬]

চট্টগ্রাম থেকে তহবিল জোগাড় প্রসঙ্গে আরিফ মঈনুদ্দীন অন্য রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> নৌপরিবহনমন্ত্রী নুরুল হক বললেন, জিয়া সাহেব বলেছেন তোমাকে বলতে টু রেইজ পার্টি ফান্ড ফ্রম চিটাগাং। আমি চাঁদা তোলার জন্য উপযুক্ত ছিলাম না। রাজ্জাক-তোফায়েল-কাজী জাফর এরা এসব ব্যাপারে পটু। হয়তো উনি (জিয়া) ডাইরেক্টলি বলতে লজ্জা পান। চাঁদা যদি পাঁচ টাকা ওঠে, লোকে প্রচার করবে পাঁচ শ উঠেছে। জামালউদ্দিন-সাইফুর রহমান তো এ জন্যই জেলে গেল। যারা টাকা-পয়সা দিতে পারে, আমি তাদেরকে জানি। কিন্তু আপনাকে (নুরুল হক) আমার সঙ্গে থাকতে হবে। আমাকে তো চিটাগাংয়েই থাকতে হবে। আমি চাই না আমার কোনো বদনাম হোক।
>
> ডিসির মাধ্যমে আমি চিটাগাংয়ে যোগাযোগ করলাম। স্টিভডোর অ্যাসোসিয়েশন, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, সিমেন্ট ব্যবসায়ী, লোহা ব্যবসায়ী, বাস-ট্রাক মালিক সমিতি, যারা যারা টাকা দিতে পারে এমন ৩০ জনের মতো লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। এনডিসি ইসমাইল জবিউল্লাহকে বললাম সার্কিট হাউসে তাদের দাওয়াত দেবেন, লাঞ্চ অ্যান্ড ডিসকাশন।
>
> নির্দিষ্ট দিনে আমি গেলাম। জবিউল্লাহ বলল, নৌমন্ত্রী তো আসেননি। আমি সার্কিট হাউসে ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে কথা বললাম। বললাম, আপনারা জিয়া সাহেবের নির্বাচনে সাহায্য করেছেন, আমার নির্বাচনেও সাহায্য করেছেন। এখন আপনাদের কী সমস্যা, তা জানতে চাই। ঢাকায় গিয়ে সমাধান নিয়ে আসব।
>
> ঢাকায় নুরুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। বললেন, আরিফ, জিয়া সাহেব তো আমার জান খেয়ে ফেলছে। তুমি আবার ওদের ডাকো। আমি আসব।
>
> জবিউল্লাহকে দিয়ে আবার ব্যবসায়ী নেতাদের ডাকলাম। নুরুল হক এবারও এলেন না। ঢাকায় গিয়ে নুরুল হককে নিয়ে জিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। নুরুল হক জিয়াকে বললেন, দুজন ব্যবসায়ী নেতা এসে আপনার হাতে টাকা দেবে, আমরা দুজন উইটনেস থাকব। জিয়া সাহেব বললেন, 'ইউ ওয়ান্ট মি টু ডু দ্য ডার্টি জব? আই উইল নট ডু ইট।' পরে নুরুল হক প্রাইভেট ক্যাপাসিটিতে হয়তো উনাদের ডেকে এনেছিলেন। আমি জানি না। চাঁদা-টাদা যা তোলা হতো, সরাসরি তা পার্টি অফিসে যেত। টাকা-পয়সা জামালউদ্দিন সাহেবই বেশি তুলতেন।[১৭]

জিয়া এভাবেই অন্যদের দিয়ে নানান কাজ করাতেন। কেউ ওজর-আপত্তি করলে বা কথা না শুনলে তাঁকে ফাঁসিয়ে দিতেন। সবার ওপরেই তাঁর গোয়েন্দা

নজরদারি ছিল। এ প্রসঙ্গে উপপ্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদের অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। চাঁদা তোলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> মাসে তিন লাখ করে দশজন মন্ত্রীকে চাঁদা দিতে বলা হয়েছিল। আমার নামও দেওয়া হয়েছিল তাতে। কিন্তু আমি এভাবে চাঁদা দেওয়ার পদ্ধতির বিরোধিতা করেছিলাম। প্রেসিডেন্ট জিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, তর্ক করেছি। রাজনীতিতে অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তাই নিজের ফর্মুলাও দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা গৃহীত হয়নি। যাক, আমি আর শেষ পর্যন্ত চাঁদা দেইনি। জাহাজমন্ত্রী নুরুল হকও চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন। এই অবাধ্যতা প্রেসিডেন্ট জিয়ার পছন্দ হয়নি।[১৮]

প্রশাসনের সামরিকায়ন

জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে 'জাতীয়তাবাদী'দের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৯৭৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সামরিক আইন উঠে যাওয়ার পর সর্বতোভাবে শুরু হলো বিএনপি সরকার। বিএনপির মাধ্যমে এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের একটা ধারা চালু হলেও তা ছিল দুর্বল। জিয়া ছিলেন একাধারে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি অতিমাত্রায় আমলাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। অন্যদিকে, রাজনীতিবিদেরা ছিলেন তাঁর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

প্রশাসনের সব স্তরে আমলাদের দাপট ছিল। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত যাঁরা উপদেষ্টা বা মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমলাদের ছিল ছড়াছড়ি। একটি লেখায় অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ওই সময়ে উপদেষ্টা ও মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন ১৩ জন সামরিক কর্মকর্তা, আটজন অসামরিক কর্মকর্তা, ১৮ জন শিল্পপতি ও ৩১ জন দলছুট রাজনীতিবিদ।[১৯] ১৯৭৯ সালে সচিবালয়ে নীতি প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সিনিয়র পলিসি পুলে ৬২৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২৫ জন ছিলেন সামরিক বাহিনীর। ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে জেলা পর্যায়ে ৪০ জন পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের মধ্যে ২২ জন ছিলেন সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা। আওয়ামী লীগের শাসনামলে পরিকল্পনা কমিশন চালাতেন শিক্ষাবিদেরা। জিয়ার সময় অবস্থা পাল্টে গেল। কমিশনের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে আমলারা নিয়োগ পেলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সামরিক বাহিনীর অনেক কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ১২ জন ছিলেন পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত।

জিয়াউর রহমানের প্রশাসন ছিল প্রকৃতপক্ষে সামরিক ও অসামরিক আমলাদের যুক্তফ্রন্ট।[২০]

সামরিক আইন উঠে যাওয়ার পর বিরোধী দলগুলো সামরিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে। কোনো কোনো দল সরকার উৎখাতেরও ডাক দেয়। তারা জিয়াবিরোধী রাজনৈতিক জোট তৈরির চেষ্টা চালায়। এদের অনেকেই দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনর্বহালের দাবি জানায়। ১১-১৪ মার্চ (১৯৭৯) আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির এক বর্ধিত সভার প্রস্তাবে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য 'জনগণ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলো'কে আহ্বান জানায়। এক প্রস্তাবে তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল করে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানায়।[২১]

১৯৭৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পাঁচটি বাম দল মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে একটি জোট তৈরি করে। সাম্যবাদী দল, ন্যাপ (নূরুর রহমান ও আনোয়ার জাহিদের গ্রুপ), ইউপিপি, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন এবং আবদুল মতিনের নেতৃত্বে কয়েকটি গ্রুপের সমন্বয়ে তৈরি 'গণফ্রন্ট' এই জোটে শরিক হয়। ১৯৮০ সালের শুরুর দিকে ১০টি রাজনৈতিক দল আরেকটি জোট তৈরি করে। এই জোটের শরিকদের মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগ (মালেক), আওয়ামী লীগ (মিজান), জাসদ, সিপিবি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর), ন্যাপ (হারুন), জাতীয় একতা পার্টি, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন (ইউপিপি থেকে বেরিয়ে আসা একটি গ্রুপ), শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ও গণ-আজাদী লীগ। এই জোটের প্রধান কাজ ছিল জিয়া সরকারের সমালোচনা করে মাঝেমধ্যে জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করা। জোটের কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল না। তারা মাঝেমধ্যে হরতালও ডাকত। ৩১ জানুয়ারি (১৯৮০) পুলিশের গুলিতে রাজশাহী জেলে তিনজন বন্দী নিহত হলে তারা দুই দিন হরতাল পালন করে।[২২]

এ সময় সিপিবির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ একটা বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিপদে পড়েন। তখন আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যপুষ্ট সরকার ছিল। দলের এক সভায় ফরহাদ আফগানিস্তানের সরকারের প্রতি সংহতি জানান। আর যায় কোথায়। তিনি গ্রেপ্তার হয়ে অনেক দিন বিনা বিচারে জেলে থাকলেন।

মোহাম্মদ ফরহাদের বক্তৃতার বিষয় নিয়ে নানান রকম প্রচার ছিল। গণমাধ্যমে তা খণ্ডিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮০ সালের ১৩ জানুয়ারি বিকেলে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে সিপিবি আয়োজিত এক জনসভায় মোহাম্মদ ফরহাদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানান বিষয় নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের নেতিবাচক

কর্মকাণ্ড, জিয়াউর রহমানের 'বাড়াবাড়ি' এবং মার্কিন ও চীনা নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। বক্তৃতায় আফগানিস্তান প্রসঙ্গ ছিল। বাংলাদেশের 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে' হুঁশিয়ার করে দিয়ে ফরহাদ বলেন :

...কাবুলে বিপ্লব হয়েছে বাংলাদেশেও বিপ্লব ঘটিয়ে দেব।...

...যার জমি ছিল না কৃষক ক্ষেতমজুর তারা জমির মালিক হয়েছে। নারী জাতি মুক্তি পেয়েছে। যে দেশের মেয়েকে বিক্রি করা হতো আগে, আজকে নারী জাতি সেখানে মুক্তি পেয়েছে। শিক্ষা ছিল না, আজ ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো বর্ষিত হয়েছে। আফগানিস্তানে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। তাই আমাদের পার্টি নীতি নিয়েছে যে, আফগানিস্তানের বিপ্লবকে সমর্থন করব। কেন? তার কারণ ওই রকম আর একটি বিপ্লব না করলে আমাদের দেশের মানুষের সমস্যার সমাধান হবে না।...আফগানিস্তানের এই বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য চীন, আমেরিকা আদাপানি খেয়ে লেগেছে। আর লেলিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানকে।

...১৯৭১ সালে ভারতবর্ষ এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই আজকে আফগানের বিপ্লবী জনগণ, আফগানের বিপ্লবী সরকার যখন সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য নিয়েছে, সেই সাহায্যকে সঠিক মনে করি এবং সমর্থন দিয়েছি। আফগানের বিপ্লবকে সমর্থন করেছি। সমর্থন করেছি সোভিয়েতের সাহায্য, যেখানে করব একশত বার হাজার বার করব কেউ ঠেকাতে পারবে না।...

...আজকে মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করেছে আমেরিকা, অজুহাত সৃষ্টি করেছে চীন। আর তাদের দালালরা এ দেশে ত্রাস সৃষ্টি করতে চায়। তারা কি চায়, আফগানিস্তানের বিপ্লবকে ধ্বংস করতে চায়। তারা চায় বাংলাদেশকে একটি তথাকথিত পাকিস্তান সৃষ্টি করতে।...

জিয়া সাহেব, অনেক বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন আপনি। আপনি মেজর ছিলেন পাকিস্তান আমলে। যদি পাকিস্তান থাকত, এত বছরে আপনি কর্নেল হতে পারতেন কিনা আমাদের সন্দেহ আছে। সেইখানে আজকে আপনি লেফটেনেন্ট জেনারেল হয়েছেন স্বঘোষিতভাবে। আপনি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে বলেই আজকে আপনি আংগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন। আর বাংলাদেশের কৃষক কিছু পাচ্ছে না।...কেমন করে বাংলাদেশ হলো আপনার কতটুকু অবদান ছিল। আপনি বলতে পারেন যে আমি ঘোষণা করেছি।...কিন্তু আমি এ কথা বলব মুক্তির জন্য যে জোয়ার এসেছিল, সেই জোয়ারে খড়ের কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিলেন আপনিও সেই দিন ভাসতে ভাসতে ইন্দিরা গান্ধীর ভারতে। আর ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার চুক্তি না থাকত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে প্রত্যক্ষ সমর্থন না করত, আমেরিকার ৭ম নৌবহরের বিরুদ্ধে যদি রাশিয়ার বিশতম নৌবহর ডুবুজাহাজ

আটকে না দিত আমেরিকাকে...আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা? হত না। হতেন কি আপনি প্রেসিডেন্ট, হতেন না। তাই আজকে আপনি কোন বৈদেশিক নীতি নিয়েছেন। আপনার বৈদেশিক নীতি, সত্যিকারের বন্ধুদের কাছ থেকে বাংলাদেশকে আজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে আরম্ভ করেছেন।...তাই জিয়া সাহেব, এই নীতি যদি চলতে থাকে তবে সংগ্রাম সংগ্রাম সেই সংগ্রাম শুরু হবে বাংলাদেশে।...[২৩]

মোহাম্মদ ফরহাদকে এক নম্বর আসামি করে ১৬ মার্চ রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়। শহীদ মিনারের সভায় সিপিবির সভাপতি মণি সিংহও বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁকে করা হয় দ্বিতীয় আসামি। অভিযোগপত্রে বলা হয়, দেশে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা সৃষ্টি ও 'অসন্তোষ উস্কিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা' হয়েছে। এ ছাড়া তিনি 'রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে মানহানিজনক, আপত্তিকর এবং নিন্দাসূচক' মন্তব্য করেছেন। পরে মণি সিংহের নাম অভিযোগপত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়।[২৪]

১০-দলীয় জোটে সমস্যা ছিল। আওয়ামী লীগের সঙ্গে একই জোটে থাকা কর্মীপর্যায়ে অনেক দলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। জোটের স্বল্পকালীন অস্তিত্বের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও জাসদের কর্মীদের মধ্যে কয়েক দফা মারপিট হয়েছিল।[২৫]

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর সামরিক বাহিনী ক্ষমতার বারান্দায় হাঁটাচলা শুরু করে জোর কদমে। জিয়া নিজে ছিলেন সেনাশাসক। সেনাবাহিনী ছিল তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি। কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীকে রাজনীতির বাইরে রাখতে চাইলেন। বিএনপি তৈরি হওয়ার পর থেকে রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ফিসফাস শুরু হয়ে যায়। তাঁরা দুর্নীতি ও অদক্ষতার অভিযোগ তুলে সরকারের সমালোচনা করতেন। তাঁদের কথা হলো, 'গণতন্ত্র', 'রাজনৈতিক দল' ইত্যাদি করে জিয়া ভুল করেছেন। জিয়াকে সরিয়ে ক্ষমতা দখলের চিন্তাও করেছেন কেউ কেউ।[২৬] ১৯৮০ সালের ১৭ জুন বগুড়া সেনানিবাসে একটা অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়। এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন লে. কর্নেল নূরন্নবী খান ও লে. কর্নেল দিদারুল আলম। দিদার জাসদের সহযোগিতায় পালিয়ে কলকাতা চলে যান। নূরন্নবী খান ধরা পড়েন। দিদার দেশে ফিরে এসে গ্রেপ্তার হন। বিচারে দিদারের ১০ বছরের এবং নূরন্নবীর এক বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। একই মামলায় জাসদ-ছাত্রলীগের সাবেক নেতা মোশাররফ হোসেন বীর প্রতীকেরও সাজা হয়।[২৭]

সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ হয়ে জেনারেল এরশাদ কৌশলে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে থাকেন। তাঁর পছন্দের লোকদের তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল

করেন। স্পর্শকাতর জায়গাগুলো থেকে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেন তিনি। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে ঢোকান নিজের লোক। তাঁদের মধ্যে মেজর জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরী ছিলেন অন্যতম। বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্যও তিনি নিজের পছন্দমাফিক লোক পাঠাতেন। সেনাবাহিনীতে তিনি অনুগত লোকদের নিয়ে একটা প্রভাববলয় তৈরি করতে সমর্থ হন। তাঁর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের পদ-পদবি ও কর্মক্ষেত্র নিয়ে অনেক ক্ষোভ ছিল। তাঁদের অনেককেই তিনি ঢাকা ও অন্যান্য জায়গা থেকে সরিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিকূল পরিবেশে পাঠিয়ে দেন।[২৮]

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধরন

মন্ত্রিপরিষদের সভায় জিয়াউর রহমান সবার কাছে মতামত চাইতেন। মন্ত্রীরা অনেক সময় খোলামেলা মত দিলেও, জিয়া অন্য কিছু বললে তাঁরাও জিয়ার সুরে সুর মেলাতেন। জিয়ার মন্ত্রিসভার ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী আরিফ মঈনুদ্দিন একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন :

> ১৯৭৯ সালের শেষের দিকে। আমি তখন জুনিয়র মিনিস্টার। কেবিনেট মিটিংয়ে বেশি কথা বলতাম না, আনলেস আই ওয়াজ আস্কড টু। মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন সম্পর্কে কথা উঠল, শাহ আজিজুর রহমান কিছু বলতে পারতেছে না। জিয়া সাহেব বললেন, 'মি. প্রাইম মিনিস্টার, হোয়াই ইউ হ্যাভ নট কাম উইথ ইয়োর হোমওয়ার্ক? নেক্সট টাইম ইউ মাস্ট কাম প্রিপেয়ার্ড।' ১৯৮০ সালের মার্চে একটা কেবিনেট মিটিং হলো। এজেন্ডা ছিল, একটা নতুন মন্ত্রণালয় হবে, মিনিস্ট্রি অব কালচারাল অ্যাফেয়ার্স। জিয়া সাহেব বললেন, বিদেশে কালচারাল অ্যাকটিভিটি কত সুন্দর, কত প্রেজেন্টেবল! থাইল্যান্ড দেখেন, ইন্ডিয়া দেখেন। অন্যান্য জায়গায় দেখেন। কত সুন্দর আর্ট অ্যান্ড কালচার! আমাদের এখানে হাত নাড়তেছে, কোনো কিছুই ডেভেলপ হচ্ছে না। সুতরাং নতুন একটা মিনিস্ট্রি দরকার। আর্ট-কালচার যেন ভালো করে চর্চা করা হয়। একটা মিনিস্ট্রি হলে ইট উইল বি ফোকাসড। হোয়াট ইউ সে?' তখন ওনার ডানে-বাঁয়ে এভরিবডি অপোজড ইট, সেয়িং দ্যাট ইট উইল ইনভলভ লট অব মানি। মানে অল নেগেটিভ। সবার কথা শেষ হলো। প্রেসিডেন্ট তখন বললেন, 'ইউ আর অল ব্লাডি চিকেন হার্টেড। কোনো কিছু করতে গেলেই আপনারা খালি নেগেটিভ নেগেটিভ। আরে কত পয়সা খরচ হবে? আর্ট-কালচার যদি ফ্লারিশ হয়, আমাদের আর্ট-কালচার দেখার জন্য বাইরে থেকে লোক আসবে। উই উইল আর্ন আ লট অব ফরেন এক্সচেঞ্জ। আপনারা যাঁরা অপোজ করেছেন, বিসমিল্লাহ করে এটাকে জাস্টিফাই করে বলেন। পজিটিভ

বানায়া নিয়া আসেন।' তখন সবাই এটা জাস্টিফাই করল। বলতে থাকল, ভালো কেন হবে।[২৯]

জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে নাম লেখালেও তখনো পুরোদস্তুর রাজনীতিবিদ হয়ে উঠতে পারেননি। সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তেমন রাখঢাক করতেন না। কাজকর্মে পেশাদারির ওপর জোর দিতেন। কোনো কিছু পছন্দ না হলে সটান মুখের ওপর তাঁর অপছন্দের কথা বলে দিতেন। অনেক সময় কড়া ধাঁচের মন্তব্য করতেন। আরিফ মঈনুদ্দীন এরকম একটা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন :

> ১৯৮১ সালের সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাস। প্রেসিডেন্ট জিয়া ঘন ঘন গিনি যেতেন, টু মিট প্রেসিডেন্ট সেকুতুরে ইন কানেকশন উইথ হিজ রোল অ্যাজ আরবিটার অব ইরান-ইরাক ওয়ার। একবার গিনি থেকে ঢাকায় ফিরে স্ট্রেইট ফ্রম এয়ারপোর্ট সাড়ে সাতটায় বঙ্গভবনে এলেন। স্পেশাল মিটিং অব একনেক। এজেন্ডা ছিল সিলেটে নতুন একটা ডমেস্টিক টার্মিনাল হবে। ওটা কীভাবে হবে, কী রকম খরচ ইত্যাদি। মিটিংয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়া, ড. এম এন হুদা—বিকজ হি ওয়াজ কনসার্নড মিনিস্টার ফর ফিন্যান্স অ্যান্ড প্ল্যানিং, উইং কমান্ডার হামিদউল্লাহ, আমি, সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টার কে এম ওবায়দুর রহমান, সিভিল এভিয়েশনের স্টাফ—স্পেশালি ডিজি অব সিভিল এভিয়েশন উইং কমান্ডার এনায়েতউল্লাহ। প্রেসিডেন্ট সাহেব মিটিং শুরু করলেন। ওবায়দুর রহমান সাহেবকে বললেন, এজেন্ডা কী? ওবায়দুর রহমান বললেন, সিলেটে ডমেস্টিক টার্মিনাল বানাবেন। 'ঠিক আছে শুরু করা যাক।' ওবায়দুর রহমান ডিজির দিকে তাকালেন—প্রেসিডেন্টকে ব্রিফ করার ইশারা দিলেন। প্রেসিডেন্ট রেগে গেলেন। 'মিস্টার মিনিস্টার ফর সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম, ইউ অ্যান্ড ইয়োর ব্লাডি মিনিস্ট্রি অব টু বোয়িংস অ্যান্ড ফোর ফকারস ক্যান নট ইভেন রান দিজ ফিউ প্লেনস। কিছুদিন পর লোকজন রাস্তায় আপনাদের পেটাবে এবং এই হোয়াইট স্যুট-রেডটাই নিয়ে আপনি কী করেন লোকজন দেখবে।' তখন উইং কমান্ডার হামিদউল্লাহ বললেন, 'এটার কস্ট কী রকম'? ডিজি বললেন, 'নাইন হানড্রেড সিক্সটি টাকা পার স্কয়ার ফিট।' হামিদউল্লাহ সাহেব বললেন, 'কেন, এর অর্ধেক দিয়ে তো গুলশানে এখন মডার্ন বাড়িঘর বানাচ্ছে। এত খরচ কেন?' ফিন্যান্স মিনিস্টার পরিবেশ হালকা করার জন্য বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, কস্ট যদি বেশি হয় আমরা এটা রিভিউ করে দেখব।' প্রেসিডেন্ট বললেন, 'অফিশিয়ালস প্লিজ লিভ।' কর্মকর্তারা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। তখন প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ইউ নো, লাস্ট টাইম হোয়েন আই ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম গিনি, আই ওয়াজ সার্ভড রটেন চিকেন ইন দ্য এয়ারক্রাফট। আপনাদের নিয়ে আর পারা গেল না। দিস মিটিং ইজ ওভার।'[৩০]

তরুণদের সম্পৃক্ত করা

জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে তরুণদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সিনিয়র লেকচারার (সহকারী অধ্যাপক) আরিফ মঈনুদ্দীনকে। ১৯৭৭ সালের নভেম্বরে আরিফ চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে একটা ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। সমাবেশে যোগ দিতে জিয়াকে অনুরোধ জানালে তিনি বলেন, 'আমি তো ইউনিফর্মে আছি, পারব না।' জিয়া সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার এবং তথ্য উপদেষ্টা শামসুল হুদা চৌধুরীকে পাঠান। ১৯৭৮ সালের ২৭ মে আরিফ চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক যুবদলের ব্যানারে একটা পরিচিতি সভার আয়োজন করেন। ওই সভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যোগ দিয়েছিলেন। জিয়া আরিফকে বলেন, দেশে স্বনির্ভর আন্দোলন চলছে, ছেলেদের একবার 'উলশী-যদুনাথপুর প্রকল্প এলাকা দেখিয়ে আনুন। সেখানে খাল কাটা হচ্ছে। সেচের ব্যবস্থা হবে। দেশে ধানের উৎপাদন বাড়বে।' আরিফ ৪০ জন তরুণকে বাছাই করলেন! এরা সবাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এদের মধ্যে পাঁচজন মেয়ে। সবাইকে বিমানে করে তিনি যশোর নিয়ে গেলেন। যশোরের জেলা প্রশাসক ছিলেন মহীউদ্দীন খান আলমগীর (পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের নেতা ও মন্ত্রী)। তিনি খুব যত্ন করে

চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক যুবদলের সভায় বক্তৃতা করছেন আরিফ মঈনুদ্দীন। মঞ্চে বসে আছেন জিয়াউর রহমান, কাজী জাফর আহমদ ও জামালউদ্দিন আহমদ

সবাইকে প্রকল্প এলাকা ঘুরিয়ে দেখালেন। সেখানে আঁকাবাঁকা নদীতে কয়েকটি লুপ কেটে সোজা করা হয়েছিল। পরে ছাত্রদের নিয়ে আরিফ ঢাকায় বঙ্গভবনে জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যান। ছাত্ররা সবাই এ ধরনের একটা অভিজ্ঞতা পেয়ে খুশি। জিয়া বললেন, 'এদের বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়ে যান।' ছাত্রদের বললেন, 'টিভিতে আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। ভালো হলে বলবেন ভালো, খারাপ হলে খারাপ।'[৩১]

শিশু-কিশোরদের মধ্য থেকে প্রতিভা খুঁজে বের করার জন্য জিয়া 'ট্যালেন্ট

যশোরে উলশি যদুনাথপুর প্রকল্পের খাল খনন অভিযানে কোদাল হাতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। পেছনে কর্নেল অলি আহমদ

হান্ট' শুরু করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'নতুন কুঁড়ি' অনুষ্ঠানটি এ ক্ষেত্রে কাজে লাগে। দীবা, বেবী নাজনীন ও তারানা হালিমের মতো কয়েকজন শিশু-কিশোর দেশব্যাপী পরিচিতি পান। রাষ্ট্রপতি জিয়ার উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে চীনে একটা সাংস্কৃতিক দল পাঠানো হয়েছিল। তারানা হালিম এই দলে ছিলেন।[৩২]

দেশের তরুণ সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা এবং তাদের উন্নয়নের ধারণা দেওয়ার জন্য জিয়াউর রহমান এক অভিনব উপায় বের করলেন। হজযাত্রী আনা-নেওয়ার জন্য 'হিজবুল বাহার' নামে একটা জাহাজ ছিল। হজের মৌসুম ছাড়া অন্য সময় এটা চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে অলস পড়ে থাকত। জিয়া একটা নৌবিহারের আয়োজন করলেন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পাঁচ শর মতো নেতা-কর্মীসহ প্রায় ১৬০০ তরুণ এতে যোগ দেন। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোতে যাঁরা মেধাতালিকার শীর্ষে ছিলেন, তাঁদের নিয়েই ছিল এই আয়োজন। সবাই জাহাজে উঠলেন ১৯৮১ সালের ১৮ জানুয়ারি। ১৯ জানুয়ারি সকাল নয়টার দিকে জিয়া জাহাজে উঠলেন। 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' গানটির রেকর্ড বাজিয়ে জাহাজের যাত্রা শুরু হলো বঙ্গোপসাগরে। জাহাজের সামনে ও পেছনে নৌবাহিনীর একটি করে ফ্রিগেট আর তিনটি করে গানবোট সঙ্গে চলছে। সন্ধ্যায় জিয়া কেক কেটে তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপন করলেন। অন্যদের এটা জানা ছিল না। কয়েকজন শিল্পী ছিলেন এই বহরে। ফকির আলমগীর একটা গান গেয়ে শোনালেন। এরপর ফেরদৌস ওয়াহিদের পালা। তিনি যন্ত্রে টুংটাং করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে জিয়া ঘোষণা করলেন, 'এবার গান গেয়ে শোনাবেন অধ্যাপক ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী।' ডা. চৌধুরী অপ্রস্তুত হলেন। বললেন, 'এটা জেনারেল জিয়াউর রহমানের কন্সপিরেসি।' জিয়া দমবার পাত্র নন। জোর দিয়ে বললেন, 'আপনি ভালো গান, আমি জানি।' ডা. চৌধুরী একটা গান গাইলেন, 'একগোছা রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে বললাম, চললাম...'। জিয়ার একান্ত সচিব লে. কর্নেল মাহফুজ তাঁর কানে কানে কী একটা বললেন। জিয়া বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইসলামি গানও হবে।' ওটা ছিল শবে বরাতের রাত। জাহাজে ফসিহউদ্দিন মাহতাবসহ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ঢাকার বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান। কয়েকজন সমুদ্রবিজ্ঞানীও ছিলেন। তাঁরা সাগরতলের সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার নিয়ে তরুণদের অনেক কথা বললেন। তিন দিন ধরে বেড়ানো, খাওয়াদাওয়া ও আলোচনা চলল। জিয়া একটা ফ্রিগেটে করে ২১ জানুয়ারি ফিরে যান। বাকি সবাইকে নিয়ে জাহাজ চট্টগ্রামে ফিরে আসে ২২ জানুয়ারি। কোনো রকম রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি।[৩৩]

সামরিক বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার যে নীতি জিয়া গ্রহণ করেছিলেন, তার ফলে অনেক মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা ক্ষুব্ধ হন। একাত্তরে যারা পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী ছিল, তাদের সরকারে স্থান দেওয়াটাও অনেকে পছন্দ করেননি। এরশাদকে সেনাপ্রধান করায় মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী অতটা না হলেও মেজর জেনারেল মঞ্জুর হতাশ ও ক্ষুব্ধ হন। মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকিস্তান-প্রত্যাগত কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেড়েই যাচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে জিয়ার ওপর চাপ ছিল দেশে সামরিক আইন জারি করে একটা বিপ্লবী পরিষদের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করার। জেনারেল মঞ্জুর 'শোষণহীন' সমাজ তৈরির কথা বলতেন প্রকাশ্যেই। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সফররত অবস্থায় সার্কিট হাউসে ভোরবেলায় জিয়া একদল মধ্যপর্যায়ের সেনা কর্মকর্তার হাতে নিহত হন।[৩৪]

জিয়া হত্যার পূর্বাপর নিয়ে *প্রোবনিউজ*-এর প্রধান সম্পাদক ইরতিজা নাসিম আলীর একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট ১৯৯৪ সালের মে মাসে মতিউর রহমান সম্পাদিত দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এ ধারাবাহিকভাবে আট কিস্তিতে ছাপা হয়েছিল। এই রিপোর্টে জানা যায় যে চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে ২৯ ও ৩০ নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাত সাড়ে তিনটায় তিনটি গাড়ি নিয়ে ১৬ জন সেনা কর্মকর্তা প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে রওনা হন। প্রেসিডেন্ট জিয়া তখন সার্কিট হাউসে ঘুমিয়ে। গুলি করতে করতে তাঁদের একটি দল দোতলায় উঠে যায়। গোলাগুলির শব্দ শুনে বাইরে কী হচ্ছে দরজা ফাঁক করে দেখার চেষ্টা করলেন জিয়া। গর্জে উঠল আততায়ীর হাতের অস্ত্র। নয় মিনিটেই অপারেশন শেষ। ভোর সাড়ে চারটার কিছু পরে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ২৪ ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরকে মেজর মোজাফফর হোসেন ফোন করে জানালেন, 'দ্য প্রেসিডেন্ট হ্যাজ বিন কিল্ড।' এটা শুনেই মঞ্জুর চুপচাপ বসে থাকেন কিছুক্ষণ। একটু ধাতস্থ হয়ে মোজাফফরকে বললেন, সব সিনিয়র সামরিক অফিসার যেন সকাল সাতটায় তাঁর দপ্তরে হাজির থাকে। যথাসময়ে উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে মঞ্জুর বললেন, কিছু সেনা অফিসার প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করেছে। এর পেছনে অবশ্যই অফিসারদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ কাজ করেছে। 'ঘটনা যখন ঘটেই গেছে, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'[৩৫]

দুই দিনের মধ্যেই এই 'বিদ্রোহের' অবসান হয়। ১ জুন রাত আড়াইটায় মঞ্জুর কয়েকজন সহযোগীসহ সেনানিবাস ছেড়ে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হন।

পথে হাটহাজারী থানার একদল পুলিশের হাতে তিনি ধরা পড়েন। তাঁকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে এনে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা গ্রেপ্তার হন। কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করেন। বিদ্রোহীদের অন্যতম মেজর মোজাফফর হোসেন ও মেজর সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ খালেদ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।[৩৬]

মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী ১৯৮৯-৯৩ সালে থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ওই সময় তাঁর সঙ্গে মোজাফফর ও খালেদ দেখা করলে তিনি তাঁদের কাছ থেকে জিয়া-মঞ্জুর হত্যাকাণ্ডের যে বিবরণ শোনেন, তা হলো : মতি, মাহবুব ও খালেদের নেতৃত্বে ২৪ ডিভিশনের কয়েকজন অফিসার জেনারেল মঞ্জুরের অজান্তে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সার্কিট হাউস থেকে অপহরণ করে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন জিয়াকে চাপ দিয়ে বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়, বিশেষ করে সেনাপ্রধান এরশাদসহ অন্যান্য দুর্নীতিবাজ সামরিক অফিসার এবং পাকিস্তানপন্থী শাহ আজিজ ও অন্য দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করানো। কারণ এরশাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের হয়রানি নিয়ে জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। সার্কিট হাউসে ঢুকে লে. কর্নেল মতিউর রহমান মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে 'জিয়া কোথায়, জিয়া কোথায়' বলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে আসেন এবং পলকেই গজ খানেক সামনে থেকে স্টেনগানের এক ম্যাগাজিন গুলি জিয়ার ওপর চালিয়ে দেন। উপস্থিত অন্য অফিসাররা ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যায়। লে. কর্নেল মতিউর ও লে. কর্নেল মাহবুব পালিয়ে যাওয়ার সময় মানিকছড়ির কাছে গোলাগুলিতে নিহত হন। মোজাফফর ও খালেদ পালিয়ে যান।[৩৭]

৩০ মে ঢাকায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সম্মেলন হওয়ার এবং এতে জিয়াউর রহমানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। জিয়ার মৃত্যুসংবাদ শুনে সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়। ওই সময়ের ঘটনাবলির একটা চিত্র পাওয়া যায় ছাত্রদলের নেতা সাজ্জাদ হোসেনের বয়ান থেকে :

> ভোরে আমি শহীদুল্লাহ হল থেকে কয়েকজন সঙ্গীসহ গোলাপ শাহ মাজারের কাছে নিউ স্টার রেস্তোরাঁয় নাশতা খেতে গিয়েছিলাম। রেডিওতে জিয়া হত্যার খবর শুনে হলে ফিরে যাই। তারপর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হই মিন্টো রোডে ভাইস প্রেসিডেন্ট সাত্তারের বাড়ির উদ্দেশে। জিপিওর মোড়ে আসতেই দেখলাম অনেক লোক জড়ো হয়েছে। জালাল একটা স্লোগান দিল—এক জিয়ার রক্ত থেকে লক্ষ জিয়া জন্ম নিবে। কয়েক হাজার লোকের ভিড় জমে গেল। আমরা মিছিল করে মিন্টো রোড হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গেলাম।

তারপর জহুরুল হক হলে। এই প্রথম ছাত্রদলের মিছিল নিয়ে জহুর হলে ঢুকলাম। তারপর শহীদ মিনারে গিয়ে মিছিল শেষ হলো। সন্ধ্যায় ৩০টা বেবিট্যাক্সিতে 'তাহের মাইক' লাগিয়ে পরদিন ঢাকা স্টেডিয়ামে জিয়ার জানাজা হবে—এটা প্রচারের ব্যবস্থা করলাম। ইচ্ছে করেই 'গায়েবানা' শব্দটা ব্যবহার করিনি। ভেবেছিলাম, মানুষ মনে করবে জিয়ার লাশ এসে গেছে এবং তারা বেশি সংখ্যায় জানাজায় হাজির হবে।

সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে শামসুল হুদা চৌধুরী, শাহ আজিজ আর ডা. মতিন ছিলেন। তাঁরা বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ডা. খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে ডেকে এনে হম্বিতম্বি করলেন—কার হুকুমে জানাজার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে? তাঁরা বললেন, 'ক্যান্টনমেন্টগুলোর পরিস্থিতি আমরা জানি না, বিশেষ করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট জানাজায় যাবেন না।'

৩১ মে সকাল নয়টায় ঢাকা স্টেডিয়ামে জানাজা হলো। মোনাজাতের ঠিক আগের মুহূর্তে জাস্টিস সাত্তার এসে উপস্থিত হলেন। তখন এটা অফিশিয়াল জানাজা হয়ে গেল। জিয়ার লাশ ঢাকায় আসার পর মানিক মিয়া এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হলো স্মরণকালের সবচেয়ে বড় জানাজা।[৩৮]

জিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর কার্যকারণ নিয়ে পরবর্তী সময়ে অনেক লেখাজোকা হয়েছে। জিয়ার অন্যতম সহযোগী মওদুদ আহমদের পর্যবেক্ষণ হলো, যাঁদের ওপর জিয়া বেশি নির্ভর করেছিলেন, তাঁরা যদি তাঁদের আনুগত্য বজায় রাখতেন, তাহলে জিয়ার এরকম মর্মান্তিক পরিণতি হতো না। তাঁর মতে, দুই পক্ষই (মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা) তাঁর পতন চেয়েছে, এক পক্ষ কাজটা করেছে, লাভ গেছে অন্য পক্ষের ঘরে। দাবার চালে একদল জিতেছে, অন্য দলটি হেরেছে।[৩৯]

জিয়া হত্যার সুযোগে জেনারেল এরশাদ ও উঁচু পদের কয়েকজন অমুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগেন। মুক্তিযোদ্ধারা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। 'জিয়া হত্যাকারীদের' তড়িঘড়ি করে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। বিষয়টি খুব কাছে থেকে দেখেছেন সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী। তাঁর ভাষ্য এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

তদন্ত কমিটি গঠন করার সময়...আমি প্রস্তাব দিই যে, কী কারণে অফিসাররা ওই বিদ্রোহ করল, তাও এ তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অকারণে কখনো বিদ্রোহ হয় না। কিন্তু...এরশাদ আমার ওই প্রস্তাব অনুমোদন করেননি। তাই অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল হিসেবে ওই তদন্তের আদেশে আমার স্বাক্ষর থাকার কথা থাকলেও আমি তা করতে অস্বীকৃতি জানাই। ফলে জেনারেল এরশাদ নিজেই ওই তদন্ত আদেশে স্বাক্ষর করেন। খুব তাড়াহুড়ো করেই তদন্ত কমিটি

গঠিত হলো। তৎকালীন মেজর জেনারেল (বর্তমানে অব.) মোজাম্মেলের সভাপতিত্বে তদন্ত অনুষ্ঠিত হলো। তদন্তে ৩৩ জন অফিসার ও দুজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারকে কোর্ট মার্শাল করার জন্য সুপারিশ করা হলো। এঁরা প্রায় সবাই মুক্তিযোদ্ধা। তারপর তাঁদের কোর্ট মার্শালের জন্য একটি কোর্ট গঠন করা হলো। কোর্ট মার্শালের সভাপতি করা হলো তৎকালীন মেজর জেনারেল আব্দুর রহমানকে। সব আইনকানুন ও নিয়মনীতি ভঙ্গ করে চট্টগ্রামের বেসামরিক জেলখানায় বিচারকার্য চলে। অভিযুক্তদের ভালোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই বিচার করা হয়। তদন্তের সময় তাঁদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগও ওঠে। সামরিক আইন অনুযায়ী বেসামরিক আইনজীবীরাও এরকম কোর্ট মার্শালে অভিযুক্তদের পক্ষে কৌসুলি নিয়োজিত হতে পারেন। কিন্তু তাঁদের কোনোরূপ সুযোগ-সুবিধা না দিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছামতো সেনাবাহিনীর অফিসার দ্বারা অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করে দেন। এতে পরিষ্কারভাবেই প্রতীয়মান হয় যে আগে থেকেই এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এ প্রহসনের কোর্ট মার্শালে ১৩ জন অফিসারের ফাঁসি এবং ২৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৪০]

জিয়া হত্যার ষড়যন্ত্রে বিদেশি কোনো শক্তির ইন্ধন থাকতে পারে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন কেউ কেউ। এ ব্যাপারে লেখক-সাংবাদিক মাহফুজ উল্লাহর মন্তব্য ছিল :

> জিয়াউর রহমান নিহত হয়েছিলেন তাঁর প্রিয় সহকর্মী ও অনুগতদের হাতে। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। অতীতের ঘটনাবলির পর্যালোচনায় দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর প্রথমটি হচ্ছে ষড়যন্ত্র, অপরটি হচ্ছে সেনানায়ক থেকে তাঁর জননায়কে উত্তরণ। ষড়যন্ত্র তত্ত্বটিকে বহুল আলোচিত মনে হলেও এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবচিত্রের প্রতিফলন। এ ক্ষেত্রে কথাটিকে ষড়যন্ত্র না বলে একটি রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হওয়াকেও উল্লেখ করা যেতে পারে। জিয়াউর রহমানের একটি বড় অন্যায় ছিল তিনি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।...
>
> জিয়াউর রহমান কি ভারত ও আমেরিকাবিদ্বেষী ছিলেন? বিষয়টিকে এত সরলীকরণ করা সম্ভব নয়।...জিয়াউর রহমানের অনেক সিদ্ধান্ত প্রতিবেশী ভারতসহ অনেকের উষ্মার কারণ হয়েছিল।[৪১]

জিয়ানামা

অসামরিকায়ন

জিয়াউর রহমান যখন সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন, সামরিক বাহিনী তখন নানা উপদলে বিভক্ত। রাজনৈতিক দলগুলো ছিল বৈরী। জিয়া ভেবেছিলেন, সামরিক বাহিনীতে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে হবে এবং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে হলে অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। জিয়া এ ক্ষেত্রে সফল। সামরিক বাহিনীতে তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের উদ্যোগগুলো তিনি কঠোর হাতে দমন করেন এবং একটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগের আইনি ভিত্তি তৈরির চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে জিয়া তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, মেক্সিকোর প্লুতার্কো এলিয়াস কালেম ও লাজারো কার্দেনাস এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পার্ক চুং হি-এর পথ ধরে অসামরিক জনগোষ্ঠীর সমর্থন নিয়ে ক্ষমতার ভিত পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করেন। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সেনা-অভ্যুত্থান ঠেকানোর জন্যও জনভিত্তির দরকার ছিল।[১]

সামরিক জান্তা থেকে উঠে আসা রাজনীতিবিদ হিসেবে জিয়ার তৈরি বিএনপিকে তুলনা করা চলে তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের গড়া রিপাবলিকান পিপলস পার্টি, মেক্সিকোর জেনারেল কালেমের ন্যাশনাল রেভলিউশনারি পার্টি, দক্ষিণ কোরিয়ার পার্ক চুং হি'র ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান পার্টি এবং জেনারেল চুন দু হুয়ানের ডেমোক্রেটিক জাস্টিস পার্টির সঙ্গে।[২]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জেনারেল জিয়াউর রহমানের উত্থান এবং এর মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ববাদী ভূমিকার পেছনে তিনটি কারণ কাজ করেছে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ উল্লেখ করেছেন। কারণগুলো হলো :

(১) আওয়ামী লীগের শাসনামলের 'দুর্নীতি ও দুঃশাসন' থেকে দেশকে বাঁচানো;

(২) দুর্বল ও ভঙ্গুর রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফলে তৈরি হওয়া শূন্যতা পূরণ; এবং

(৩) সামরিক বাহিনীর গোষ্ঠীগত স্বার্থ দেখভাল করা।[৩]

শুরুতে সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য দৃশ্যমান হলেও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরুর চূড়ান্ত পর্যায়ে জিয়া সামরিক বাহিনীকে নেপথ্যে ঠেলে দেন। ওই সময় রাজনৈতিক দলগুলো ছিল বিভক্ত এবং তাদের প্রচারণা ছিল নেতিবাচক। কোনো দলের ইশতেহারে বা কথাবার্তায় নতুন চিন্তাভাবনা ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছিল নানান রকমের বিভক্তি। বিরোধী শিবিরের এই বিভক্তির সুযোগ নিয়ে বিএনপি একক বিকল্প হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়।[৪]

বিএনপি তৈরির মাধ্যমে জিয়া সামরিক বাহিনীর বাইরে ক্ষমতার ভিত তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার পরও তাঁকে সামরিক কমান্ডারদের আস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। সামরিক বাজেট বাড়িয়ে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা রাখার সুযোগ দিয়ে জিয়া একটা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। জিয়া রাজনৈতিক দল তৈরিতে মনোযোগ দেওয়ায় পুরোনো দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জিয়ার সঙ্গে অনেক সেনা কমান্ডারের দূরত্ব তৈরি হয়। আবার সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিভক্তি রয়ে গিয়েছিল। এরকম একটা পরিস্থিতিতে জিয়া নিহত হন। তাঁর মৃত্যু সামরিক বাহিনীর বিভক্তিরই প্রতিফলন।[৫]

বিএনপির দ্রুত বেড়ে ওঠার পথ অবশ্য তৈরি করে দিয়েছিল বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের অন্তঃকলহ। জিয়া সামরিক শাসন থেকে অসামরিক ব্যবস্থায় যাওয়ার জন্য যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, তা শেষ হয় ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। তবে ক্ষমতার অভিভাবক হিসেবে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা থেকে গিয়েছিল। সংসদ বহাল হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সামরিক-অসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রভাব ছিল।[৬]

বিএনপিতে নানা পেশার লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সামরিক বাহিনীর অনেক সাবেক কর্মকর্তা, অবসরপ্রাপ্ত অসামরিক আমলা, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, আইনজীবী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। এ ছাড়া ছিলেন পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দলের অনেক নেতা। মত ও পথের দিক থেকে এ ধরনের একটা 'বহুকেন্দ্রিক' প্ল্যাটফর্ম হয়েও একটা মতাদর্শকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক দল হতে পেরেছিল।[৭] এই মতাদর্শ শুধু আওয়ামী লীগবিরোধিতা ছিল না। 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' অনেক মত ও পথের মানুষকে একত্র করতে পেরেছিল। আওয়ামী লীগের অনেকেই নতুন এই দলের সঙ্গে ভিড়েছিলেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও রিয়াজউদ্দিন আহমদ (ভোলা মিয়া) আওয়ামী সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরা জিয়ার মন্ত্রিসভায়ও জায়গা পান। অধ্যাপক ইউসুফ আলী ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ

করেছিলেন। ১৯৭৯ সালের সংসদে নির্বাচিত না হয়েও তিনি মন্ত্রী হন। মুজিব সরকারের প্রতিমন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমানকেও জিয়া মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছিলেন।

জিয়া যেহেতু ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে বিএনপি তৈরি করেছিলেন, তাঁর অবর্তমানে দলটির টিকে থাকা না-থাকা নিয়ে অনেকের মধ্যে সন্দেহ ছিল। আইয়ুব খানের গড়া কনভেনশন মুসলিম লীগের এই অবস্থা হয়েছিল। দলটি আইয়ুবের পতনের পর দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যায়। বিএনপি সম্পর্কে সিপিবি একবার মন্তব্য করেছিল, 'এই দল এই সরকার থাকা পর্যন্ত আছে। এই সরকার বদল হলে এ দল থাকবে না বলে মনে হয়।'[৮] সিপিবির পূর্বাভাস ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি

দল ও সরকারে একই ব্যক্তি থাকলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় এবং এর ফলে দল ও সরকার উভয়েই সমস্যায় পড়তে পারে। এই বাস্তবতা মেনে নিয়েই আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে একটি বিধান রাখা হয়েছিল যে সরকারের মন্ত্রীরা দলের কর্মকর্তা থাকতে পারবেন না। এই নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রিপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশেও ১৯৭৪ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দলের সভাপতির পদ ছেড়ে দেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য এ এইচ এম কামারুজ্জামান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

বিএনপি যখন তৈরি হয়, তখনো এরকম চিন্তাভাবনা ছিল। বিএনপির স্থায়ী কমিটি ছিল সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কমিটি। এই কমিটির একটা অলিখিত নিয়ম ছিল, কেউ মন্ত্রী হলে তাঁকে স্থায়ী কমিটির সদস্যপদ ছেড়ে দিতে হতো। অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী জিয়া সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন। তিনি উপপ্রধানমন্ত্রীর পদেও বহাল ছিলেন। বিএনপির মহাসচিব নিযুক্ত হওয়ার পর ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।[৯] তবে এই নিয়মটি অনেকেই মানেননি। দলের গঠনতন্ত্রেও এটা উল্লেখ করা হয়নি।

দলে জিয়ার একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা বাংলাদেশে কোনো নতুন প্রবণতা নয়। এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো প্রায় সবই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। দলের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি বলে কোনো কিছু নেই। কোনো দল ব্যানার নিয়ে মিছিল

করলে দলের নামের পাশে দলের সভাপতির ছবি এঁকে কিংবা সেঁটে দেওয়া হয়। কিন্তু দলের মধ্যে একজন সৎ মানুষ হিসেবে জিয়ার একটা ইতিবাচক ভাবমূর্তি ছিল। দলের তহবিল জোগাড় করার জন্য তিনি নানা উপায় বের করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে চাঁদার টাকা নিতেন না, সরাসরি দলের অফিসে পাঠিয়ে দিতেন।[১০] জিয়ার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন তাঁর একজন কড়া সমালোচক, জাসদের ঢাকা নগর গণবাহিনীর সাবেক কমান্ডার আনোয়ার হোসেন। তাঁর মতে :

> প্রথমত জিয়াকে সেনাবাহিনীতে একজন জাতীয়তাবাদী হিসেবে মনে করা হতো। দ্বিতীয়ত, বেতারে আপতিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপাঠের সুবাদে মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে পরিচিত সেনানায়কে পরিণত হন তিনি। তৃতীয়ত, সে সময়কার অধিকাংশ সেনা অফিসারের বিপরীতে জিয়া ছিলেন তুলনামূলকভাবে সৎ।...[১১]

কাফি খান ছিলেন 'ভয়েস অব আমেরিকা'র সংবাদপাঠক। ১৯৭৭ সালের ১ ডিসেম্বর তিনি রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব পদে নিয়োগ পান। খুব কাছে থেকে জিয়াকে দেখেছেন তিনি। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, আত্মীয়স্বজনদের কেউ কোনো তদবিরের জন্য বঙ্গভবনে বা তাঁর বাসায় আসার সাহস পায়নি। তাঁর স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অফিসের ধারেকাছেও আসতেন না বা আসতে পারতেন না। তাঁকে একমাত্র দেখা যেত রাষ্ট্রপতি জিয়া কোনো রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশে গেলে সেখানে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে। তা-ও সব সফরে নয়। এ ছাড়া কোনো রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান বাংলাদেশ সফরে এলে প্রটোকলের স্বার্থে বেগম জিয়া রাষ্ট্রীয় ভোজে অংশ নিতেন। তিন-চার হাজার টাকার মতো বেতন পেতেন। সেখান থেকে ১৫০ টাকা রাষ্ট্রপতির রিলিফ ফান্ডে জমা দিতেন। বাকি টাকাটা দিয়ে সংসার চালাতেন।[১২]

নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে জিয়া যে কতটা কঠোর হতে পারেন, তার একটা উদাহরণ তিনি তৈরি করেছিলেন তাঁর ছেলে তারেক রহমানকে নিয়ে। তারেক ঢাকায় বিমানবাহিনী পরিচালিত শাহীন স্কুলে পড়তেন। ক্লাস নাইনের পরীক্ষায় তিনি পাস করেননি। স্কুলের নিয়ম ছিল, ক্লাস নাইনে ফেল করলে তাকে আর স্কুলে রাখা হতো না এবং অভিভাবককে ডেকে তা জানিয়ে দেওয়া হতো। তারেকের অভিভাবক ছিলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি জিয়া। স্কুলের অধ্যক্ষ নিলুফার মাহমুদ জিয়াকে বিষয়টি জানান। জিয়া নিজেই স্কুলে এসে ছেলেকে নিয়ে যান এবং অন্য একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন।

নতুন দল তৈরি হলে দলের উঠতি নেতাদের আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই ডালপালা মেলতে থাকে। জিয়া যত বেশি সম্ভব লোককে নানান পদ-পদবি দিয়ে সন্তুষ্ট

রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রিসভার বহর ছিল বেশ বড়, ৪০ থেকে ৫০ জনের অনেককে তিনি ব্যবসায়িক সুবিধা এবং ব্যাংকঋণের ব্যবস্থা করে দেন। ২০ জন সংসদ সদস্যকে তিনি উপমন্ত্রীর মর্যাদায় 'জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারী' হিসেবে নিয়োগ করেন। কয়েকজন সংসদ সদস্যসহ ৫৩ জনকে নিয়ে তিনি একটা 'দূতপুল' তৈরি করেছিলেন।[১৩] এঁদের সবাইকে রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা দেওয়া হয়। জিয়াউর রহমান নিজেই দূতপুলের জন্য লোক বাছাই করতেন। এরকম একজন 'দূত' ছিলেন মুন্সিগঞ্জের সুখরামপুর গ্রামের এম শামসুল ইসলাম। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

> অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রেসিডেন্টের অ্যাডভাইজর হয়েছেন। তখনো বিএনপি হয়নি। তিনি আমাকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। কয়েকটি দেশে রাষ্ট্রদূতের পদ খালি ছিল। আমার পছন্দ ছিল সুইডেন। প্রেসিডেন্ট বললেন, ওখানে অনেক শীত, আপনার কষ্ট হবে, আপনি ইন্দোনেশিয়া যান। আমি রাজি হলাম। তিনি বললেন, বেগম সাহেবাকে জিজ্ঞেস করেন। আমি এদিক-ওদিক তাকাতেই তিনি বললেন, না না, আপনার বেগম সাহেবাকে জিজ্ঞেস করতে বলছি। তাঁর কথায় সারল্য আর উষ্ণতা ছিল। জাকার্তায় অনেকেই বলেছে, তোমাদের প্রেসিডেন্ট নাকি ১২০০ সিসির গাড়িতে চড়ে? এটা ছিল তাঁর হিউমিলিটি (বিনয়)। এটা এ দেশে রেয়ার (দুর্লভ)।[১৪]

বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিস থেকে অনেক সদস্যকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হতো। সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় চাঁদা তোলার দায়িত্ব পান। অনেক সামরিক কর্মকর্তাকে তিনি অসামরিক পদে নিয়োগ দেন।

জিয়ার বিরোধিতা হয়েছিল সামরিক বাহিনীর মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। তাঁকে ১৭-১৮টি অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টা সামাল দিতে হয়েছিল। 'অভ্যুত্থান দমনে জিয়া ছিলেন সুকঠোর, ক্ষমাহীন এবং নির্দয়।'[১৫] জিয়ার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রধানত দুটো উদাহরণ দেওয়া হয়। একটি হলো লে. কর্নেল আবু তাহেরের ফাঁসি এবং অন্যটি হলো ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবরের অভ্যুত্থান দমনের নামে হাজারের বেশি সৈন্যকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া। ২ অক্টোবর-পরবর্তী ঘটনাটি ছিল মর্মান্তিক। অনেকেই জানতেন না, তাঁদের অপরাধ কী। তাঁদের অনেকের লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এঁদের অন্যতম ছিলেন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সংগঠক করপোরাল আলতাফ হোসেন। হত্যা করে তাঁর লাশ গুম করে ফেলা হয়েছিল।[১৬]

তাহেরের ফাঁসি ছিল একটা 'বিচারিক হত্যাকাণ্ড'। তবে এটা জিয়ার একক সিদ্ধান্ত ছিল না। এর পেছনে সামরিক বাহিনীর সব কর্মকর্তারই সায় ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার তো দাবিই করেছিলেন, ফাঁসি না দিলে তিনি কোমরের বেল্ট খুলে ফেলবেন, অর্থাৎ সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেবেন। ওই সময় সেনাবাহিনীর কোনো কর্মকর্তা তাহেরের পক্ষ নিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। তাহেরের ফাঁসি নিয়ে জিয়ার মধ্যে অপরাধবোধ বা মর্মবেদনা থাকতে পারে। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর আদেশে তাহেরের পরিবারের জন্য ঢাকার লালমাটিয়ায় একটা আবাসিক প্লট বরাদ্দ করা হয়। তাহেরের স্ত্রী এবং তাহেরের বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে জিয়ার আদেশে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সেটি গ্রহণও করেছিলেন। তাহেরের বড় ভাই সার্জেন্ট (অব.) আবু ইউসুফ সামরিক আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ৭ নভেম্বর (১৯৭৫) অভ্যুত্থানের পর জলিল-তাহেরদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে যে সাজা দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের কাউকেই বেশি দিন জেলে থাকতে হয়নি। চার বছর না পেরোতেই আবু ইউসুফ ছাড়া পান। জাসদের সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রবের ১০ বছরের সাজা হয়েছিল। তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে পশ্চিম জার্মানিতে চিকিৎসার জন্য যেতে দেওয়া হয়।

সরকারি খরচেই জার্মানিতে রবের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে চিকিৎসাব্যবস্থায় রব খুশি ছিলেন না। বন থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর (১৯৭৯) তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কাছে একটা চিঠি পাঠান। প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লে. কর্নেল (অব.) এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমানকেও তিনি চিঠির অনুলিপি দেন। চিঠিটা ছিল এরকম :

মাননীয় রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ
বিষয় : চিকিৎসা সংক্রান্ত
জনাব,
দীর্ঘ পাঁচ বছর (মাঝে তের দিন বাদে) কারাজীবন যখন অতিবাহিত হয়েছে, তখন ১৯৭৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আমি যখন মাথা ঘুরানি, বমি ও দৈনিক তের থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থেকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছাই...মেহনতী জনগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ তিন মাস পরে সরকার আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে...মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ড তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনার পর আমি ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত বলে সন্দেহ এবং আমার ডান কান ও ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করে যেহেতু এসব চিকিৎসা বাংলাদেশে সম্ভব নয়, সেহেতু আমাকে অবিলম্বে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে (ব্রিটেনে) পাঠানোর জন্য উপদেশ

দেন। পরবর্তীতে...সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের দাবি ও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আমাকে প্যারোলে চিকিৎসার জন্য পশ্চিম জার্মানিতে পাঠাতে বাধ্য হয়।

জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের নিউরোসার্জিকেল বিভাগ তদন্তের (ইনভেস্টিগেশন) পর মতামত প্রকাশ করে যে—আমার মস্তিষ্কে (ব্রেইন) কোনো টিউমার নাই।....ইএনটি বিভাগ তদন্তের (ইনভেস্টিগেশন) পর জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ ইএনটি বিশেষজ্ঞ প্র: ডা. ডব্লিউ বেকার মতামত প্রকাশ করেন যে—আমার ডান কান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট এবং কানের একটি নার্ভ শক্ত হয়ে গেছে।...তিনি আরও বলেছেন যে জার্মানিতে ওই রোগের চিকিৎসা সম্ভব নয়।...

অতএব, আপনি ও আপনার সরকারের কাছে আমার জিজ্ঞাসা আমার যে প্রধান চিকিৎসার জন্য জার্মানিতে পাঠানো হয়েছে, সে কানের চিকিৎসার কি হলো? এখানকার অন্যান্য চিকিৎসাগুলো তো শেষ হওয়ার পথে, কিন্তু কানের চিকিৎসার ব্যাপারে অন্য কোনো দেশে চেষ্টা বা ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে দূতাবাস আমাকে জানায়নি।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি, কানের চিকিৎসার ব্যাপারে যতই বিলম্ব ঘটছে আমার অন্য কানটি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও ততই ত্বরান্বিত হচ্ছে। জানি না আমি অন্য কানটির শ্রবণশক্তি হারিয়ে চিরতরে বধির হয়ে যাই কি না। যদি তাই হয় তবে আমার বেঁচে থাকা নিরর্থক। তাহলে গরিব জনগণ ও দেশের লাখ লাখ টাকা খরচ করে চিকিৎসার জন্য বিদেশে আসাটাই বিফল হয়ে যাবে।...আমি আশা করব বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে দেশের স্বার্থে যদি আমাকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আপনার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আমার চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আমি আশা করি। তা ছাড়া আমি একজন বন্দী হিসেবে এটা আপনি এবং আপনার সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দায়িত্বও বটে। আপনার সহৃদয়ানুভূতির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে, আমি এই চিঠির উত্তরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আপনার সুস্বাস্থ্য ও সার্বিক মঙ্গল কামনান্তে—
আ স ম আবদুর রব
৫৩০০ বন
পশ্চিম জার্মানি

রব দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিম জার্মানিতে ছিলেন। ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালে ১৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৮০) এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রবের চিকিৎসার জন্য সরকারের পাঁচ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।[১৭]

তাহেরের অনুজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং জাসদ-গণবাহিনীর ঢাকা নগরের কমান্ডার আনোয়ার হোসেনের ১০ বছরের সাজা হয়েছিল। তিনিও সাজার মেয়াদ অর্ধেক ভোগ করে ছাড়া পান। জিয়ার সঙ্গে জাসদের একটা সমঝোতার ফলেই সবাইকে এক এক করে ছেড়ে দেওয়া হয়। অস্ত্র আইনে যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা ছিল, তাঁদের অনেকেই সাধারণ ক্ষমা পেয়ে ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন এবং জয়ী হন। আনোয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ফিরে পান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে আওয়ামীবিরোধী 'গোলাপি' দলে যোগ দেন। পরে জিয়াপন্থীরা 'গোলাপি' দল ভেঙে 'সাদা' দল বানালে আনোয়ার সাদা দলে যোগ দেন এবং ওই দলের সমর্থনে সিন্ডিকেট নির্বাচনে অংশ নেন। ১৯৯৬ সালে হাওয়া ঘুরে গেলে তিনি আওয়ামীপন্থী নীল দলে নিজেকে সমর্পণ করেন। আনোয়ার যখন সাদা দলের সংগঠক হন, তাঁকে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক নেহাল করিম জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'যারা আপনার ভাইকে ফাঁসি দিল, আপনি তাদের সঙ্গে যান কীভাবে?' আনোয়ার জবাব দিলেন, 'অনেক কথা আছে, পরে বলব।'[১৮]

জিয়াউর রহমানের যুদ্ধদিনের সাথি ছিলেন মেজর (পরে লে. জেনারেল, অবসরপ্রাপ্ত) মীর শওকত আলী। জিয়ার মৃত্যুর পর তিনি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর মতে, জিয়া ছিলেন স্বাধীনচেতা ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাঁর আশপাশে মৌমাছির মতো অনেক চাটুকারের সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু জিয়া চাটুকারিতা একদম পছন্দ করতেন না। এ প্রসঙ্গে মীর শওকত আলীর একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

> আমাদের জাতিগত স্বাধীনতা এখনো হয়নি। আমরা এখনো নিজেদের চেয়ে সাদা চামড়াদের বিশেষ খাতির করি। একজন ইউরোপিয়ান প্রেসিডেন্টকে দেখেন। তিনি নিজের ব্রিফকেস নিজে নিয়ে গাড়ির দরজা খুলে গাড়িতে উঠছেন। আমাদের এখানে দরজা খোলার জন্য চামচারা রীতিমতো কম্পিটিশন করে। আমাদের নেতা যাবেন, তাঁর বক্তৃতার কপি আরেকজনের বগলে। তাঁর সানগ্লাস আরেকজনের হাতে। স্কুলের বাচ্চারা সকাল থেকে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লিডার বক্তৃতা দিতে যখন আসলেন, ততক্ষণে বাচ্চাগুলো রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। তাদের হাতের ফুল শুকিয়ে গেছে। নেতা দুর্নীতিবাজ হলেও তার লোকের অভাব হয় না। স্লোগান হয় 'অমুক ভাই এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে'। এই নেতা যখন স্টেজে দাঁড়ায়, সে নিজেও জানে না সে কী বলবে। তাকে আরেকজনে ফাইল খুলে দিতে হয়। বড়ই বিচিত্র যে, আমাদের নিতম্বের অবস্থানের ওপর আমাদের মানসম্মান নির্ধারিত হয়। চেয়ার নেওয়ার জন্য মারামারি দেখে এটাই মনে হয়। ইসরায়েলের কেবিনেটে দেখেন প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টারের

সামনের টেবিলে বসে পড়ছেন। আর আমাদের এখানে নেতার সামনে জড়সড় হয়ে থাকতে হয়। আমাদের এখানে একধরনের হীনম্মন্যতা আছে এবং স্বাধীন জাতির স্বাধীনতার অহংকারের জাগরণ এখনো হয়নি। দিস ইজ প্যাথেটিক অ্যান্ড ট্র্যাজিক। জিয়াউর রহমান আমাকে একদিন বলেছিলেন, মীর, যতদিন আমাদের দেশের দশ হাজার টাউট ও চামচা নিশ্চিহ্ন না হবে, ততদিন আমাদের কষ্ট থাকবে।[১৯]

দল পরিচালনা

দল তৈরির ব্যাপারে জিয়া অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করলেও সিদ্ধান্ত তিনি একাই নিতেন। বিএনপির গঠনতন্ত্রে দলের কাঠামোর বিস্তারিত বিবরণ ছিল। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চেয়ারম্যান ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর অধীনে ছিল জাতীয় কাউন্সিল, স্থায়ী কমিটি, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, সংসদীয় বোর্ড এবং সংসদীয় দল। জাতীয় কাউন্সিলের সদস্য ছিল ১৭ থেকে ১৮ হাজার। এদের শতকরা ১০ ভাগ চেয়ারম্যান দ্বারা মনোনীত। প্রতিটি থানা, পৌরসভা, নগর ও জেলা কমিটির সভাপতি, সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। কাউন্সিলের অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জেলা কমিটি মনোনীত দুজন নারী প্রতিনিধি এবং স্থায়ী কমিটি, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও সংসদীয় দলের সব সদস্য। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১২০ জন সদস্য ছিলেন। চেয়ারম্যান প্রতিটি জেলা থেকে একজনকে জাতীয় কমিটিতে মনোনয়ন দিতে পারতেন। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিসহ সব পর্যায়ের কমিটিতে ১০ শতাংশ সদস্যপদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। দলে নারীর জন্য সদস্য সংরক্ষণব্যবস্থা বাংলাদেশে বিএনপিই প্রথম চালু করে।[২০]

দলের চেয়ারম্যান নির্বাচন করার জন্য একটি নির্বাচকমণ্ডলী ছিল। প্রতিটি ইউনিয়ন, থানা, পৌরসভা, নগর ও জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে নিয়ে এই নির্বাচকমণ্ডলী তৈরি করা হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে দলের চেয়ারম্যান নির্বাচন ও তাঁকে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। বাদ দেওয়ার জন্য তিন-চতুর্থাংশ ভোটের প্রয়োজন হতো।[২১]

বিএনপির টিকিটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংসদীয় দল তৈরি হয়। এর প্রধান কাজ ছিল, চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে সংসদ নেতা, উপনেতা, চিফ হুইপ ও অন্যান্য হুইপ নির্বাচন করা।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চেয়ারম্যানের মেয়াদ ছিল দুই বছর। চেয়ারম্যান ইচ্ছে করলে যেকোনো পর্যায়ের যেকোনো কমিটি বাতিল করে দিতে পারতেন।

চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা না করে মহাসচিব দলের কোনো সভা ডাকতে পারতেন না। প্রকৃতপক্ষে বিএনপি এক ব্যক্তির সংগঠন হয়ে উঠেছিল। তবে জেলা ও এর নিচের পর্যায়ের কমিটিগুলোতে স্থানীয়ভাবে নেতা নির্বাচনের সুযোগ ছিল।[২২]

তার পরও জিয়া তাঁর সরকারের সম্পূর্ণ দলীয়করণ করেননি। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে তিনি এমন কয়েকজনকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন, যাঁরা তাঁর দলের সদস্য ছিলেন না। এঁদের মধ্যে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামস-উল-হক, পরিকল্পনামন্ত্রী ফসিহউদ্দিন মাহতাব; কৃষিমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অব.) নূরুল ইসলাম শিশু, শিল্পমন্ত্রী এস এম শফিউল আযম এবং অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী ড. এম এন হুদা।

রাজনৈতিক কৌশল

বিএনপির রাজনৈতিক কৌশলের বৈশিষ্ট্যগুলোর একটা সারসংক্ষেপ করেছেন জিয়ার রাজনৈতিক সহকর্মী মওদুদ আহমদ। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

(১) প্রশাসন থেকে সামরিক বাহিনীকে দূরে রাখা;

(২) দেশে ভারতবিরোধী শক্তিকে উৎসাহ দিয়ে ডান-বাম সবার সমন্বয়ে রুশ-ভারতবিরোধী মেরুকরণ তৈরির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ সবাইকে নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করা;

(৩) অর্থনীতিতে ব্যক্তিপুঁজি এবং ব্যক্তিমালিকানার গুরুত্ব বাড়ানো এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় খাতটি রেখে দেওয়া;

(৪) রাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় সংসদের মধ্যে একধরনের ভারসাম্য বজায় রাখা।

এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে জিয়া নিজেকে একজন মধ্যপন্থী হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।[২৩]

জিয়া সামরিক-অসামরিক আমলাদের সমন্বয়ে প্রশাসনব্যবস্থা সাজিয়েছিলেন। এটাকে সিভিল প্রশাসনের ওপর সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়ার একটা 'অপকৌশল' মনে হতে পারে। আবার এই বিন্যাসটিকে সিভিল-মিলিটারি দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি হিসেবেও দেখা যেতে পারে। সামরিক বাহিনী ইতিমধ্যে চালকের আসনে বসে গিয়েছিল। অথচ গণতন্ত্রায়ণের স্বার্থে প্রয়োজন ছিল তাদের প্রশাসনের বাইরে রাখা। জিয়া তাঁদের অনেককে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োগ দিয়ে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেন।

জিয়া যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তখন ২০ জন সচিবের মধ্যে ছয়জন ছিলেন সামরিক বাহিনী থেকে আসা। ২০ জন পুলিশ সুপারের মধ্যে ১৪ জন এবং

পাবলিক সেক্টর করপোরেশনের ২০টির মধ্যে ১০টির প্রধান ছিলেন সেনা কর্মকর্তা। ওই সময় সরকারের বিভিন্ন অসামরিক পদে ৭৯ জন সেনা কর্মকর্তা ছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩২ জন ছিলেন বিভিন্ন দূতাবাসে।[২৪] এভাবেই জিয়া সরকার ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থা নেন। সব গোষ্ঠীকেই তিনি খুশি রাখতে চেয়েছেন। এই কৌশলটি কাজে লেগেছিল এবং দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছিল।[২৫]

তৃণমূলে বিস্তৃতি

এ দেশে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা ইউনিয়ন পর্যায়ে মোটামুটি টেকসই হয়ে গেছে। জিয়া এই ব্যবস্থাকে আরও তৃণমূলে নিয়ে যান, তৈরি করেন গ্রাম সরকার। এটা তিনি প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য করেছিলেন, নাকি গ্রাম পর্যায়ে ক্ষমতার ভিত তৈরির জন্য ব্যবহার করেছিলেন, তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। তবে এটা মানতেই হবে যে নিম্নতম পর্যায়ে ক্ষমতা, প্রশাসন ও উন্নয়ন-সুবিধা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর জনভিত্তি বাড়াতে পেরেছিলেন। দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বা ভিলেজ ডিফেন্স ফোর্স (ভিডিপি) তৈরি করেছিলেন। ফলে তিনি তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা ও কাজে লাগানোর প্রয়াস পান : গ্রাম সরকার, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিএনপির কমিটি। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে সমাজের উঁচু-নিচু সব স্তরের মানুষের প্রতিনিধিদের সমাবেশ ঘটেছিল। আনুমানিক ৬৫ হাজার গ্রাম সরকার তৈরির কাজ শেষ হয় ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে।[২৬]

গ্রাম সরকারগুলো স্থানীয় সালিস এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার ফোরাম হিসেবে কিছুটা ভূমিকা রাখে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোই ছিল গ্রাম পর্যায়ে জিয়ার 'উন্নয়নের রাজনীতির' বাহন। এসবের ফলে জিয়ার অনুকূলে গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামো তৈরি হয়ে যায়। গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো থেকে আসা মানুষগুলো শুধু জনজীবনে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সহায়তাই দেয়নি, বিএনপিকে তৃণমূলে বিস্তৃত করতেও সাহায্য করেছে।

স্বাধীনতাবিরোধীদের মদদ দেওয়া

জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ হলো, তিনি কয়েকটি 'মীমাংসিত' বিষয়কে নতুন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এর একটি হলো

'স্বাধীনতাবিরোধী' শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করা। বিশেষ করে, শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়। এ নিয়ে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেও পাল্টা নালিশ আছে। এ প্রসঙ্গে বিএনপির নেতা মওদুদ আহমদ বলেন, 'স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের উগ্রনীতির ফলেই যুদ্ধের সময় সীমান্তের ওপারে যাওয়া না যাওয়ার ওপর ভিত্তি করে তারা সব ক্ষেত্রে দেশটাকে বিভক্ত করে দিয়েছিল। দালাল আইনের অপব্যবহার করে নিরীহ লোকদের কারাবন্দী করেছে, আর আওয়ামী লীগের নেতারাই দালালদের প্রোটেকশন দিয়েছেন।' মওদুদ আরও মন্তব্য করেন :

> তাদের (আওয়ামী লীগের) খাতিরের লোকেরা কোনো অসুবিধায় পড়েনি, কে দালাল আর কে দালাল নয়, সেটা নির্ভর করছে তাদের রাজনৈতিক মর্জির ওপর। কোনো বড় দালালের কোনো বিচার বা সাজা হয়নি—গরিবের ওপর অনর্থক অত্যাচার হয়েছে। যে শাহ আজিজকে কটাক্ষ করে তারা জিয়াকে সমালোচনা করে, সেই শাহ আজিজের দুই বছরেও কোনো বিচার হয়নি কেন বা ক্ষমা প্রদর্শন করে কেন তারা তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল এবং প্রগতির গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল? স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়, তাদের কোনো বিচার করা হয়নি। মোদ্দাকথা এই যে, এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কোনো নীতি ছিল না।...সুতরাং স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিরা যদি পরবর্তীকালে রাজনৈতিক প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তার সূত্রপাত আওয়ামী লীগ আমলেই।[২৭]

প্রতিবেশী

জনমনে একটা অতি সরলীকৃত ধারণা আছে, শেখ মুজিবের সরকার ছিল 'ভারতপন্থী', আর জিয়াউর রহমান হলেন 'ভারতবিরোধী'। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে 'ভারত' একটি বড় ফ্যাক্টর।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব সপরিবার নিহত হলেও ঢাকায় তাঁর অনুগত কাউকে প্রতিবাদ জানাতে কিংবা বিক্ষোভ করতে দেখা যায়নি। টাঙ্গাইলের নবনিযুক্ত জেলা গভর্নর আবদুল কাদের সিদ্দিকী তাঁর অনুগত কিছু তরুণকে নিয়ে দেশ ত্যাগ করেন এবং ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সহযোগিতায় কিছু সশস্ত্র কর্মকাণ্ড চালান। এই বাহিনীর নাম ছিল 'জাতীয় মুক্তিবাহিনী'। এই বাহিনীর অনেকেই বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন। নিজেদের মধ্যে মারামারি করেও অনেকে নিহত হন।[২৮] এ সময় বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ছিল বেশ শীতল।

কাদের সিদ্দিকীর লোকেরা বিডিআরের কয়েকটা বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) দখল করে নিয়েছিল। এগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চেষ্টা চালায়। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার দুর্গাপুর বিওপি কাদেরের লোকেরা দখল করে নিয়েছিল। এটা উদ্ধার করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন শচিন কর্মকার একটা অভিযান চালান। ক্যাপ্টেন শচিন এই 'যুদ্ধের' বর্ণনা দিয়েছেন :

> ময়মনসিংহের খাগডহর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছিল আমাদের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার। এরপর বিহারি কলোনিগুলো আমরা অধিগ্রহণ করি। ফয়জুর রাজ্জাক ছিলেন ডিসি। তালেব আলী সাহেব ছিলেন এসপি। অ্যাডিশনাল এসপি ছিলেন মোদাব্বের, পরে আইজি হয়েছিলেন।
>
> দুর্গাপুর বিওপি বিএসএফের সাহায্যে কাদেরিয়া বাহিনী দখল করে। জেনারেল জিয়া ওয়াজ চিফ, সায়েম ওয়াজ প্রেসিডেন্ট। বোথ কেইম টু মাইমেনসিং। আমি দুই কোম্পানি আর্মি, এক কোম্পানি বিডিআর আর এক কোম্পানি রিজার্ভ পুলিশ নিয়েছি। আমার সঙ্গে জেনারেল চিশতির ভাই নেত্রকোনার এসডিপিও মঈনুদ্দিন চিশতি ছিল। আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে—সন্ধ্যার মধ্যে বিওপি দখল করো। ওই বিওপিতে বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ম্যাপওয়ালা পতাকা তুলেছিল কাদেরিয়া বাহিনী। ওদের মধ্যে অনেকেই ছিল আমার পরিচিত। এখন কম্যুনিকেট করার তো উপায় নাই। আমার চিন্তা ছিল, কোনোমতেই আমার হাতে যেন ওদের কোনো ক্যাজুয়ালটি না হয়। আমি ভাবলাম, ফায়ার পাওয়ারটা এত বেশি ব্যবহার করব, যাতে তারা উইথড্র করতে বাধ্য হয়। ওয়ান টু টু না, থ্রি না, ওয়ান ইজ টু টেন।
>
> মুষলধারে বৃষ্টি। বাই ডাস্ক আমরা বিওপি দখল করি। ওখানে ৪০ জনের মতো ছিল। আমার সঙ্গে প্রায় ৪০০ জন। শেষ পর্যন্ত ওদের ২৫ জন ছিল। সারেন্ডার করল। ওদের মধ্যে যারা আমাদের না, মানে ইন্ডিয়ান, তাদের চলে যেতে বললাম। ডিপ্লোম্যাটিক সমস্যা হতে পারে। ডিজিএফআই চিফ এয়ার ভাইস মার্শাল আমিনুল ইসলাম এলেন। জিয়া এলেন হেলিকপ্টারে, সায়েমও ছিলেন ময়মনসিংহ সার্কিট হাউসে। জিয়া বললেন, স্টে উইথ মি, গল্প করব। সায়েম চলে গেলেন ঢাকায়। আমাকে রুম-টুম দিল। এটা ছিয়াত্তর সালের ঘটনা।[২৯]

জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ১৯-২০ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো নয়াদিল্লি সফরে যান এবং ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। দেশাই ভারত মহাসাগরকে একটি 'শান্তি এলাকা' করার প্রস্তাব দেন। জবাবে জিয়া পুরো দক্ষিণ এশিয়াকে একটি 'শান্তি এলাকা' ঘোষণা করার প্রস্তাব রাখেন।[৩০]

ভারতের দেশাই সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের জিয়া সরকারের সম্পর্কে উন্নতি ঘটে। কাদের সিদ্দিকীর সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে ভারত সরকার সহযোগিতা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এ সময় কাদের বাহিনীর অনেকেই দেশে ফিরে এসে বাংলাদেশ সরকারের 'সাধারণ ক্ষমার' সুযোগ নেন। অনেকে গ্রেপ্তার ও নির্যাতিত হন। দেশাই ঢাকা সফর করেন। দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান সমস্যাগুলোর অন্যতম ছিল গঙ্গার পানি ভাগাভাগি নিয়ে জটিলতা। জিয়া সরকার প্রথমে সমস্যাটির আন্তর্জাতিকীকরণের চেষ্টা করে। লক্ষ্য ছিল ভারতকে চাপে ফেলে সমস্যার সমাধান করা। এ জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিষয়টি তোলা হয়েছিল। পরে অবশ্য জিয়া দ্বিপক্ষীয় আলোচনার প্রস্তাবটি মেনে নেন। ১৯৭৭ সালে পাঁচ বছরের জন্য ভারতের সঙ্গে একটা অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি হয়। কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে আসে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে সহযোগিতা বাড়ানোর একটা ফোরাম তৈরির চিন্তা করেছিলেন জিয়া। ১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে তিনি নেপালের রাজা বীরবিক্রম শাহ দেবকে লেখা একটি চিঠিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব দেন। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সরকারপ্রধানদের কাছেও তিনি

রাষ্ট্রপতি জিয়া ও বেগম জিয়াকে দিল্লি বিমানবন্দরে স্বাগত জানাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

অনুরূপ চিঠি দেন। এতে ইতিবাচক সাড়া মেলে।[৩১] এর ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর কর্মকর্তা পর্যায়ে বেশ কয়েকটি সভা হয়। ১৯৮১ সালের এপ্রিলে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের (তখনো আফগানিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার অংশ হয়নি) পররাষ্ট্রসচিবেরা প্রথমবারের মতো কলম্বোয় বৈঠক করে আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটা কর্মপন্থা তৈরির ব্যাপারে একমত হন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে নয়াদিল্লিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভায় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) একটি চার্টারের খসড়া তৈরি হয়েছিল। শীর্ষ সম্মেলনটি হয়েছিল আরও দুই বছর পর, ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায়।[৩২]

১৯৮০ সালের ২১ জানুয়ারি জিয়া রাষ্ট্রীয় সফরে দ্বিতীয়বার নয়াদিল্লি যান এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। এই সময়ের মধ্যে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে।

বিএনপি কি অনিবার্য ছিল

১৯৭২-৭৫ সালে আওয়ামী লীগ/বাকশাল সরকারের সময় মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রায় সবাই ছিলেন রাজনীতিবিদ। জিয়াউর রহমান সামরিক-অসামরিক আমলা ও পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করে যে মন্ত্রিসভা তৈরি করেন, তাতে চমক ছিল। জিয়ার তৈরি এই পথে পরের সব সরকারই হেঁটেছে। প্রতিটি সরকারের মন্ত্রিসভায় বা মন্ত্রী পদমর্যাদায় সামরিক-অসামরিক আমলা ও টেকনোক্র্যাটের জায়গা মিলেছে। এর ফলে আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিকীকরণ ঘটেছে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে চাকরিরত অবস্থায় আমলারা পছন্দের দলের হয়ে কাজ করা ও ঘর গোছানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

১৯৭২ সালে যখন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে, এটা ছিল দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অবিসংবাদী জাতীয় নেতা। সাড়ে তিন বছরের আওয়ামী লীগ শাসনে অবস্থা অনেক বদলে গিয়েছিল। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একচেটিয়া জয় পেলেও অনেক আসনে এই নির্বাচন ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। এরপর চারটি উপনির্বাচন হলে দুটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা হেরে যান। এটা ছিল আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ার একটি লক্ষণ। লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যসংকট, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং রাজনৈতিক সহিংসতা দেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। পঁচাত্তরের মধ্য-আগস্টে আওয়ামী লীগ যখন দৃশ্যপট থেকে সরে যায়, তখন তার জনপ্রিয়তার পারদ একেবারেই নিচে নেমে গিয়েছিল। একদলীয়

সরকারব্যবস্থা চালু হওয়া এবং সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ফলে 'গণতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র অগস্ত্যযাত্রা শুরু হয়। জাতীয়করণ করা কলকারখানার ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে একদল মানুষ হঠাৎ করেই প্রচুর বিত্তের মালিক হয়ে যান। রাষ্ট্রীয় খাতে 'সমাজতন্ত্রের' ছিটেফোঁটাও ছিল না। এভাবেই রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি চলে যায় নির্বাসনে।

পাকিস্তানকে গালাগাল করার রাজনীতির প্রেক্ষাপট বদলে গিয়েছিল ১৯৭২ সাল থেকেই। দৃশ্যপট থেকে পাকিস্তান সরে গিয়েছিল। লিয়াকত আলী খান থেকে আইয়ুব খান পর্যন্ত পাকিস্তানের সব শাসক তাঁদের সমালোচকদের ভারতের দালাল বলতেন। ১৯৭২ সাল থেকে শাসকেরা তাঁদের সমালোচকদের পাকিস্তানের দালাল বলা শুরু করেন। প্রতিপক্ষকে 'শত্রুরাষ্ট্রের' দালাল বলার এই অতি পুরোনো কৌশলটি সবাই ব্যবহার করে থাকেন।

বাংলাদেশকে তিন দিক দিয়েই ঘিরে আছে ভারত। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে ভাটার টান শুরু হয়। সীমান্তে চোরাচালান, বাণিজ্য-ঘাটতি, গঙ্গা থেকে একতরফা পানি প্রত্যাহার ইত্যাদি এ দেশে ভারতবিরোধী রাজনীতি উসকে দেয়। এর সঙ্গে যোগ হয় দেশের ভেতরে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর প্রচারণা। ডান-বাম প্রায় সব দলই এই জোয়ারে শামিল হয়। ফলে যে বিষয়গুলো ১৯৭১ সালে নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করা হতো, তা আবার রাজনীতিতে ফিরে আসে। ঠিক এই সময়েই উত্থান হয় বিএনপির।

পঁচাত্তরের পরপর তিনটি সেনা-অভ্যুত্থানের ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি ঝুঁকির মধ্যে পড়েছিল। তাদের একটাই চাওয়া ছিল; সমাজ এবং রাষ্ট্র যেন 'স্থিতিশীল' থাকে। পঁচাত্তর-পরবর্তী উথালপাতাল দিনগুলোতে জিয়াউর রহমান শক্ত হাতে লাগাম টেনে ধরেছিলেন এবং স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছিল—জনমনে এমন একটা ধারণা জন্মে। মুদ্রাস্ফীতিও কমে আসছিল এবং পরপর কয়েক বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হওয়ার কারণে কৃষক গোলায় ফসল তুলতে পেরেছিল। মানুষ স্থিতাবস্থা চেয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটেই জিয়াউর রহমানের একটা দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। তাঁর গড়া বিএনপি দাঁড়ানোর মতো অনুকূল জমি পেয়ে যায়।

পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যে বিএনপির মতো একটি দলের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। পঁচাত্তরের ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে যদি অভ্যুত্থান না হতো, তাহলে হয়তো খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগের নতুন বিন্যাস হতো এবং মোশতাকই ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে

যেতেন—এরকম একটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর মোশতাক দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। এই শূন্যতার সুযোগটি নিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। এ প্রসঙ্গে জিয়ার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মূল্যায়ন হলো :

> ...রাজনৈতিক শূন্যতা তখন ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছিল। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্ভূত বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, উৎপাদন ও সমাজকর্ম সমন্বিত রাজনীতি দিতে পারবে, এমন রাজনীতির জন্য দেশ ও জাতি তাকিয়ে ছিল অনেক আশা-ভরসা নিয়ে। কেননা এগুলোই ছিল মুক্তিযুদ্ধের আসল চেতনা। এই প্রতিটি মূল্যবোধকে আওয়ামী বাকশালী সরকার সম্পূর্ণ ধ্বংস করে গেছে '৭২-৭৫ সালে।
>
> জাতীয় প্রয়োজনে, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সুন্দর জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতিসহ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার অঙ্গীকারসম্পন্ন একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। জিয়াউর রহমান সেই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনকে বাস্তবায়িত করতে বাধ্য হলেন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে।[৩৩]

লিডার মাস্ট বি সিন অ্যান্ড হার্ড

জিয়াউর রহমান সেনানায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক হয়েছিলেন। বিএনপি নামের একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি, যা টিকে আছে আজও। তাঁর নেতৃত্বের স্ফুরণ ঘটেছিল ১৯৭১ সালেই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে। তাঁর উত্থান ছিল নাটকীয়তায় ভরা।

অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান ২৫ মার্চ রাতে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন। চট্টগ্রাম বন্দরে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে গোলাবারুদ খালাস করার জন্য রেজিমেন্টের অধিনায়ক লে. কর্নেল আবদুর রশিদ জানজুয়া ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামানকে আদেশ দেন। পরে মত বদলে জিয়াকে বন্দরে যেতে বলেন। খালেকুজ্জামানের বর্ণনামতে :

> জানজুয়া বললেন, 'জিয়া, ইউ গো ফার্স্ট। খালিক উইল ফলো ইউ।' আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছে, হোয়াই ডিড হি এগ্রি টু গো? হাসির খবর এটা। আর্মিতে ট্রুপস হ্যাভ টু ওবে, ইউ ক্যান্ট রিফিউজ। জিয়া গাড়িতে উঠলেন। সঙ্গে দুজন অফিসার, সে. লে. হুমায়ুন এবং সে. লে. আজম। আমি ওপাশে গেলাম। জিয়া বললেন, খালেকুজ্জামান, কিছু শুনলে জানিও। দ্যাট ওয়াজ অ্যা মেসেজ ফ্রম আল্লাহ থ্রু হিম। গাড়ি চলে গেল। জানজুয়া বাসায় চলে গেলেন, আলহামরা বিল্ডিংয়ে। শওকত চলে গেলেন। ওলি চলে গেল ওপরে। আমি

এখন চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন ওলি ওপর থেকে বলল, স্যার, আপনার একটা ফোন আসছে। আমি গেলাম। বাই দ্যাট টাইম ওলি হ্যাজ টক্‌ড। ফোনে ছিলেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অব স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক আবদুল কাদের। খুব স্নেহ করতেন আমাকে, চাচার মতো। বললেন, 'ঢাকায় তো ইপিআরের ওখানে ফায়ারিং শুরু হয়ে গেছে। আর্মি হ্যাজ রেইডেড দ্য ক্যাম্পস। তোমরা কী করছ।' আরও কিছু বললেন, আমাকে এক্সাইটেড করলেন। আমি ওলিকে বললাম, আই অ্যাম গোয়িং টু গেট ব্যাক আওয়ার বস জিয়া। দিস ইজ, আল্লাহ হ্যাজ ইনফিউজড সামথিং ইন মি।

পিকআপ আসলো। রাস্তায় ব্যারিকেড। দেওয়ানহাট ওভারব্রিজের সামনে, ওখানে আল্লাহর রহমতে ওইটা (ব্যারিকেড) ছিল। জিয়া, লাইক এ ড্যান্ডি ম্যান, স্মার্ট, হাতে ফিল্টার উইলস, দ্যাট ফেমাস উইলস। সিগারেট খাচ্ছে। বললেন, 'ইয়েস খালিক, হোয়াট হ্যাপেন্ড?' আই সেইড, ফায়ারিং হ্যাজ স্টার্টেড। ইপিআর ক্যাম্প হ্যাজ বিন অ্যাটাকড, ব্লা ব্লা ব্লা। উনি তখন চিন্তা করলেন। 'খালিকুজ্জামান, খালিকুজ্জামান'। উনি শাউট করলে আমি আস্তে কথা বলি। সেম টোনে বলি না। বললাম, স্যার, স্যার।

জিয়া : হোয়াট শ্যাল উই ডু?

আমি : ইউ নো বেটার।

জিয়া : ইন দ্যাট কেইস উই রিভোল্ট অ্যান্ড শো আওয়ার এলিজিয়েন্স টু দ্য গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের তখন কোনো খবর নাই। লিডার হ্যাজ টু টেক লিডারশিপ। ফিরে এসে...হুমায়ুন আর আজম গাড়িতে বসা ছিল। তাদের কোয়ার্টার গার্ডে নেওয়া হলো। দে অয়্যার স্টান্ট। জিয়া বললেন, 'খালিক লেট মি গো অ্যান্ড গেট দিজ বাস্টার্ড (জানজুয়া)।'[৩৪]

২৫ মার্চের মধ্যরাতে জিয়ার নেতৃত্বে অষ্টম বেঙ্গলের বাঙালি সদস্যরা বিদ্রোহ করলেন। এর আগে জিয়া সবার কাছে আনুগত্য চেয়েছিলেন। মেজর শওকতকে জিয়া ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিলেন। ইউনিট লাইনে তিনি শওকতকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আই হোপ, ইউ আর উইথ আস?...ইট ইজ বেটার টু সেটল দ্য ডিল বিফোর উই আর ইন অ্যা সিরিয়াস গেম।'

ওখানে কনফিউশন, কেউ কিছু বলে না।

খালেকুজ্জামান শওকতকে বলেছিলেন, 'স্যার বলেন না মেজর জিয়া টু আই সি উইল টেক ওভার লিডারশিপ?'

শওকত বললেন, 'ভাইসব, আপনারা শোনেন, এখন টু আই সি সাহেব কিছু বলবেন।'

খালেকুজ্জামানের বর্ণনা অনুযায়ী : 'এ লিডার মাস্ট বি সিন অ্যান্ড হার্ড। খালি পর্দার পেছন থেকে লিডার যদি বলে, ইফেক্ট ইজ নট দ্য সেম। ড্রামটা

১৯৭০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাকালীন কর্মকর্তাবৃন্দ। বাঁ থেকে লে. মাহফুজুর রহমান, মেজর জিয়াউর রহমান, লে. কর্নেল আব্দুর রশিদ জানজুয়া, মেজর কালভি, ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন অলি আহমদ

ফেলে দিলাম। জিয়া তো মানুষ ছোটখাটো। ওনাকে কেউ ধরেটরে ওপরে দাঁড় করিয়ে দিল। দেন হি কুড স্ট্যান্ড। ইট ইজ অ্যা ফ্যাক্ট দ্যাট হি ডেলিভার্ড। উই আর বিইং লেড। ওয়ান হু ইজ বিইং লেড, তার অত চিন্তা আসে না। লিডার টেকস দ্য রেসপনসিবিলিটি। লিডারের চিন্তা বেশি। সো হি ওয়াজ অ্যাংগশাস।'[৩৫]

একটা চরম মুহূর্তে জিয়াউর রহমান সিদ্ধান্তটি নিতে পেরেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মেজর মীর শওকত আলী, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, ক্যাপ্টেন সাদেক হোসেন, লে. শমসের মবিন চৌধুরী, লে. মাহফুজুর রহমান এবং অষ্টম বেঙ্গলের অন্যান্য বাঙালি সদস্য ইতিহাসের অংশ হয়ে গেলেন।

জিয়াউর রহমানকে নানাভাবে ছোট করার চেষ্টা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের স্মৃতিকথা নিয়ে লেখা একটি বইয়ের ভূমিকায় বইয়ের সম্পাদক শাহরিয়ার কবির উল্লেখ করেছেন, মেজর রফিকুল ইসলামের বিশাল গ্রন্থের কোথাও জিয়াউর রহমান নামে একজন সেক্টর কমান্ডার যে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না, যদিও জিয়ার রণকুশলতা সম্পর্কে ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল অরোরা যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। রফিকুল ইসলামের বইটি ছাপা হয়েছে জিয়ার মৃত্যুর পর।

শাহরিয়ার কবিরের মন্তব্য হলো, 'মেজর রফিকুল ইসলাম তাঁর স্মৃতিকথায় অন্য সব প্রসঙ্গ উত্থাপনের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিলেও জিয়াউর রহমানের ক্ষেত্রে যে তিনি কাল ও প্রেক্ষিতের সুযোগ গ্রহণ করেছেন—একথা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে।'[৩৬]

বাংলাদেশে বিভাজনের রাজনীতির বিয়োগান্ত শিকার হয়েছেন যে কয়েকজন, জিয়াউর রহমান তাঁদের একজন। জিয়া শেখ মুজিবকে নেতা মানতেন এবং সব সময় তাঁর সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বলতেন। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাঁকে যথেষ্ট সম্মান দেয়নি। 'আমরা বীরের সম্মান দিতে জানি না। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে বাংলাদেশের একজন মাত্র মুক্তিযোদ্ধার ছবি আছে, বুকের ওপর দু-হাত আড়াআড়ি করে দাঁড়ানো। তিনি জিয়াউর রহমান।'[৩৭]

রাজপথে

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

জিয়াউর রহমান যখন নিহত হন, উপরাষ্ট্রপতি সাত্তার তখন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাঁর বয়স ৭৮। জিয়ার মৃত্যুতে সরকারের ধারাবাহিকতায় কোনো ছেদ পড়েনি। সাত্তারকে হাসপাতাল থেকে বঙ্গভবনে এনে তাঁকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হলো। সব রাজনৈতিক দলই 'সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা' রক্ষার এই প্রক্রিয়াটিকে সমর্থন দেয়। ৪ জুন (১৯৮১) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার ঘোষণা করলেন, সংবিধানের শর্ত অনুযায়ী পরবর্তী ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বিচারপতি সাত্তার অসুস্থতার কারণে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করবেন না, এরকম একটা ধারণা দিয়েছিলেন তিনি। নির্বাচন না করার ইচ্ছা তিনি একটা সংবাদ সম্মেলনেও বলেছিলেন। তাঁর চোখের সমস্যা ছিল, একটা বস্তুর বদলে দুটি ইমেজ দেখেন। বাঁ দিকের চোখটা বেঁকে ট্যারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, তিনি হঠাৎ করেই রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হওয়ার জানান দিলেন।[১] নির্বাচনের জন্য ছয় মাস সময় থাকা সত্ত্বেও তড়িঘড়ি করে ঘোষণা করা হলো, ২১ সেপ্টেম্বর (১৯৮১) নির্বাচন হবে।[২]

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে নেপথ্যে জল ঘোলা হয়েছে অনেক। বিএনপি সরকারের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করছিল প্রধানত জিয়ার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির ওপর। জিয়ার মতো ক্যারিশমা সাত্তার কিংবা বিএনপির অন্য কোনো নেতার ছিল না। রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে সেনাবাহিনী জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীতে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব না থাকার কারণে তারা সরাসরি ক্ষমতা দখলের জন্য সময়টা উপযুক্ত বিবেচনা করেনি।[৩]

সেনা নেতৃত্ব, বিশেষ করে জেনারেল এরশাদ ছিলেন গভীর জলের মাছ। তাঁর একটু সময়ের দরকার ছিল, দরকার ছিল দুর্বল প্রকৃতির একজন রাষ্ট্রপতি, যাঁর ওপরে ছড়ি ঘোরানো এবং প্রয়োজনে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে

সাত্তার ছিলেন এরশাদের এক নম্বর পছন্দ। তবে বিএনপির কেউ কেউ চেয়েছিলেন, বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি হোন।[৪] জিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর ফলে জনমনে তাঁর প্রতি যথেষ্ট আবেগ ও সহানুভূতি তৈরি হয়েছিল। খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করলে তিনি 'সহানুভূতি ভোট' পেয়ে বিপুলভাবে জিতবেন, এটা অনেকেরই ধারণা ছিল।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও সাবেক সেনাপ্রধানের স্ত্রী ছাড়া বেগম খালেদা জিয়ার আর কোনো পরিচিতি ছিল না। তিনি ছিলেন নিতান্ত একজন 'গৃহবধূ'। তাঁর পারিবারিক ও ছাত্রজীবন ছিল একেবারেই সাদামাটা। খালেদার বাবা ইস্কান্দার মজুমদারের বাড়ি ফেনী জেলার ফুলগাজী গ্রামে। ব্যবসায়িক কারণে তিনি সপরিবার জলপাইগুড়ি থাকতেন। খালেদার জন্মও সেখানে। দেশ বিভাগের পর তাঁরা দিনাজপুর শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬০ সালের দিকে দিনাজপুরে সেনাবাহিনীর তৎকালীন ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমানের সঙ্গে খালেদার বিয়ে হয়।[৫] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে খালেদা অনেক দিন পালিয়ে বেড়ান এবং অবশেষে ২ জুলাই জিওলজিক্যাল সার্ভের কর্মকর্তা এস কে আবদুল্লাহর ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন।[৬]

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো এবং সাঈদ ইস্কান্দার একসঙ্গে ঢাকায় ফিরে আসেন ১৯ বা ২০ ডিসেম্বর। সাঈদ ইস্কান্দার ছিলেন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের দিনাজপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। সাঈদ তাঁর বড় বোন খালেদার সন্ধানে ঢাকা সেনানিবাসে যান এবং সেখান থেকে খালেদাকে উদ্ধার করে রনোদের বাসায় নিয়ে আসেন।[৭] খালেদা জিয়ার পলাতক ও বন্দিজীবন নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা পরবর্তী সময়ে অনেক অশোভন কেচ্ছা তৈরি করেছেন। একাত্তরে নির্যাতিত নারীদের অসহায়ত্ব নিয়ে এ ধরনের রসিকতা করা এ দেশের অপরাজনীতির বৈশিষ্ট্য।

বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন মওদুদ আহমদ। তিনি দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সংসদের উপনেতা (উপপ্রধানমন্ত্রী) ছিলেন। জিয়া নিহত হওয়ার পর বিএনপির রাজনীতি নিয়ে যে দাবা খেলা হয়েছে, তিনি সেটা খুব কাছে থেকে দেখেছেন। এখানে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য তুলে ধরা হলো।

> সামরিক ও শাসক চক্রের জন্য সবচেয়ে ভয় ছিল বেগম জিয়াকে নিয়ে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য তিনিই সে সময় সবচেয়ে শক্তিশালী (potential) ব্যক্তি হতে পারতেন। মুসলমান ঘরের স্বামীহারা স্ত্রী। স্বামীর এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে খালেদা জিয়া তখন শোকাভিভূত। ৪০ দিন পর্যন্ত তাঁর জন্য ছিল ধর্মীয় এক কঠিন বন্ধন। জিয়ার চেহলামের আগে খালেদা জিয়ার পক্ষে

কোনো ধরনের সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। ঐ কারণেই এত বিরোধিতা, এত প্রতিবাদ এবং স্বীয় দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই জিয়ার চেহলামের আগেই সাত্তারের মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়। যদিও হাতে অনেক সময় ছিল মনোনয়ন ঠিক করার, কিন্তু এই ঝুঁকি ক্ষমতাসীনরা নিতে পারেননি। বেগম জিয়া যদি প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইতেন, তাহলে অন্য কারো প্রার্থী হওয়ার তখন আর প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু ৪০ দিন পার হওয়ার আগে সেটা যাচাই করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু জিয়া হত্যার পর ক্ষমতাসীনদের একটি চক্র এবং দুটো গোয়েন্দা বিভাগ বেগম জিয়া ছাড়া অন্য আর একজন যিনি প্রার্থী হতে পারতেন, প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী, তাঁকে জিয়া হত্যার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং তাঁর চরিত্রহননের নানা চেষ্টা চালায়। বদরুদ্দোজা চৌধুরী তখন সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য ক্ষমতাসীনদের সরাসরি বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।...

তাই সাত্তারের মনোনয়নের ব্যাপারে কোনো ধরনের ঝুঁকি জেনারেল এরশাদ নিতে চাননি। এ ব্যাপারে তিনি তখনকার মন্ত্রিসভার সকল গুরুত্বপূর্ণ সদস্যেরই সহযোগিতা পেয়েছিলেন। শাহ আজিজ, জামালউদ্দিন আহমেদ, এস এ বারী এ টি, আবুল হাসনাত, মাঈদুল ইসলাম, আবুল কাসেম, শামসুল হুদা চৌধুরী, ডা. এম এ মতিন এবং অন্যান্য সকলেরই।...[৮]

গণমাধ্যমে জিয়ার পক্ষে চলছিল জোর প্রচার। এ ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*। *বিচিত্রা* ছিল আওয়ামী লীগ-বিরোধী সাংবাদিকদের 'অভয়ারণ্য'। জিয়ার স্মৃতি তখনো জনমনে বেশ সতেজ। ১৯৮১ সালের ৫ জুন, জিয়া হত্যার এক সপ্তাহের মধ্যেই, *বিচিত্রা* ১৯৭৪ সালে জিয়ার লেখা 'একটি জাতির জন্ম' আবার ছাপল। কিন্তু লেখাটির পুনর্মুদ্রণের ব্যাপারে *বিচিত্রা* কর্তৃপক্ষ একটু কারসাজি করেছিল। জিয়ার মূল লেখায় যেসব প্যারাগ্রাফে জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি শব্দ ছিল এবং একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণে জিয়া যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, বেশ যত্ন করে ওই অংশগুলো বাদ দিয়ে লেখাটি ছাপা হয়।[৯] রাজনৈতিক মতলব থেকেই এটা করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সামনে রেখে *বিচিত্রা* বিচারপতি সাত্তারকে নিয়ে একটা 'কভার স্টোরি' করে। শিরোনাম ছিল 'ইনক্রেডিবল হাল্ক'। ওই সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনে এই নামে একটা ইংরেজি সিরিয়াল দেখানো হতো। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন পরোপকারী নিপাট ভদ্রলোক; কিন্তু ইচ্ছা করলে তিনি দানবীয় শক্তি অর্জন করে সবকিছু মিসমার করে দিতে পারেন। তো সাত্তারকে হাসপাতালের বেড থেকে উঠিয়ে এনে ওই রকম একজন বলশালী বীর বানিয়ে দেওয়া হলো। মলাটে তাঁর একটা পেশিবহুল কার্টুনও ছাপা হয়েছিল।

২১ সেপ্টেম্বর (১৯৮১) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ঠিক করা হলে বিরোধী দলগুলো প্রতিবাদ জানায়। ঘোষণাটি ছিল একতরফা এবং বিরোধী দলগুলো তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের দাবি জানায়। তারা কয়েকটি পূর্বশর্তও দেয়। শর্তগুলোর মধ্যে ছিল জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার (জিয়া হত্যার পর জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল), রাজবন্দীদের মুক্তি, নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া এবং সব প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর থেকে সরিয়ে ১৫ নভেম্বর করা হয়।[১০]

নির্বাচনে প্রার্থীদের জন্য অঢেল সুযোগ-সুবিধা ছিল। প্রার্থীরা কয়েকজন সঙ্গীসহ বিনা ভাড়ায় বিমান ও রেলভ্রমণ, সার্কিট হাউস ও সরকারি অতিথিশালায় নিখরচায় থাকার সুবিধা, নির্বাচনের জন্য অল্প পরিমাণ টাকা জামানত হিসেবে জমা দেওয়া ইত্যাদির সুবিধা পেয়েছিলেন। ফলে অনেক ভুঁইফোড় ও ডামি প্রার্থী দাঁড়িয়ে যান। প্রথমে ৮৩ জন ব্যক্তি মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় ১১ জনের আবেদন বাতিল হয়ে যায়। এরপর ৩৩ জন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। শেষ পর্যন্ত ৩১ জন নির্বাচনের বাজারে টিকে থাকেন। নির্বাচনের নামে এটা ছিল নিতান্তই মশকরা। নয়জন প্রার্থীকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট মনোনয়ন কিংবা সমর্থন দেয়। ২২ জন ছিলেন 'স্বতন্ত্র' প্রার্থী।[১১]

সংবিধানের ৫০(খ) এবং ৬৬(২) (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য ছিলেন না। ১৯৮০ সালের ১০ জুলাই সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনীর মাধ্যমে তাঁকে নির্বাচনের যোগ্য করে তোলা হয়।[১২] অর্থাৎ আগেভাগেই সাত্তারের পক্ষের কুশীলবরা আটঘাট বেঁধে মাঠে নেমেছিলেন।

বিএনপি এককভাবে সাত্তারকে সমর্থন দেয়। আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন ড. কামাল হোসেন। দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাকের নামে প্রচারিত নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয় :

> আমরা বিশ্বাস করি, দেশবাসী তাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত সাথী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর মনোনীত প্রার্থী বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত সহচর, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ বাংলাদেশের সাবেক আইন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে এই নির্বাচনে জয়যুক্ত করবেন। আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যোগ্যতম প্রার্থী ড. কামাল হোসেনের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পাবে।...[১৩]

উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিএনপি সরকারের শাসন ও নীতির বিরুদ্ধে ১৯৭৯ সালের শেষে ১০-দলীয় ঐক্যজোট গড়ে উঠেছিল। এই জোটে আওয়ামী

লীগের সঙ্গে অন্যান্য 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও বাম দল ছিল। কিন্তু তারা জোটগতভাবে সাত্তারের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে পারেনি। ফলে জোট কার্যত ভেঙে যায়। ওসমানী 'নাগরিক কমিটি'র ব্যানারে প্রার্থী হন। তাঁকে সমর্থন দেয় আওয়ামী লীগ (মিজান), মজদুর পার্টি, বাসদ ও জাতীয় জনতা পার্টি। ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি, জমিয়তে উলেমায়ে ইসলাম ও বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি 'উলামা ফ্রন্ট' তৈরি করে মোহাম্মদ উল্লাহকে (হাফেজ্জী হুজুর) মনোনয়ন দেয়। ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (হারুন) ও সিপিবি 'প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শিবির' নামে জোট তৈরি করে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদকে নির্বাচনে প্রার্থী করে। জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল 'ত্রিদলীয় ঐক্যজোট' বানায় এবং মেজর এম এ জলিলকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়। পিপলস লীগ (গরিব নেওয়াজ) ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে (প্রগশ) সঙ্গে নিয়ে মোহাম্মদ তোয়াহা 'দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট' তৈরি করেন এবং নিজেই এই ফ্রন্টের প্রার্থী হন। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সমিতি তাঁকে সমর্থন দেয়। এ ছাড়া আরও ১৪টি দল মিলে তৈরি করেছিল 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'। এই ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে ছিল খন্দকার মোশতাকের ডেমোক্রেটিক লীগ, মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী), ইউপিপি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা), জাতীয় দল, জাতীয় লীগ, লেবার পার্টি ইত্যাদি। ইতিপূর্বে কারাদণ্ড ভোগ করার কারণে খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রার্থী হতে পারবেন না বলে এই জোট নির্বাচনে অংশ নেয়নি। অবশ্য তাদের নির্বাচন বর্জনের ব্যাপারটি ছিল একেবারেই তাৎপর্যহীন।[১৪]

বিএনপি যথারীতি ১৯ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পক্ষে ভোট চায়। ১৯ অক্টোবর আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে ১৭ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়া, ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন, সব কালাকানুন বাতিল ইত্যাদি। ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের নির্বাচনী ঘোষণায় বলা হয়, বাকশাল মুজিবের নামে এবং বিএনপি জিয়ার নামে ভোট চায়; কিন্তু ত্রিদলীয় জোট চায় সব পেশাজীবীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে দেশ বাঁচাতে। ওসমানী তাঁর ঘোষণায় ভারতের সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তি বাতিলের কথা বলেন। ওলামা ফ্রন্টের প্রধান কর্মসূচি ছিল রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সব ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর নীতি প্রবর্তন, খোলাফায়ে রাশেদিনের অনুকরণে মজলিশে শুরা বা জাতীয় সংসদ গঠন ইত্যাদি।[১৫]

সেনাপ্রধান এরশাদ বেশ খোলামেলাভাবেই বিএনপির পক্ষে অবস্থান নেন। ১৯৮১ সালের ১৮ অক্টোবর সাপ্তাহিক *হলিডে* পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে তিনি আওয়ামী লীগ ও জেনারেল ওসমানীকে নাকচ করে দেন এবং বলেন যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিএনপির কোনো বিকল্প নেই এবং

বিএনপি যদি জিততে না পারে তাহলে আওয়ামী লীগ এসে দেশকে আবার নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যাবে।[১৬]

নির্বাচনের ফলাফল ছিল একপেশে। বিএনপির প্রার্থী বিচারপতি সাত্তার শতকরা ৬৫ দশমিক ৮০ ভাগ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের কামাল হোসেন ৩৬ দশমিক ৩৫ ভাগ ভোট পেয়েছিলেন। বাকি সবাই মিলে শতকরা ২ ভাগ ভোটও পাননি। তাঁদের সবার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। 'দেশপ্রেমিক' ফ্রন্টের প্রার্থী সাম্যবাদী দলের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা নিজেকে মনে করতেন দেশের একমাত্র সাচ্চা বিপ্লবী এবং তাঁর বিচারে অন্যরা সবাই ছিলেন ষড়যন্ত্রকারী, সুবিধাবাদী কিংবা ভুয়া। তিনি যখন-তখন বিভিন্ন দলকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানাতেন। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস। দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে তিনিই পেলেন সবচেয়ে কম ভোট, শতকরা মাত্র ০.১৬ ভাগ।[১৭] এ দেশে অনেক 'বাম' নেতা নির্বাচনে যেতে চান না। তাঁদের অকাট্য যুক্তি, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মুক্তি আসে না। নির্বাচন হলে তাঁরা যে সমাজে একেবারেই পরিত্যক্ত হয়ে যান, এটা তাঁরা জানেন বলেই নানা ছলছুতোয় নির্বাচনের মুখোমুখি হতে ভয় পান।

বিচারপতি সাত্তার জিতবেন, এটা আগে থেকেই অনুমান করা গিয়েছিল। সাত্তারের প্রতি সেনাবাহিনীর সমর্থন, নিহত জিয়ার প্রতি সাধারণ মানুষের সহানুভূতি, বিরোধী দলগুলোর বৃহত্তর জোট তৈরি করার অক্ষমতা—সবই সাত্তারের পক্ষে গিয়েছিল। সংসদীয় গণতন্ত্র এবং বাহাত্তরের সংবিধান আমূল পাল্টে আওয়ামী লীগ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের চরিত্র বদলে দিয়েছিল। আওয়ামী লীগকে আবার তাদের করা চতুর্থ সংশোধনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ভোট চাইতে হয়েছিল। এ কারণে তাদের নির্বাচনী অস্ত্রটি ছিল নিতান্তই ভোঁতা। এ ছাড়া দলের প্রধান নেতা ছিলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন কামাল হোসেন। এই দ্বৈততা দলের মধ্যে কোনো আবেগ বা প্রণোদনা তৈরি করতে পারেনি। তবে এটা অস্বীকার করার জো নেই, বিরোধী দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগই ছিল সবচেয়ে সংগঠিত দল। আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে ওসমানী ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়ার বিরুদ্ধে ৪৪ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি (২১ দশমিক ৭০ ভাগ) ভোট পেয়েছিলেন। ১৯৮১ সালের নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রার্থী সাত্তারের বিরুদ্ধে তিনি মাত্র তিন লাখের কিছু বেশি (১ দশমিক ৩৯ ভাগ) ভোট পান। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, সিলেটে তাঁর নির্বাচনী এলাকার বাইরে ওসমানী সামান্যই ভোট পেয়েছিলেন।[১৮]

বাহাত্তরের পর থেকে জাসদ তরতর করে বেড়ে উঠছিল। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে তারা আটটি আসনে জয়ী হয়েছিল। যেসব জায়গায় জাসদের

সামরিক সংগঠন 'বিপ্লবী গণবাহিনী'র শক্ত অবস্থান ছিল, সেসব জায়গায় তাদের প্রার্থীরা বেশি সংখ্যায় জয় পেয়েছিলেন। কিন্তু ত্রিদলীয় ঐক্যজোট করেও তাদের কোনো লাভ হলো না। জলিলের ভরাডুবি হলো। তিনি ভোট পেলেন মাত্র আড়াই লাখের মতো। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ভোট পেয়েছিলেন আরও কম, সোয়া দুই লাখ (১ দশমিক ০৪ ভাগ)।[১৯] দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁদের মতো পোড় খাওয়া জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদেরা কেন প্রার্থী হতে গেলেন, তা শুধু তাঁরাই বলতে পারেন। এতে তাঁরা জনসাধারণের কাছে হাসির খোরাক হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদেরও অনেক যুক্তি ছিল। টাকার ছড়াছড়ি, পেশিশক্তির ব্যবহার, ভয়ভীতি ছড়ানো—এসব কারণে তাঁরা নাকি ভালো ফল করতে পারেননি। তাঁরা কমবেশি সবাই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁদের কথা শুনে মনে হয়, তাঁদের ভাষায় 'অবাধ ও সুষ্ঠু' নির্বাচন হলে তাঁরা জিতে যেতেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান দুই প্রার্থী ও দল সম্পর্কে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) বিশ্লেষণ আমলে নেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে দলটির মূল্যায়ন ছিল :

> প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ সম্পর্কে নানা রকম সংশয়, গোলমালের আশঙ্কা, বৃহত্তর জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকৃত আন্দোলন গড়ে না তোলা, অতীত সম্পর্কে আওয়ামী লীগের আত্মসমালোচনা না থাকা প্রভৃতি কারণে ব্যাপক জনগণ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাতে এগিয়ে আসে নাই।
>
> জিয়া জনগণের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, সে অর্থে তার একটা ভাবমূর্তিও রয়েছে। গরিবদের একাংশের মধ্যে এখনো সমর্থন রয়েছে। মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে সরকারবিরোধী সমালোচনা থাকলেও মানুষ সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্ত হয় নাই। ভোটে অধিকাংশ মানুষ স্থিতাবস্থার পক্ষেই থেকে যায়।[২০]

২০ নভেম্বর (১৯৮১) বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। ২৭ নভেম্বর ৪২ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা তৈরি হয়।[২১]

এরশাদের উত্থান

বিচারপতি সাত্তার তখনো রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হননি। সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ রীতিমতো 'মার্কটাইম' করছেন। ক্ষমতার মসনদটা তাঁর মনে হচ্ছিল হাতের নাগালের মধ্যেই। তাঁর জীবনে অনেক উত্থান-পতন গেছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সবুরে মেওয়া ফলে। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। খালেদ

মোশাররফ, আবু তাহের বা আবুল মঞ্জুরের মতো মাথা গরম করার লোক তিনি ছিলেন না।

১৯৮১ সালের অক্টোবরে তিনি নতুন একটা তত্ত্ব বাজারে ছাড়লেন, 'দেশ পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা থাকা দরকার।' অক্টোবরে লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এরশাদ তাঁর এ-সম্পর্কিত ভাবনা তুলে ধরেন। ১৮ অক্টোবর *গার্ডিয়ান*-এ ছাপা এরশাদের বক্তব্য ঢাকার সাপ্তাহিক *হলিডে* পত্রিকায় ছাপা হয়। এ ছাড়া *হলিডে*তে তিনি আলাদা একটা সাক্ষাৎকার দেন। *গার্ডিয়ান*-এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে এরশাদ বলেছিলেন :

> দেশে ভবিষ্যতে আর যাতে কোনো অভ্যুত্থান ঘটতে না পারে, সে জন্য সামরিক বাহিনীকে সরাসরি দেশের প্রশাসনে জড়িত রাখতে হবে। এটি করলে সেনাবাহিনীর লোকদের মনে দেশের স্থায়িত্ব রক্ষার দায় চাপবে। প্রশাসনের সঙ্গে নিজেরা জড়িত আছে বলে দেশের ভালো মন্দের দায়-দায়িত্ব তারা এড়াতে পারবে না। এতে অন্তত ক্ষমতাদখলের জন্য অভ্যুত্থান ঘটানোর নতুন কোনো প্রয়াস দেখা যাবে না। ভবিষ্যতে দেশে অভ্যুত্থান অর্থাৎ ক্যুদেতা বন্ধ করার জন্য যদি সেনাবাহিনীকে দেশের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তবে সেনাবাহিনীর লোকেরাও ভাববে, তারাও দেশের দায়িত্বশীল পদে রয়েছে, সেই দায়িত্ব তাদের পালন করা উচিত। এই ধরনের একটি মনোভাব জন্ম নিলে সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনো হতাশা থাকবে না। অভ্যুত্থান সৃষ্টির প্রবণতা বন্ধ হয়ে যাবে।[২২]

এরশাদ আশা করেছিলেন, তাঁর সমর্থনপুষ্ট বিচারপতি সাত্তার তাঁর পছন্দমতো পদক্ষেপ নেবেন এবং প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করবেন। কিন্তু নির্বাচনের পর সাত্তার এরশাদের কথার ধারেকাছে দিয়েও গেলেন না। সাত্তারের সোজা-সরল কথা, সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব হলো দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। সুতরাং তারা ব্যারাকেই থাকবে। সাত্তারের নতুন মন্ত্রিসভা ২৭ নভেম্বর শপথ নেয়। বেশির ভাগ পুরোনো মুখ নতুন মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পায়। শাহ আজিজুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বহাল থাকেন।

বিচারপতি সাত্তার বঙ্গভবনে বসে সাংবিধানিক সরকার চালাচ্ছিলেন। তবে বঙ্গভবন তখন আর ক্ষমতার একক কেন্দ্র ছিল না। সেনানিবাসে বসে জেনারেল এরশাদ তাঁর ইচ্ছেমতো ছক কাটছিলেন। মন্ত্রিসভার শপথের ২৪ ঘণ্টা পার না হতেই ২৮ নভেম্বর তিনি সেনা সদরে তাঁর পছন্দের কয়েকজন সংবাদপত্রের সম্পাদককে দাওয়াত দিলেন মন খুলে কিছু কথা বলার জন্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন *ইত্তেফাক*-এর আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, সাপ্তাহিক *হলিডে*র এনায়েতুল্লাহ খান, সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*র শাহাদত চৌধুরী এবং বিবিসির সংবাদদাতা আতাউস সামাদ। এর আগে *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় তিনি যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলো লিখে

তার সাইক্লোস্টাইল কপি দিলেন সম্পাদকদের। লেখাটির শিরোনাম ছিল, 'রোল অব দ্য মিলিটারি ইন পলিটিকস' (রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা)। বিষয়টি যাতে গণমাধ্যমে প্রচার না পায়, তথ্যমন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী সে জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজেই *দৈনিক বাংলা* অফিসে গিয়ে সম্পাদক শামসুর রাহমানের হাত থেকে এরশাদের লেখার কপিটি নিয়ে নেন। লেখাটি *ইত্তেফাক* ও *হলিডে* ছেপেছিল, বিবিসিও প্রচার করেছিল।[২৩]

বিচারপতি সাত্তার ২৯ নভেম্বর সকালে খবরের কাগজে এরশাদের লেখা পড়ে ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেন। কেউ কেউ এরশাদকে বরখাস্ত করার কথা বলেন। অন্যরা ভেবেচিন্তে কাজ করার পরামর্শ দেন। সব কথাই এরশাদের কানে যায়। তিনি বঙ্গভবনে এসে রাষ্ট্রপতিকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, তাঁর ভুল হয়ে গেছে। কোরআন শরিফ ছুঁয়ে শপথ করে বলেন যে এমন কথা তিনি আর বলবেন না এবং তিনি সেনাপ্রধান থাকাকালীন দেশে কোনো সামরিক অভ্যুত্থান হবে না। এরশাদ তাঁর শপথ ভঙ্গ করেছিলেন।[২৪]

সাত্তারের মন্ত্রিসভা দুভাগ হয়ে গিয়েছিল। এখানে নীতি বা আদর্শের কোনো বালাই ছিল না। একটা গ্রুপ ছিল সাত্তারের অনুগত। অন্য গ্রুপটি নানা ছলছুতোয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। তাদের মধ্যে টাকাপয়সা নিয়েও গোলমাল ছিল। নির্বাচন উপলক্ষে অনেক টাকা জোগাড় করা হয়েছিল। বিদেশ থেকেও টাকা এসেছিল। বিদেশ থেকে আসা বিরাট অঙ্কের একটা তহবিল একটা গ্রুপের হাতে চলে যায়। এই গ্রুপের সঙ্গে দুটো গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত ছিল। সামরিক বাহিনী সরকারের মধ্যে এ ধরনের একটা বিভাজন বজায় থাকুক, তা মনে-প্রাণেই চেয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মওদুদ আহমদ একসময় জিয়া সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পরে জিয়ার নেকনজর থেকে তিনি ছিটকে পড়েন এবং মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়িত হন। সাত্তারের সঙ্গে মওদুদের যোগাযোগ বেড়ে যাওয়ায় এরশাদ মওদুদকে একদিন টেলিফোন করে বললেন যে সাত্তারের সরকারে তাঁর যোগ দেওয়া ঠিক হবে না। এরশাদ বলেছিলেন, 'বিএনপিতে একমাত্র আপনারই ইমেজ আছে, আপনি এরকম একটি সরকারের সঙ্গে নিজেকে জড়াবেন কেন?' মওদুদের মনে হলো সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে মওদুদ বলেন, 'এরশাদের সঙ্গে নির্বাচনের আগে আমার কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু এবার তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত বলে মনে হলো।'[২৫]

বিএনপির মধ্যে একটা গ্রুপ বেগম জিয়াকে দলের চেয়ারপারসন নির্বাচন করতে চেয়েছিল। কিন্তু সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এবং সরকারের মন্ত্রীরা কেউ তা চাননি। কারণ, দুর্বল চরিত্রের সাত্তারকে দিয়ে যা খুশি করানো

সম্ভব ছিল। বেগম জিয়ার ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে চাননি কেউ। বেগম জিয়াকে দলের চেয়ারপারসন এবং সরকারের উপরাষ্ট্রপতি করার একটা প্রস্তাব ছিল। একপর্যায়ে বিচারপতি সাত্তারই দলের চেয়ারপারসন হওয়ার জন্য বেগম জিয়াকে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে বলেছিলেন। পরে মন্ত্রীদের চাপে তিনি নিজেই প্রার্থী হন। পরে সাত্তার বেগম জিয়াকে উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করলে বেগম জিয়া তা গ্রহণ করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই সরকারের দিন ফুরিয়ে এসেছে।[২৬]

জিয়ার মৃত্যুর পর দলের চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য ছিল। সাত্তারকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। পরে তিনিই পুরোদস্তুর চেয়ারম্যান হন। বেগম খালেদা জিয়া ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি বিএনপিতে যোগ দেন।[২৭] তখন থেকে তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া শুরু করেন। ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি শেরেবাংলা নগরে জাতীয় সংসদের নতুন ভবনটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি সাত্তার ও প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়াও উপস্থিত ছিলেন। সংসদ ভবন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার।

এরশাদ রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা দাবি করেছিলেন। এরশাদের প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার ১ জানুয়ারি (১৯৮২) রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়ে ছয় সদস্যের 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' তৈরি করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিরোধী দলের সদস্যরা জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল সম্পর্কে অনেকগুলো মুলতবি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু স্পিকার মির্জা গোলাম হাফিজ কোনো প্রস্তাবের ওপরই আলোচনা করার সুযোগ দেননি। ২৫ ফেব্রুয়ারি সাংসদ রাশেদ খান মেনন নিরাপত্তা কাউন্সিল-সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করলে স্পিকার সংসদের কার্যবিবরণী থেকে তা এক্সপাঞ্জ (বাদ) করে দেন। এর প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য সব বিরোধী দল পাঁচ মিনিটের জন্য ওয়াকআউট করে।[২৮]

বিএনপি সরকারের মধ্যে তখন দলাদলি চলছিল প্রকাশ্যেই। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অভিযোগ ছিল অনেকের বিরুদ্ধে। এ সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাকে উপলক্ষ করে সাত্তার সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। গণমাধ্যমেও বিষয়টি ব্যাপক প্রচার পায়। ঘটনাটি ছিল বিএনপির জনৈক ইমদুর গ্রেপ্তার নিয়ে।

ইমদাদুল হক ইমদু একসময় জাসদ করতেন। তিনি ঢাকার কালীগঞ্জ থানা গণবাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন। পরে বিএনপিতে যোগ দেন। কালীগঞ্জে

তাঁর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অন্ত ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, সম্পত্তি দখল, অপহরণ ও খুনের অনেক অভিযোগ ছিল। যুব উন্নয়নমন্ত্রী আবুল কাসেমের সরকারি বাসা থেকে ইমদুকে গ্রেপ্তার করা হয়। কাসেমের বিরুদ্ধে ইমদুকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। রাষ্ট্রপতি সাত্তার খুব বিব্রত হন। এটা ছিল সাত্তারের মন্ত্রিসভার মধ্যকার কোন্দলের একটা প্রকাশ। ওই সময় একটা প্রচার ছিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এম এ মতিন ঘটনাটি সাজিয়ে প্রতিপক্ষ গ্রুপের কাসেমকে ফাঁসিয়ে দেন। ড. মতিনের সঙ্গে যে এরশাদের যোগাযোগ ছিল, পরবর্তী সময়ে তা প্রমাণিত হয়। কাসেম ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৮২) সাত্তারের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েন। পত্রপত্রিকায় ইমদুর অপরাধের লোমহর্ষক সব ঘটনা প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে সাত্তার সরকারের যেটুকু গ্রহণযোগ্যতা ছিল, তাও মিলিয়ে যায়।[২৯] ১১ ফেব্রুয়ারি কয়েকজন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানান। এ প্রসঙ্গে মওদুদ আহমদের ভাষ্য এরকম :

> তাঁরা প্রেসিডেন্টকে প্রথমে অনুরোধ এবং পরে বেশ রূঢ় ভাষায় ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত সাত্তার তাঁর 'অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ' মন্ত্রিসভা বাতিল করতে রাজি হলেও ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি হননি। সামরিক অফিসাররা একটা মিশ্র মনোভাব নিয়ে ব্যারাকে ফিরে যান। তবে ক্ষমতা গ্রহণে ব্যর্থ হলেও জনসমক্ষে সাত্তার সরকারের ভাবমূর্তি ধূলিসাৎ করতে সক্ষম হওয়ায় তাঁদের মধ্যে একটি তৃপ্তিবোধও পরিলক্ষিত হয়।[৩০]

সাত্তার সরকারের পতন হলে যে সামরিক সরকার আসবে, এটা সবারই জানা ছিল। 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু'—এই আপ্তবাক্যটি তখন আওয়ামী লীগ মনে-প্রাণেই গ্রহণ করে। সংসদে বিরোধী দলের নেতা আসাদুজ্জামান খান সরকারের পদত্যাগ দাবি করে বলেন, এই সরকারের ওপর সেনাবাহিনীর আস্থা নেই। সামরিক শাসন দরজায় যখন কড়া নাড়ছে তখন আওয়ামী লীগ সাত্তার সরকারের প্রতি অনাস্থা জানায় এবং ৭ মার্চ (১৯৮২) বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে এক জনসভায় সাত্তার সরকারকে উৎখাতের আহ্বান জানায়।[৩১]

২৪ মার্চ ভোরবেলায় সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করেন। জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা দখলের পক্ষে বিচারপতি সাত্তারকে দিয়ে জোর করে বেতার ও টেলিভিশনে একটা ভাষণ দেওয়ানো হয়। ২৪ মার্চ এক ভাষণে জেনারেল এরশাদ বলেন, 'জনগণের ডাকে সাড়া দিতে হইয়াছে, ইহা ছাড়া জাতির সামনে আর কোনো বিকল্প ছিল না।'[৩২] ২৭ মার্চ এরশাদ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ

আহসানউদ্দীন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। আবদুস সাত্তার লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান।

সাত্তার সরকারের ক্ষমতার বৃত্ত থেকে ঝরে পড়া এবং সামরিক সরকারের ক্ষমতা দখলে বিএনপির প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ খুশি হয়েছিল, সন্দেহ নেই। সামরিক শাসন জারির পরপরই আওয়ামী লীগপন্থী দৈনিক *বাংলার বাণী* এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণকে সমর্থন দিয়েছিল। শেখ ফজলুল করিম সেলিম সম্পাদিত এই পত্রিকাটিতে মোনাজাতরত এক মহিলার ছবি ছাপা হয়—সামরিক আইন জারি হওয়াতে তিনি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছেন। আওয়ামী লীগ মনে করেছিল যে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপি তো গেল, এটাই লাভের দিক। গুজব আছে যে এরশাদ ক্ষমতা দখলের আগে নাকি আওয়ামী নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।[৩৩]

প্রশাসনিক সংস্কার

সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেই কিছু কাজ করে। এ ধরনের একটি কাজ হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা। এরশাদ দুর্নীতির বিরুদ্ধে রীতিমতো জিহাদে নেমে গেলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, তাঁর কোপটা গিয়ে পড়ল প্রধানত বিএনপির নেতাদের ওপর।

২৭ মার্চ (১৯৮২) বিএনপি সরকারের করা 'যুব কমপ্লেক্স' বাতিল করা হলো। জিয়াউর রহমান যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের জন্য যুব কমপ্লেক্স তৈরি করেছিলেন। গ্রামের সব হাটবাজার, খেয়াঘাট, গরু-ছাগলের খোঁয়াড় ইত্যাদি প্রায় সবই ইজারা দেওয়া হতো যুব কমপ্লেক্সের কর্মকর্তাদের। ফলে যুব সম্প্রদায় প্রায় উচ্ছন্নে গিয়েছিল। এরশাদ এই ব্যবস্থা বাতিল করলেন কতটা দুর্নীতি ঠেকানোর জন্য আর কতটা বিএনপিকে শায়েস্তা করার জন্য, তা নিয়ে বিতর্ক ছিল।

একই দিন শুরু হলো গণগ্রেপ্তার। বিএনপির মন্ত্রী এস এ বারী এ টি, সাইফুর রহমান, হাবীবুল্লাহ খান, তানভীর সিদ্দিকী, আতাউদ্দিন খানসহ ২৩৩ জন গ্রেপ্তার হন। এঁদের সবার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। 'রাষ্ট্রবিরোধী' কার্যকলাপের অভিযোগে আবুল হাসনাতও ধরা পড়েন। জামালউদ্দিন আহমদ অনেক আগেই মন্ত্রিত্ব হারিয়েছিলেন। তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ৩ এপ্রিল গঠন করা হয় সামরিক আদালত। ১৬ এপ্রিল সামরিক আদালত সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিন আহমদকে কারাদণ্ড দেন। বিএনপির সাবেক মন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমানকে তখন পুলিশ খুঁজছে। ২০ জুলাই তিনি নিজেই আত্মসমর্পণ করেন। ১৭

আগস্ট সাবেক যুব উন্নয়নমন্ত্রী আবুল কাসেমকে সামরিক আদালত চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। ২৬ এপ্রিল সামরিক আদালতের রায়ে এস এ বারী এ টিকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কে এম ওবায়দুর রহমান ৪ এপ্রিল ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ২৩ সেপ্টেম্বর দেশের সব পৌরসভা বাতিল করে দেওয়া হয়। দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ গ্রেপ্তার হন ১৪ নভেম্বর।

এ সময় জেনারেল এরশাদ কয়েকটি পদক্ষেপ নেন। ২২ এপ্রিল বিভাগীয় সদরে হাইকোর্টের বেঞ্চ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যুক্তি ছিল জনগণের কাছে বিচারব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া। বিচার বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করলেন, এটা হচ্ছে বিচার বিভাগকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র। এই আদেশের বিরুদ্ধে ঢাকার আইনজীবীরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ শুরু করেন।

এরশাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছিল নিতান্তই স্বাদেশিকতার ভাবনায় উজ্জ্বল। তিনি 'ঢাকা'র ইংরেজি বানান Dacca বদলে Dhaka রাখেন।

রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ থাকার কারণে এরশাদ ১৯৮২ সালটা মোটামুটি নির্বিঘ্নেই পার করলেন। ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৮২) এরশাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খান জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশ করেন। গোল বাধল এটা নিয়েই। এই শিক্ষানীতিতে প্রথম শ্রেণি থেকে আরবি ভাষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব ছিল। এমনিতেই স্কুলের শিশুদের বাংলা ও ইংরেজি এই দুটো ভাষা শিখতে হয়। তার ওপর আরবি চাপিয়ে দেওয়া হলে এটা শিশুদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এই যুক্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হলো।

যুগপৎ আন্দোলন

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখলের জন্য জেনারেল আইয়ুব খানের মডেল অনুসরণ করেছিলেন। আইয়ুব খান প্রথম কয়েকটা বছর নির্বিঘ্নেই ছড়ি ঘোরাতে পেরেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম চ্যালেঞ্জটি ছুড়ে দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ। উপলক্ষ ছিল শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, যার প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল। কমিশনের রিপোর্টটি পরে চাপা পড়ে যায়।

এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধেও প্রথম আওয়াজটি উচ্চারিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে। ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৮২) মজিদ খানের শিক্ষানীতি প্রকাশিত হয়। ৮ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও দৈনিক

ইনকিলাব-এর সম্পাদক মাওলানা মান্নান ঢাকায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের একটি সম্মেলন ডাকেন। জেনারেল এরশাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। এরশাদ সম্মেলনে তাঁর ভাষণে বলেন, 'এবার ২১ ফেব্রুয়ারিতে আলপনা আঁকা চলবে না', 'শহীদ মিনারে মিলাদ হবে' ইত্যাদি। এরশাদের এই বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মারাত্মক। এই সময় রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে একটা ১৫-দলীয় জোট তৈরি করে। ৩১ জানুয়ারি (১৯৮৩) এই জোট তৈরি হয়েছিল।[৩৪] জোটের গঠন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে জোটের অন্যতম নেতা হায়দার আকবর খান রনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন।

> শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের নেতা সিদ্দিকুর রহমানের বাসায় আমরা মিলিত হলাম—আমি, মেনন, রব ও সিদ্দিকুর রহমান।...আমরা চারজন ঠিক করলাম, এরশাদের এই বিবৃতির প্রতিবাদ জানাতে হবে। সম্ভাব্য সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাকে একত্র করে বসা দরকার।
>
> কিন্তু কে ডাকবে সেই সভা? আমরা তখনো তুলনামূলক তরুণ। কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাকে দিয়ে বৈঠক ডাকার ব্যবস্থা করা হোক। বিএনপি তখন সদ্য ক্ষমতাচ্যুত।...সামরিক শাসন জারির কিছুদিন পর আমি ও আরও কয়েকজন গিয়েছিলাম ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি দেখা দিতেও সম্মত হননি। তখন পর্যন্ত তিনিই বিএনপির নেতা। এই অবস্থায় রাজনৈতিক দলের তালিকা থেকে বিএনপিকে বাদ রাখা হয়েছিল। খালেদা জিয়া তখনো রাজনীতিতে আসেননি।
>
> অন্যদিকে আওয়ামী লীগকে দিয়ে সভা ডাকানো হোক, এটা আমরা চাইনি।...সর্বশেষ গেলাম মাওলানা তর্কবাগীশের বাড়িতে।...মাওলানা তর্কবাগীশের নামে তাঁরই বাসায় সভা ডাকা হলো। আমরা উপস্থিত চারজন বিভিন্ন দলের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। মস্কোপন্থী ধারার চারটি দল—সিপিবি, ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (হারুন), একতা পার্টিকে বলা হলো।...
>
> অন্য মেরুর বাম কমিউনিস্ট যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি।...আওয়ামী লীগ তো বটেই, জাসদের সঙ্গেও তাঁরা কোনো ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্মে যেতে বা একত্রে বসতে রাজি ছিলেন না। তবে কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহাকে পেয়েছিলাম।...
>
> ইতিমধ্যে আমরা একটা বিবৃতির খসড়া তৈরি করেছি। আওয়ামী লীগের নেতাদের ফোনে খসড়াটা পড়ে শোনানো হলো। ওই বিবৃতিতে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোনো উল্লেখ ছিল না বলেই সম্ভবত শেখ হাসিনার আপত্তি ছিল।...
>
> আমাদের বিবৃতি প্রস্তুত। এখন প্রেসে পাঠানো হবে। ঠিক সেই সময় আওয়ামী লীগের তরফ থেকে আবার ফোন। 'বিবৃতি কি প্রেসে পাঠানো হয়েছে?'

'না এখনো হয়নি।'

'তবে একটু অপেক্ষা করুন। আমরা আসছি।'

অপেক্ষা করলাম। দলেবলে আওয়ামী লীগ নেতারা এলেন। অবশ্য শেখ হাসিনা আসেননি। তাঁরা আমাদের বিবৃতিটি পড়লেন, কিছু যোগ-বিয়োগ করলেন। বললেন, আমরাও এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিচ্ছি। শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন না। কে যেন তাঁর স্বাক্ষরটা বসিয়ে দিলেন।...

তখন পঙ্কজ ভট্টাচার্য বললেন, 'এখনই প্রেসে পাঠাবেন না। আমি একটু ফোন করে আসি।'...কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন। বললেন, 'আমরাও সই করব। আমি চার পার্টিরই দায়িত্ব নিচ্ছি।' অর্থাৎ সিপিবি পরিবারের চার পার্টি সিপিবি, ন্যাপ (মো.), ন্যাপ (হারুন) ও একতা পার্টির পক্ষ থেকে পঙ্কজ ভট্টাচার্য একাই সম্মতি দিলেন এবং খুব সম্ভবত তিনি নিজেই সবার হয়ে স্বাক্ষর করলেন। তার মানে সেদিনের ঐতিহাসিক ১৫ দলের বিবৃতিতে অনেক স্বাক্ষরই ছিল ভুয়া...তবে অবশ্যই তাঁদের সম্মতির ভিত্তিতে।[৩৫]

এই জোটের শরিক দলগুলোর মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগ (হাসিনা), আওয়ামী লীগ (মিজান), আওয়ামী লীগ (ফরিদ গাজী), জাসদ, বাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (হারুন), সিপিবি, সাম্যবাদী দল (তোয়াহা), সাম্যবাদী দল (নগেন), জাতীয় একতা পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল এবং জাতীয় মজদুর পার্টি। জোটে দলের সংখ্যা কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে। তা সত্ত্বেও '১৫-দলীয় জোট' নামটির পরিবর্তন হয়নি।[৩৬]

রাজনৈতিক দলগুলো জোটবদ্ধ হওয়ার আগেই ছাত্রসংগঠনগুলো এরশাদবিরোধী মোর্চা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের স্মরণে ১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন করার জন্য ১৪টি ছাত্রসংগঠন তৈরি করে 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। পরে এই পরিষদে আরও পাঁচটি ছাত্রসংগঠন যোগ দিলে ১৯-দলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তারা একটা ১০ দফা দাবিনামাও তৈরি করে। তাদের মূল দাবি ছিল মজিদ খানের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাতিল করা। ২১ নভেম্বর (১৯৮২) তৈরি হওয়া ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে একে একে যোগ দেয় ছাত্রলীগ (জালাল-জাহাঙ্গীর), ছাত্রলীগ (ফজলু-চুন্নু), ছাত্রলীগ (মুনীর-হাসিব), ছাত্রলীগ (রশীদ-রতন), ছাত্রলীগ (ওয়ারেশ-জহীর), ছাত্রলীগ (আখতার), ছাত্রলীগ (আজিজ), বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (ইসরারুল-স্বপন), বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (মানু), বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (গিরানি), বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি, জাতীয় ছাত্র সংসদ, সমাজবাদী ছাত্র জোট এবং ছাত্র একতা কেন্দ্র।[৩৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে জাসদ-ছাত্রলীগ ছিল সবচেয়ে

শক্তিশালী। এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মুনীর উদ্দিন আহমদ ও আবুল হাসিব খান। এর পরই ছিল ফজলুর রহমান ও বাহালুল মজনুন চুন্নুর নেতৃত্বাধীন বাকশাল-সমর্থক ছাত্রলীগ। আওয়ামী লীগ-সমর্থক ছাত্রলীগের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র জমায়াতের আহ্বান জানিয়ে দেয়াল লিখন

নেতৃত্বে ছিলেন মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এবং খ ম জাহাঙ্গীর। ওঁরা প্রথম দিকে আন্দোলনে আসেননি। শেষ মুহূর্তে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে যোগ দেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৮৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছিল খুবই উত্তপ্ত। ওই দিনের ঘটনার একটা বয়ান পাওয়া যায় বাকশালের ওই সময়ের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম ইউসুফের কাছ থেকে।

> আজিমপুরে জাসদের মনিরুল ইসলামের বাসা আমাদের টেমপোরারি কন্ট্রোল রুম। গ্যাদারিং যদি কম হয়, তাহলে ইউনিভার্সিটি এলাকায় মিছিল শেষ হবে। আর যদি কয়েক হাজার গ্যাদারিং হয়ে যায়, তাহলে মিছিল নিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা হবে। দেখা গেল ব্যাপক গ্যাদারিং হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে হাসানুল হক ইনু। খবর পাঠালাম, ব্যারিকেড-ট্যারিকেড উড়িয়ে দাও। শুনতে খারাপ লাগে। কিন্তু পলিটিকসে এসব জায়েজ। মিছিল সাংঘাতিক জঙ্গি হয়ে গেল। নেতারা মিছিলের সামনে থেকে মাঝামাঝি চলে এল। পুলিশ গুলি করল। এর মধ্যে টেলিফোন আসতেছে ওখানকার পরিস্থিতি জানিয়ে। ইনু বলতেছে, এ্যাই, লাশ কয়টা পড়ছে? তাড়াতাড়ি এগুলি ছিনাইয়া নেওয়ার চেষ্টা কর, মেডিকেলে নিয়ে যাও। লাশ যত পড়ে তত ভালো। আমরা চাচ্ছি যে, গুলি-টুলি হলে দু-চারজন উন্ডেড হোক। একেবারে নিহত হয়ে পড়ে যাবে এটা তো চিন্তা করি নাই। জিজ্ঞেস করলাম, কে ফোন করছে। বলল, হাসিব ফোন করছে ওখানকার অবস্থা জানানোর জন্য। হাসিব তো তখন জঙ্গি নেতা। তারা যা করেছে, ঠিক আছে, নেতার নির্দেশেই করেছে। নিহতের ঘটনা, একটু বিচলিত ভাব থাকে না? ইনু দেখলাম একেবারে নরমাল।[৩৮]

মিছিলে গুলি হলে হাসিব কাছাকাছি ফজলুল হক হলের প্রভোস্টের কামরা থেকে সিরাজুল আলম খানকে ফোন করেছিলেন। ফোনের রিসিভার তুলেও তিনি কোনো কথা বলেননি, একদম নির্বাক। জাসদে তখন 'গ্যাংগ অব ফাইভ'-এর প্রতাপ—কাজী আরেফ আহমদ, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, মনিরুল ইসলাম, হাসানুল হক ইনু এবং এ বি এম শাহজাহান। আজিমপুরে মনিরুল ইসলামের বাড়িতে সলাপরামর্শ হয়। 'গ্যাংগ অব ফাইভ' সব কাজে ইনুকে সামনে ঠেলে দিত। ইনু দলের হয়ে ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। নির্দেশ আসত সিরাজুল আলম খানের কাছ থেকেই। কিন্তু এই ঘটনার পর রহস্যজনকভাবে তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান।[৩৯]

১৯৮৩ সালের ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। কমপক্ষে পাঁচজন ছাত্র নিহত ও শতাধিক ছাত্র আহত হয়।[৪০] নিহত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন জয়নাল, কাঞ্চন, মোজাম্মেল, জাফর ও দীপালি সাহা।[৪১]

রাজনীতির মঞ্চের সাজানো চেহারা আর গ্রিনরুমের আসল চেহারার মধ্যে

অনেক ফারাক। রাজপথে যখন 'আন্দোলন' হয়, নেপথ্যে তখন চলে নানা খেলা। এ প্রসঙ্গে এস এম ইউসুফ চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন :

> জিল্লুর রহিম দুলাল বাকশালের প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন আহমেদের মেয়ের জামাই, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৫ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর দুলাল একজনকে নিয়ে আমার বাসায় এল। পরিচয় হলো, মেজর মুন্না (মুনীরুল ইসলাম চৌধুরী), তাজউদ্দীনের মেয়ের জামাই। সে জেনারেল চিশতির দালাল। বলল, পনেরোটা দিনের জন্য ইউনিভার্সিটি ঠান্ডা করেন, মুনীর-হাসিব, ফজলু-চুন্নু এদের ইউনিভার্সিটি এলাকা থেকে অ্যাবসেন্ট করে দেন। বললাম, মুনীর-হাসিব তো আমার কমান্ডে না। সে বলল, আপনার কমান্ডে ফজলু-চুন্নু, তাদেরকে করে দেন। আপনার জন্য পনেরো লাখ টাকা নিয়ে এসেছি। মুন্না একটু বেয়াদব টাইপের, অ্যাগ্রেসিভ। ব্রিফকেস খুলে দেখাল, নোটের বান্ডিল।
>
> বললাম, এইটা আমার পক্ষে সম্ভব না। তারা রাজ্জাক ভাইয়ের কমান্ডে। দুলাল বলল, আমি জানি আপনিই কমান্ড করেন, রাজ্জাক ভাই তো নেতা আছেনই। আপনি চাইলেই এটা হয়ে যায়। ওদেরকে কিছু টাকা দিয়া দেন, ঢাকার বাইরে চলে যাক। মুন্না বলল, টাকা কি কম হইছে? আপনি বললে আরও পাঁচ লাখ নিয়া আসতে পারি। আমি দেখলাম মিলিটারির লোক, কখন ধরে নিয়ে যায়, মেরে ফেলবে। বললাম, দেখি ভাই একটু চিন্তা করি। সিগারেট আনার কথা বলে ভেতরের ঘরে গিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে লাফ দিয়ে একটা রিকশায় উঠে পিন্টুর বাসায়।
>
> দশ-পনেরো দিন পরে যখন নরমাল হইছি, দুলালের বাসায় গেলাম। দুলাল বলল, ইউসুফ ভাই, আপনি নিজে তো লস করলেন, আমারও লস করাইলেন। চাইলেই বিশ লাখ টাকা পাইতেন, আমিও দুই-এক লাখ পাইতাম। কোনোটাই হইতে দিলেন না। আপনি করেন নাই। আমরা তো করাইয়া আনছি। তিন লাখ বাঁচছে। বাকশাল নেতারে দিলাম সাত লাখ, জাসদের নেতা নিল পাঁচ লাখ। কোথায় পেমেন্ট হইল? এসবির ডিআইজি মোরশেদের বাড়িতে। এরশাদের খুব কনফিডেন্সের লোক। তার বাড়িতে পলিটিশিয়ানদের গোপন বৈঠক-টৈঠক হইত।[৪২]

লক্ষণীয় যে, বিএনপি-সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়নি। ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে এই বিভেদ ছিল জাতীয় রাজনীতির বিভাজনেরই প্রতিফলন। ১৯৮৫ সালের ২২ নভেম্বর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (লু-আ), জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) সমর্থিত ছাত্রলীগ ও অন্য পাঁচটি ছাত্রসংগঠন মিলে 'সংগ্রামী ছাত্রজোট' তৈরি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক সমাবেশে এই ছাত্রজোট সব রাজবন্দীর মুক্তি ও প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার দাবি জানায়।[৪৩]

১৯৮৩ সালে বিএনপিতে ভাঙন ধরে। দলটি মূলত টিকে ছিল জিয়াউর

রহমানের প্রবল ব্যক্তিত্বের কারণে। তাঁর মৃত্যুর পর এবং দলের নতুন চেয়ারম্যান বিচারপতি সাত্তারের দুর্বল নেতৃত্বের কারণে দলটির শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। তার ওপর ছিল জেনারেল এরশাদের ছলচাতুরী। তিনি নিজের জন্য একটা রাজনৈতিক ভিত তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্বসূরি জিয়ার মডেলটিকেই অনুসরণ করতে চাইলেন। তাঁর কাজ হলো বিএনপি থেকে লোক ভাগিয়ে নিয়ে আসা, যাতে করে বিএনপি দুর্বল হয় এবং বিএনপি থেকে বেরিয়ে আসা লোকেরা একটা শক্ত জমির ওপর দাঁড়াতে পারেন। এরকম একটা ভিত তৈরি করার জন্য এরশাদের দরাজ সাহায্য ছিল।

বেগম খালেদা জিয়াকে ১৯৮৩ সালের মার্চে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। বিএনপি ভাঙার প্রথম কাঠিটি নাড়লেন জিয়া সরকারের সাবেক তথ্যমন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী এম এ মতিন। হুদা ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন পোড় খাওয়া, সজ্জন এবং সংস্কৃতিমনা। কিন্তু ভাঙা-গড়ার রাজনীতিতে তিনি বেশ পারঙ্গম হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মতিন ও আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপির একটা কমিটি করে ফেললেন। ঢাকার মিরপুরে বিউটি সিনেমা হলে তাঁরা বিএনপির নামে সম্মেলন ডেকে চেয়ারম্যান সাত্তার ও ভাইস চেয়ারম্যান খালেদা জিয়াকে বহিষ্কার করলেন। এই সম্মেলনে হুদা ও মতিনকে যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও মহাসচিব নির্বাচিত করা হলো। গণমাধ্যমে তাঁদের দল বিএনপি (হুদা) নামে পরিচিতি পেল। পরে তাঁরা এরশাদের তৈরি 'জনদলে' যোগ দেন।

একই সময়, অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে বিএনপির তৃতীয় সারির নেতা খালেকুজ্জামান দুদু এবং শেখ শওকত হোসেন নিলু বিএনপির নামে আরেকটা কমিটি তৈরি করেন। এই দলের পরিচিতি হলো বিএনপি (দুদু-নিলু)। পরে দলটি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য নাম পাল্টে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল রাখে।

বিচারপতি সাত্তার বেগম জিয়াকে দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান করতে সমর্থ হওয়ায় সাত্তারের নেতৃত্বাধীন কমিটি মূল ধারার বিএনপি হিসেবে পরিচিতি পায়। বেগম জিয়া তখন একটু-আধটু প্রকাশ্যে আসছেন এবং দলের সর্বস্তরের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তবে রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নিতান্তই নবিশ। তিনি কখনোই ভাবেননি রাজনীতি করবেন। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁকে দলীয় রাজনীতিতে টেনে আনা হয়। তাঁর ভাষায়, 'রাজনীতি আমি বুঝতাম না।'[৪৪]

আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র করে ১৫-দলীয় জোট তত দিনে তৈরি হয়ে গেছে। ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে তৈরি হলো '৭-দলীয় জোট'। এই জোটের শরিক হলো বিএনপি, ইউপিপি, ডেমোক্রেটিক লীগ (রউফ), বাংলাদেশ জাতীয় লীগ,

ন্যাপ (নূরু-জাহিদ), জাগমুই এবং বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ।[৪৫] জোটের নাম '৭-দলীয় জোট' হলেও এর সঙ্গে সব সময় সাতটি দল থাকেনি। দলের সংখ্যা কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে। এরশাদ অসামরিক সরকার গঠনের টোপ দিলে আতাউর রহমান খান সুড়সুড় করে এরশাদের পক্ষপুটে আশ্রয় নেন এবং তাঁর অধীনে প্রধানমন্ত্রীর চাকরি গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর দল জাতীয় লীগ ৭-দলীয় জোট ছেড়ে যায়।

এরশাদ তখন রাজনীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। প্রথমে তিনি বানালেন '১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদ'। এর আহ্বায়ক ছিলেন লক্ষ্মীপুরের আইনজীবী মাহবুবুর রহমান। পরে সেটা 'জনদল' হয়ে গেল। কিছুদিন পরে কমিউনিস্ট লীগ এবং কাজী জাফরের অনুগত ইউপিপি ৭-দলীয় জোট ছেড়ে এরশাদের কক্ষপথে ঘুরপাক খেতে থাকে। ওখানে পদোন্নতির সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। '৭-দলীয় জোট' নামটি বহাল তবিয়তেই টিকে থাকে। এই জোটে সব সময় বিএনপির প্রাধান্য ছিল।[৪৬]

সরকারে থাকলে যা খুশি করার একটা সহজাত প্রবণতা থাকে। ক্ষমতার কাছে যুক্তি বারবার পরাজিত হয়। ক্ষমতা থেকে ছিটকে গেলে পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে যায় এবং ক্ষমতায় থাকাকালীন তাঁদের কাজগুলোর বিরুদ্ধে পরে তাঁরাই জোরগলায় কথা বলতে শুরু করেন। বিএনপির বেলায়ও এমনটি হলো।

বিএনপির নেতৃত্বে ৭-দলীয় জোট একটা ১২ দফা দাবি পেশ করে। দাবিগুলোয় এমন সব কথা ছিল, যা ক্ষমতায় থাকাকালে তারা অবলীলায় অস্বীকার করেছে বা এড়িয়ে গেছে। কয়েকটি দাবির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

১। সামরিক আইন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে : (উল্লেখ্য, এখানে ছয়টি দাবির কথা বলা হয়েছে এবং জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের সময় এই দাবিগুলো উপেক্ষিত ছিল। সব ধরনের নির্বাচন শেষ করার পর জিয়া সামরিক আইন তুলে নিয়েছিলেন।)

২। (ঘ) অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে রাষ্ট্রপতিকে সামরিক বাহিনীর প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া উচিত (জিয়া নিজে সামরিক বাহিনীর প্রধানের পদে থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছিলেন)।

(ঙ) অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের কোনো সদস্য মন্ত্রী থাকাকালে নির্বাচনে প্রার্থী হতে

পারবেন না (১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জিয়া সরকারের মন্ত্রীরা এ কাজটি করেননি)।

৪। (ক) যেসব সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সাংসদকে বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের দণ্ডাদেশ, রায় ও হুকুম বাতিল এবং সব সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সাংসদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত/বিচারাধীন মামলা অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। সাবেক মন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় যেসব সরকারি কর্মচারী বা নাগরিক আসামি হিসেবে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কারাভোগ করছেন, তাঁদের অনতিবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

(খ) সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রনেতা এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সব মামলা, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার করতে হবে।[৪৭]

বিএনপি মূলত তাদের কারাবন্দী নেতাদেরই মুক্তি চেয়েছিল। তারা হয়তো ভুলে গিয়েছিল, ১৯৭৯ সালে অনেক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে জেলে রেখেই সংসদ নির্বাচন করা হয়েছিল। ওই সময় জাসদের মেজর (অব.) এম এ জলিলের যাবজ্জীবন ও আ স ম আবদুর রবের ১০ বছরের কারাবাস হয়েছিল, যদিও নির্বাচনের পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

৭-দলীয় জোট যখন তৈরি হয়, তখন খালেদা জিয়া এই জোটের সমন্বয়ক মনোনীত হন। ১৯৮৩ সালের ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর ৭ ও ১৫ দলের নেতাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সভার মধ্য দিয়ে এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর দুই জোট পাঁচ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। তাঁদের দাবির মধ্যে ছিল অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার, সার্বভৌম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ছাত্রহত্যার তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের বিচার। বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রথমবারের মতো 'যুগপৎ আন্দোলন'-এর ধারণা চালু হয়।

এরশাদের সাঙ্গোপাঙ্গ

বাংলায় একটা প্রবাদ চালু আছে, ভাত ছিটালে কাকের অভাব হয় না। এরশাদ এটা খুব ভালো করেই জানতেন। এ সময় অনেকেই এরশাদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে থাকেন। তাঁদের অবশ্য নানান যুক্তি, নানান বাহানা ছিল। কেউ বলতেন, এটা বিরাজমান দ্বন্দ্বের সঠিক অনুধাবন ও ব্যবহার; কেউ-বা বলতেন, এরশাদের

মধ্যে তাঁরা একজন যুগান্তকারী দার্শনিকের সন্ধান পেয়েছেন। অবশ্য কেউ কেউ প্রকাশ্যেই বলতেন, অনেক দিন তো আন্দোলন করলাম, কষ্ট করলাম, জেল-জুলুম সহ্য করলাম, কিন্তু ভাগ্যের তো পরিবর্তন হলো না; এবার শেষ চেষ্টা করে দেখি কিছু একটা পাই কি না।

এরশাদের পক্ষ থেকে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা বিভিন্ন রাজনীতিবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। এ প্রসঙ্গে হায়দার আকবর খান রনো তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

> ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময়...হঠাৎ এক যুবক প্রবেশ করল ঘরে।...মেজর মুনীর। তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জামাতা। সাদাপোশাকেই এসেছিলেন।...বললেন, 'রনো ভাই, আপনারা কি এখনো ১৮৪৮ সালেই পড়ে থাকবেন। দুনিয়া কত বদলে গেছে।...এখন বিরাট সুযোগ এসেছে। এরশাদকে ব্যবহার করে আপনারা আপনাদের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে পারেন। লোকটি গণমুখী।...কতকাল ক্ষমতার বাইরে থাকবেন? বিপ্লব তো আজকাল হবে না।...এমন সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।...
>
> এরশাদ রাজনীতিবিদদের মধ্য থেকে দালাল খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। উক্ত মেজর সেই কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[৫৫]

রাজনীতির হাটে নেতা বেচাকেনার ব্যাপারে এরশাদ ছিলেন একজন পাকা ফড়িয়া। বিভিন্ন দলের অনেক চাঁইকে তিনি ডিগবাজি খাওয়ালেন। জাসদের সিরাজুল আলম খান ও আ স ম আবদুর রব প্রথম দিকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে থাকলেও পরে পিঠটান দেন। এ জন্য তাঁরা একটা তাত্ত্বিক ভিত্তিও দাঁড় করান।

রব অবশ্য পরে পুরস্কৃত হয়েছিলেন এবং তাঁর কল্যাণে বাংলাদেশের রাজনীতির অভিধানে 'গৃহপালিত বিরোধী দল' শব্দটি চালু হয়। জাসদ অবশ্য ভেঙে যায়। মির্জা সুলতান রাজা ও শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে আলাদা কমিটি হয়। দলের অফিস তাঁদের দখলে থাকে।

মিজানুর রহমান চৌধুরী তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের গ্রুপটি বিলুপ্ত করে এরশাদের দলে ভিড়ে যান। এরশাদ সরকার দুর্নীতির অভিযোগে মওদুদ আহমদকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল। মওদুদ হঠাৎ ছাড়া পেয়ে এরশাদের গুণকীর্তন শুরু করলেন। ১৫ দল ও ৭ দলের একটা লিয়াজোঁ কমিটি ছিল। এই কমিটিতে ১৫ দলের পক্ষে কোরবান আলী এবং ৭ দলের পক্ষে ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী দায়িত্ব পালন করতেন। একদিন তাঁরা দুজনই হাওয়া হয়ে গেলেন। সন্ধ্যায় বেতারের খবরে জানা গেল, তাঁরা এরশাদের মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। ঠিক তার কয়েক দিন পর কাজী জাফর আহমদও মন্ত্রী হয়ে গেলেন।

এ প্রসঙ্গে হায়দার আকবর খান রনো একটা মজার কথা বলেছেন :

> একদিন এক বিয়ের অনুষ্ঠানে মওদুদ আহমদের সঙ্গে দেখা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন, 'তোমরা কাজী জাফরের সঙ্গে এতকাল ছিলে কী করে, এত সহজে মন্ত্রিত্বের টোপ গিলল?' আশ্চর্য! তার মাত্র দুদিন পর দেখি মওদুদ সাহেবও মন্ত্রী হয়েছেন।[৪৯]

জাতীয় পার্টির উত্থান

১৯৮৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ ও ৭ দল যুগপৎ আন্দোলন শুরু করে। ৩০ সেপ্টেম্বর তারা আলাদাভাবে ঢাকায় দুটি জনসভা করে। দুই জোট ১ নভেম্বর হরতাল ডাকে। পিকেটিং ছাড়াই হরতাল সফল হয়। ২৮ নভেম্বর উভয় জোটের সচিবালয় ঘেরাও করার কর্মসূচি ছিল। ওই দিন জিপিও-পল্টন এলাকায় অনেক লোকের সমাবেশ হয়েছিল। একপর্যায়ে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াও আসেন এবং দুজন দুই জায়গায় পথের ওপর বসে পড়েন। রাজপথে খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এটাই প্রথম অংশগ্রহণ।[৫০]

সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিল। বেশির ভাগই ছিল ঢাকার সাধারণ নাগরিক। এমন সময় একদল তরুণ সচিবালয়ের দেয়াল ভাঙতে শুরু করল। আন্দোলনকারীদের পরিকল্পনায় সচিবালয়ের দেয়াল ভাঙার কথা ছিল না। গুঞ্জন ওঠে, এটা সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার কাজ, উসকানি দিয়ে বিপদ ডেকে আনার পাঁয়তারা। অনেক মানুষ ভাঙা দেয়ালের মধ্য দিয়ে সচিবালয়ে ঢুকে পড়ে। পুলিশ তৎপর ছিল। প্রচুর গোলাগুলি হয়। কতজন যে হতাহত হয়েছিল, তার হিসাব কেউ রাখেননি।

ওই রাতেই রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। দুই জোটের প্রধান নেতা খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে গৃহবন্দী করা হয়।

প্রচলিত ফর্মুলা অনুযায়ী ১১ ডিসেম্বর (১৯৮৩) রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরী 'স্বাস্থ্যগত' কারণে পদত্যাগ করেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেন। ২৭ ডিসেম্বর সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক থানাগুলোর মান পর্যায়ক্রমে উন্নত করার ঘোষণা দিয়ে এগুলোকে 'উপজেলা' নামকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এবং বিভিন্ন বিভাগ/অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উপজেলা পর্যায়ে নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়। এর আগে থানা পর্যায়ে মাত্র তিনজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন—সার্কেল অফিসার

(উন্নয়ন), সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) এবং পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)। এবার সেখানে ১৫-২০ জন কর্মকর্তা পাঠানো হলো। প্রধান সমন্বয়কারী কর্মকর্তাকে থানা নির্বাহী অফিসার (টিএনও) নাম দেওয়া হলো। পরে থানার নাম পাল্টে উপজেলা রাখা হলে তাঁর পদবি হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)। অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (এডিসি) পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে টিএনও/ইউএনও হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে উপজেলার প্রশাসনিক গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়।

২০ ডিসেম্বর হরতাল পালন করার কর্মসূচি আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এর মধ্যে নেপথ্যে অনেক কিছু ঘটে গেল। ১৫ দল ২০ ডিসেম্বরের হরতাল স্থগিত ঘোষণা করল। বলা হলো, ৪ জানুয়ারি (১৯৮৪) হরতাল হবে। কিন্তু ৪ জানুয়ারি কোনো হরতাল হয়নি। এরশাদবিরোধী আন্দোলন যেন হঠাৎ করেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

ওয়ার্কার্স পার্টির (তখনো এই নাম হয়নি) ভেতরে রনো-মেনন হঠকারিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন। রনোকে সরিয়ে নজরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। ফলে দল ভেঙে যায়। নিজেদের সমর্থকদের নিয়ে রনো-মেনন পার্টি পুনর্গঠন করেন। মেনন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অমল সেন-নজরুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন অংশটি এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৮৫ সালের শেষে আবুল বাশারের নেতৃত্বে মজদুর পার্টির একটি অংশ রনো-মেননদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ওয়ার্কার্স পার্টি তৈরি করে।[৫১]

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারকাঠামোও নির্ধারণ করা হয়। এ কাঠামো অনুযায়ী উপজেলার জন্য একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের ব্যবস্থা রাখা হয়। তিনি ওই উপজেলার সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানরা পদাধিকারবলে উপজেলা পরিষদের সদস্য হবেন। ইউএনও হবেন উপজেলা পরিষদের নির্বাহী সচিব। এ ছাড়া অন্য বিভাগীয় কর্মকর্তারাও পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকবেন। তবে ইউএনও এবং অন্যান্য কর্মকর্তার কোনো ভোটাধিকার থাকবে না। সামরিক শাসনের আওতায় হলেও উপজেলা পরিষদ আইন ছিল একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

১৯৮৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি এরশাদ ঘোষণা করেন যে পরবর্তী ২৬ মার্চ থেকে অবাধ রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে এবং ২৭ মে একই দিনে রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৭ ও ১৫-দলীয় জোট সবার আগে জাতীয় সংসদের নির্বাচন দাবি করে। তারা জোটভুক্ত দলের নেতা-কর্মীদের উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান

জানায়। তাদের দাবির মুখে এরশাদ ১৮ মার্চ (১৯৮৪) উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন।[৫২]

এ সময় বিএনপিতে একটি পরিবর্তন আসে। ১ এপ্রিল (১৯৮৪) দলের বর্ধিত সভায় বেগম খালেদা জিয়া ভাষণ দেন এবং দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

ঠিক এই সময় জামায়াতে ইসলামী নতুন এক রাজনৈতিক দাবি নিয়ে মাঠে হাজির হয়। ১০ এপ্রিল (১৯৮৪) জামায়াত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের এবং তাদের নেতা গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়। অন্যদিকে ১৫-দলীয় জোট তাদের দেওয়া আগের পাঁচ দফা দাবির সঙ্গে আরও পাঁচটি নতুন দাবি যোগ করে। নতুন দাবিগুলোর মধ্যে ছিল সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ছাত্রনেতাদের কারাদণ্ড মওকুফ, সামরিক আইনে মৃত্যুদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডপ্রাপ্ত নেতা-কর্মীদের মুক্তি এবং সামরিক আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত সব ব্যক্তিকে হাইকোর্টে আপিলের সুযোগদান, ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার, আদমজীর শ্রমিকনেতা হত্যার বিচার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।[৫৩]

দুই জোটের মধ্যে নিয়মিত কথাবার্তা চলছিল। তবে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিল ঠুনকো। মনে হচ্ছিল, এরশাদ সরকার নানা ছুতোনাতায় এ সম্পর্কে চিড় ধরাতে এবং কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে জোটভুক্ত নেতাদের কিংবা কোনো একটি জোটকে বগলদাবা করে ফেলতে পারবে। ঠিক এমন সময় বিএনপিতে গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিবর্তন ঘটে। দলের বর্ষীয়ান চেয়ারম্যান বিচারপতি সাত্তার পদত্যাগ করেন এবং দলের ভাইস চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়াকে ১০ মে (১৯৮৪) আনুষ্ঠানিকভাবে দলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। শুরু হলো নতুন নেতৃত্বে বিএনপির পথচলা।

জেনারেল এরশাদ রাজনীতির ব্যাপারে জিয়াকেই গুরু মানতেন। জিয়া যেভাবে ক্ষমতায় থেকে দল বানানো শুরু করেছিলেন, এরশাদও একই পদ্ধতি অনুসরণ করলেন। জিয়াকে এ ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন তাঁর সহকর্মী মেজর জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু। এরশাদ এ কাজে পেয়ে গেলেন মেজর জেনারেল নাজিরুল আজিজ চিশতিকে।

এরশাদ ১৯৮৪ সালের নভেম্বরে 'জনদল' তৈরি করেন। সাবেক রাষ্ট্রপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে দলের আহ্বায়ক বানান। রাষ্ট্রপতির চাকরি হারানোর পরে আহসানউদ্দিনের এটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কর্ম কিংবা অপকর্ম। বিএনপি, মুসলিম লীগ, জাসদ, ন্যাপ (ভাসানী) এবং আওয়ামী লীগেরও কয়েকজন নেতা অবলীলায় জনদলে যোগ দেন। জনদলে যোগ দেওয়া

রাজনীতিবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিএনপির শামসুল হুদা চৌধুরী ও ডা. মতিন এবং আওয়ামী লীগের মিজানুর রহমান চৌধুরী ও মোহাম্মদ হানিফ। কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তাও এ দলে যোগ দিয়েছিলেন।[৫৪] এরপর এরশাদ কয়েকটি দলকে নিয়ে তৈরি করেন 'জাতীয় ফ্রন্ট'। ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে ছিল বিএনপি (শাহ আজিজ গ্রুপ), জনদল, মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী), গণতন্ত্রী দল এবং ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (কাজী জাফর)। মওদুদ আহমদ এবং আনোয়ার হোসেন মঞ্জুও জাতীয় ফ্রন্টে যোগ দেন।

১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ এরশাদ একটা গণভোটের আয়োজন করেন। এটা ছিল ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত জিয়াউর রহমানের হ্যাঁ-না ভোটের অনুরূপ। নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হলো, ভোটার উপস্থিতি শতকরা ৭২ দশমিক ১৪ ভাগ; 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছিল শতকরা ৯৪ দশমিক ১৪ ভাগ।[৫৫] এই সংখ্যা কেউ বিশ্বাস করেনি। ২১-২২ মার্চ বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকা থেকে প্রচারিত সংবাদ বুলেটিনে বলা হয়, শতকরা ৫ থেকে ১৫ ভাগ মানুষ ভোটকেন্দ্রে গিয়েছে।

এরশাদ কয়েক দফা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিবারই বিরোধী দলগুলোর আপত্তির মুখে তা স্থগিত করতে বাধ্য হন।

সাত দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়া আগাগোড়াই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর ধারণা, এরশাদের অধীনে নির্বাচনে অংশ না নিলে এরশাদের পতন হবে। অবশ্য তাঁর জোটের দুটি দলের নেতা—কাজী জাফর ও সিরাজুল হোসেন খান নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন। বিএনপির একটি অংশ শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে গোপনে এরশাদকে সমর্থন করেছিল এবং নির্বাচনের পক্ষে ছিল। এরা নির্বাচনের পক্ষে বিবৃতিও দিয়েছিল। এরা সবাই মন্ত্রিত্বের লোভে নির্বাচনের পক্ষে ছিল, আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার কৌশল হিসেবে নয়। মানুষ তাদের দালাল ভাবতে থাকে। বেগম জিয়ার নির্বাচনবিরোধী অনড় ভূমিকার জন্য ১৫-দলীয় জোটের বাম দলগুলোর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। শেখ হাসিনাও 'বিপ্লবীপনায়' খালেদা জিয়ার পেছনে পড়ে থাকতে চাননি। এভাবে নির্বাচন-বিরোধিতাই সাধারণ স্রোতোধারায় পরিণত হয়। এরশাদ সরকারের বদলে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার কায়েম এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহার—এই দুটি দাবি মেনে না নিলে নির্বাচনে যাওয়া যাবে না—এই ছিল নির্বাচনবিরোধীদের মূল কথা।[৫৬]

রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা অবস্থায় ১৫ মে ২৫১টি উপজেলায় এবং ২০ মে ২০৯টি উপজেলায় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বাকশাল, ন্যাপ, জাসদ ইত্যাদি সব দলের লোকেরাই

বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থী হন। মানুষ এই নির্বাচন বর্জন করেনি। রাজনৈতিক কর্মীরা এবং জনগণ স্থানীয় কারণে নির্বাচনে পছন্দের প্রার্থীকে জিতিয়ে আনতে সক্রিয় ছিলেন। আন্দোলনে ভাটা পড়লে 'নির্বাচন বয়কট' সফল হয় না। এ অবস্থায় নির্বাচনে অংশ নিয়ে আন্দোলনকে অগ্রসর করার কৌশল নেওয়ার মানসিকতা রাজনৈতিক দলগুলোর ছিল না।[৫৭] নির্বাচন যদিও নির্দলীয় ভিত্তিতে হয়েছিল, ফলাফলে দেখা যায় যে এরশাদের জনদল থেকে ১৯০ জন, বিএনপির ৪৬ জন, আওয়ামী লীগের ৪১ জন, জাসদের (রব) ১৫ জন এবং মুসলিম লীগের ৯ জন নির্বাচিত হন।[৫৮] নির্বাচনী হাঙ্গামায় কমপক্ষে ২০ জন নিহত ও ৫০০ জন আহত হয়।[৫৯]

এরশাদ বিএনপির অনেক নেতাকে হাত করে বিএনপি ভাঙার চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। বিএনপির এসব নেতা এরশাদের মধ্যে রাজনীতির নতুন নক্ষত্রের খোঁজ পেয়েছিলেন। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, জিয়াউর রহমানের অনুপস্থিতিতে এবং বেগম খালেদা জিয়ার মতো অনভিজ্ঞ নেতৃত্বে বিএনপি শিগগিরই মুখ থুবড়ে পড়বে।

বেগম খালেদা জিয়া পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে কঠোর হাতে দলের লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করেন। ১৫ জুন (১৯৮৫) বিএনপি থেকে শাহ আজিজুর রহমান, মওদুদ আহমদ, এ কে এম মাঈদুল ইসলাম, আবদুল আলীম ও ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ চৌধুরীকে বের করে দেওয়া হয়।[৬০] বহিষ্কৃত নেতারা শাহ আজিজকে চেয়ারম্যান ও মাঈদুল ইসলামকে মহাসচিব করে পাল্টা কমিটি গঠন করেন।

১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট এরশাদ গঠন করলেন 'জাতীয় ফ্রন্ট'। এই ফ্রন্টে বিএনপি, মুসলিম লীগ, গণতান্ত্রিক দল এবং ইউপিপির বেশ কয়েকজন যোগ দেন। মওদুদ আহমদ এবং আনোয়ার হোসেন মঞ্জু জাতীয় ফ্রন্টে যোগ দেন। জনদল তো ছিলই। কিন্তু ছয় মাস যেতে না যেতেই এরশাদ জাতীয় ফ্রন্ট ভেঙে দিলেন। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তিনি জনদল এবং জাতীয় ফ্রন্ট বিলুপ্ত করে 'জাতীয় পার্টি' নামে নতুন একটা দলের ঘোষণা দেন। জাতীয় পার্টিতে একীভূত হওয়া দলগুলোর মধ্যে ছিল জনদল, বিএনপি থেকে বেরিয়ে আসা একটি অংশ (হুদা, মতিন, মওদুদ প্রমুখ), ইউপিপি এবং মুসলিম লীগ ও গণতন্ত্রী দলের একটি অংশ।[৬১] এরশাদ নিজেকে এ দলের চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন।

বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের মুখে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ বারবার পরিবর্তন করা হচ্ছিল। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে এরশাদ ঘোষণা দিলেন, ৭ মে (১৯৮৬) নির্বাচন হবে। ১৫ ও ৭-দলীয় জোট ১৭ মার্চ এক যৌথ সভায় নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। ১৯ মার্চ চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে এক

জনসভায় ১৫-দলীয় জোটের নেতা শেখ হাসিনা 'স্বৈরাচারের নির্বাচনে' অংশগ্রহণকারীদের 'জাতীয় বেইমান' হিসেবে চিহ্নিত করার ঘোষণা দেন।[৬২] নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়ে দুই জোটের পক্ষ থেকে হরতাল ডাকা হলো।[৬৩] কিন্তু নেপথ্যের কুশীলবরা গোপনে কলকাঠি নাড়ছিলেন। ১৫-দলীয় জোটের অন্যতম নেতা হায়দার আকবর খান রনোর বয়ান এখানে উল্লেখ করা হলো :

> ঠিক তার আগের দিন ২১ মার্চ।... এদিন নির্বাচন বর্জনের দাবিকে সামনে রেখে এবং পরদিনের ঘোষিত হরতাল উপলক্ষে ১৫ ও ৭ দল অর্থাৎ ২২ দলের যৌথ মশাল মিছিল হওয়ার কথা। সে মিছিল হয়েছিলও।...এই মিছিলে ২২ দলের সব নেতা-নেত্রীর যোগদানের কথা থাকলেও শেখ হাসিনা এবং কমিউনিস্ট পার্টির মোহাম্মদ ফরহাদ আসেননি। এমনকি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁদের পাওয়া যায়নি। এসেছিলেন খালেদা জিয়া। কিন্তু বাকশাল নেতা আবদুর রাজ্জাক খুব চালাকি করে নির্ধারিত সময়ের আগেই ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে মিছিল শুরুর ঘোষণা দেন, যাতে খালেদা জিয়া যোগদান করার সুযোগ না পান।...
>
> সন্ধ্যায় এরশাদ অনির্ধারিত ভাষণ দিলেন টিভিতে।...এরশাদের এই বক্তৃতায় ধমক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এরশাদ বললেন, পরদিনের হরতাল যদি প্রত্যাহার করা না হয় এবং বিরোধী জোটসমূহ যদি নির্বাচনে রাজি না হয়, তবে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।...সেদিন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসায় ১৫ দলের সভা বসল। আশ্চর্যজনকভাবে সভায় শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকলেন না, বললেন, আপনারা মিটিং চালান, আমি আসছি।...
>
> বত্রিশ নম্বরে পনেরো দলের আটটার সভা শুরু হলো রাত ৯টা নাগাদ। যেসব নেতৃবৃন্দকে বহুদিন সাধাসাধি করেও পনেরো দলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সভায় উপস্থিত করা যায়নি, তাঁরাও উপস্থিত, একজন দুজন নয়, সদলবলে। সভা শুরু হলো। কিন্তু আন্দোলনের কোনো কথা নেই। নেতারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কত তাড়াতাড়ি নির্বাচনে যোগদানের ঘোষণা করা যাবে।...[৬৪]

৩২ নম্বরের বাড়িতে যখন এই নাটক চলছে, তখন ভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে রনো জাসদের হাসানুল হক ইনু ও ওয়ার্কার্স পার্টির নুরুল ইসলাম ছোটনকে নিয়ে একটা স্কুটারে করে গুলশানের একটা বাড়িতে গেলেন, যেখানে বিএনপির সভা চলছিল। সেখানে খালেদা জিয়াসহ বিএনপির অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন। রনোরা খালেদাকে বললেন, 'খুব সম্ভবত আওয়ামী লীগসহ ১৫ দলের অনেকেই আজ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। আমরা কয়টি দল (নাম উল্লেখ করলাম) এর বিরুদ্ধে। প্রয়োজনে আমরা ১৫ দল থেকেও বেরিয়ে আসব। এত বড় বেঈমানি আমরা করতে পারব না। আমাদের অনুরোধ, আপনারা যেন নির্বাচনের পক্ষে সিদ্ধান্ত না নেন।' তাঁদের কথা শুনে খালেদা জিয়া জানালেন, ওই রাতে তাঁরা কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। ৭ দলের সভা ডেকে তাঁরা পরে সিদ্ধান্ত জানাবেন।[৬৫]

আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তটি আসে বেশ নাটকীয়ভাবে। বোঝা যায় যে এরশাদের পক্ষ থেকে দূতিয়ালি করার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বেশ তৎপর ছিলেন।[৬৬]

নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে জাসদ আবার ভাঙে। শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে জাসদের একটা গ্রুপ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কাজী আরেফ আহমেদ ও হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বে অন্য অংশটি নির্বাচন বর্জনের পক্ষে থাকে। ১৫-দলীয় জোট ভেঙে যায়। ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ (ইনু), দুই বাসদ এবং শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল মিলে ৫-দলীয় জোট তৈরি করে। শেষ পর্যন্ত বিএনপির নেতৃত্বে ৭-দলীয় জোট নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ব্যাপারে অটল থাকে। গুজব ছিল, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে দর-কষাকাষিতে এরশাদ ও গোয়েন্দা বাহিনীর আলোচকেরা এমন অবস্থা তৈরি করে, যাতে বিএনপি কোনোক্রমেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে।[৬৭]

আন্দোলন ও নির্বাচনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিল দোদুল্যমান। এ প্রসঙ্গে ১৫-দলীয় জোটের অন্যতম শরিক সিপিবির মূল্যায়ন ছিল এরকম :

> পনেরো দলের ঐক্য রাখার বিষয়ে এই দলের মধ্যে মতবিরোধ আছে।...পনেরো দলের সাম্প্রতিক নিষ্ক্রিয়তার মূল কারণ আওয়ামী লীগের ভূমিকা।
>
> পনেরো দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ দুইটি দাবি উত্থাপন করে রেখেছে। প্রথমত বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের দাবি, এবং দ্বিতীয়ত পনেরো দলের একটি সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানো ও শেখ হাসিনাকে জোটের সভানেত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া। তাদের এই দাবি দুইটি পনেরো দলে মীমাংসা না হওয়াতে তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া আছে।...
>
> তারা স্থায়ীভাবে 'নির্বাচনবিরোধী' ভূমিকায় থাকবে, এমন মনে করা ঠিক হবে না। তবে বেগম জিয়াকে রাজনৈতিকভাবে সুবিধা করতে না দেওয়ার প্রচেষ্টা তাদের আছে। সেদিক থেকে তারা তাদের বিজয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে নির্বাচন করতে চায়, এর আগে নয়।...
>
> আওয়ামী লীগের একলা চলার ঝোঁক লক্ষ করা যায়। সামগ্রিক কারণে শেখ হাসিনার ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হয়েছে।...
>
> একাত্তরের স্বাধীনতার ধারা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামেও তারা আমাদের মিত্র। তাই, একাধারে আওয়ামী লীগের ওপর নির্ভরশীল হওয়া যেমন ঠিক হবে না, তেমনি আবার বিভেদ উসকে দেওয়াও ঠিক হবে না। আওয়ামী লীগের দোদুল্যমানতা আছে এবং থাকবে। তাই 'ঐক্য ও সংগ্রামের' নীতি ধরেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা রক্ষার নীতি অব্যাহত রাখতে হবে।[৬৮]

২২ মার্চ ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। এ সময় সিপিবির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ দুই জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠকে দুই

নেত্রীকে (হাসিনা ও খালেদা) ১৫০টি করে আসনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করে। আওয়ামী লীগ অবশ্য বেগম জিয়াকে সমানসংখ্যক আসন দেওয়ার প্রস্তাবে রাজি হয়নি। বাম দলগুলো নির্বাচনে যেতে আগ্রহী ছিল না। ১৫-দলীয় জোটে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়। এই সুযোগে সরকার সংবিধান সংশোধন করে আইন করে যে, একজন প্রার্থী পাঁচটির বেশি আসনে দাঁড়াতে পারবেন না।[৬৯]

২১ মার্চ রাতে এক ভাষণে এরশাদ ওই রাতের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিরোধী দলগুলোকে শাসান। বিএনপি জানিয়ে দেয়, তারা ওই রাতের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। ১৫ দলের মধ্যে আওয়ামী লীগের তরুণ অংশের মধ্যে দ্বিধা ছিল। শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল, দুই বাসদ, জাসদ (ইনু), ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন) নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিরোধিতা করে ১৫-দলীয় জোট ছেড়ে চলে যায়। বিএনপি ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ১৫-দলীয় জোটের সঙ্গে ১২০টি আসনে তাদের প্রার্থিতা পাওয়ার ব্যাপারে সমঝোতায় আসে। কিন্তু পরে হঠাৎই মত বদলে ফেলে এবং নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দেয়। নির্বাচন-প্রক্রিয়া চলাকালে আসন ভাগাভাগি নিয়ে মতভেদ হলে মূল বাকশাল জোট থেকে চলে যায়। ১৫-দলীয় জোট ছোট হয়ে আট দলে পরিণত হয়। জোটের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়। আওয়ামী লীগ এককভাবে সব আসনে মনোনয়ন ঘোষণা করে। জোটের অন্যান্য দলও একই পথ অনুসরণ করে। শেষ পর্যন্ত রফা হয়। আওয়ামী লীগ ২৪৮, জাসদ ১৩, ঐক্য ন্যাপ ১০, ন্যাপ (মো.) ৯, ওয়ার্কার্স পার্টি ৩, সাম্যবাদী দল ২, গণআজাদী লীগ ১, বাকশাল স্বতন্ত্র ৪ এবং সিপিবি ৯—এভাবে আসন ভাগাভাগি হয়। যশোর ও পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি করে আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই সমঝোতা শেষ পর্যন্ত টেকেনি। আওয়ামী লীগের ৩০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জোটের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।[৭০]

জোটের প্রার্থীদের প্রতীক ছিল 'নৌকা'। আওয়ামী লীগ তাদের দলের আটজন 'স্বতন্ত্র' প্রার্থীকেও নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করতে দেয়। কয়েকটি বাম দল জোট থেকে সরে যাওয়ার এবং বাকশালের ভূমিকার কারণে জোটের ভারসাম্য আওয়ামী লীগের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ে।

মনোনয়নের ব্যাপারে যত বিশৃঙ্খলা হয়েছে, তার সুযোগ নিয়েছে আওয়ামী লীগ এবং তাদের প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াতে পেরেছে। দলটি সবক্ষেত্রে জনপ্রিয় লোককে প্রার্থী করেনি। মনোনয়নের বিষয়ে আওয়ামী লীগের 'অহমিকা ও সংকীর্ণতা' জোটের ক্ষতি করেছে। শেষ পর্যন্ত ন্যাপ (মো.) ও জাসদ (সিরাজ) দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছে। ১২ এপ্রিলের পর জোটের তেমন

কার্যকারিতা ছিল না। জোটের নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পান। ভাষণে তিনি জোটের একুশ দফা ঘোষণার কোনো উল্লেখ করেননি।[৭১]

নির্বাচনবিরোধীদের নেতা ছিলেন বেগম জিয়া ও তাঁর দল বিএনপি। এর সঙ্গে যোগ হয় আরও ১৭টি দল: বিএনপি (শাহ আজিজ), জাসদ (ইনু), ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন), বাসদ (খালেকুজ্জামান), বাসদ (মাহবুব), সমাজবাদী দল (নির্মল সেন), কমিউনিস্ট লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ (মোশতাক), ডেমোক্রেটিক লীগ (অলি আহাদ), আইডিএল (রহিম), ইসলামী আন্দোলন (মেজর জলিল), জনতা পার্টি (অ্যাডমিরাল এম এইচ খান), জাগপা (প্রধান), লেবার পার্টি (মতিন), মুসলিম লীগ (কামরুজ্জামান), প্রগশ প্রভৃতি। নির্বাচনবিরোধীরা প্রচার করে—এই নির্বাচন পাতানো খেলা, রুশ-ভারতের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবকিছু করা হচ্ছে। তারা নির্বাচনের দিন সারা দেশে হরতালের ডাক দেয়। সেদিন হরতাল হয়নি।[৭২]

৭ মে (১৯৮৬) জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পার্টি ১৫৩ আসনে জয় পায়। তারা শতকরা ৪২ দশমিক ৩৪ ভাগ ভোট পেয়েছিল। আওয়ামী লীগ শতকরা ২৬ দশমিক ১৬ ভাগ ভোট পেয়ে ৭৬টি আসনে জয়ী হয়। জামায়াতে ইসলামী শতকরা ৪ দশমিক ৬১ ভাগ ভোট পেয়ে ১০টি আসন পায়। সিপিবি এবং ন্যাপ (মোজাফফর) উভয়েই পাঁচটি করে আসন পায়। তবে ন্যাপ সভাপতি মোজাফফর আহমদ এবং সাম্যবাদী দলের প্রধান মোহাম্মদ তোয়াহা পরাজিত হন। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে দাবি করা হয়, ভোটার উপস্থিতি ছিল শতকরা ৬১ দশমিক ৩১ ভাগ।[৭৩] বিবিসি, *গার্ডিয়ান*, *টাইমস*, *দ্য ফিনান্সিয়াল টাইমস*, ভয়েস অব আমেরিকা এবং অন্য অনেক বিদেশি পর্যবেক্ষকের মতে, নির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপি ও অনিয়ম হয়েছিল এবং সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তারা তাঁদের ইচ্ছেমতো নির্বাচনে ফলাফল নির্ধারণ করেছিলেন। ভোটার উপস্থিতি ছিল বড়জোর শতকরা ২০ ভাগ।

১৯৫৪ সালের পর এই প্রথম সংসদ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা আসন পেলেন। বিজয়ী পাঁচজনের মধ্যে ছিলেন মো. ফরহাদ (পঞ্চগড়-২), দবিরুল ইসলাম (ঠাকুরগাঁও-২), প্রসূনকান্তি রায় (সুনামগঞ্জ-১), শাহনেওয়াজ (জামালপুর-৪) ও শহীদুল্লাহ (গাজীপুর-৪)। ওহিদুর রহমান জোটের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে জয়ী হন। ফলে সিপিবির আসনসংখ্যা হয় ৬। ফলে তারা জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর পর চতুর্থ বৃহত্তম সংসদীয় দল হতে সমর্থ হয়।[৭৪]

মোট ২৭টি দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে ১৬টি দলের কোনো প্রার্থী কোনো আসনে জয়ী হতে পারেনি। 'স্বতন্ত্র' প্রার্থী হিসেবে অংশ নিয়ে জয়ী হন ৩২ জন। এঁদের মধ্যে ২৪ জন জাতীয় পার্টিতে, তিনজন আওয়ামী লীগে ও একজন সিপিবিতে যোগ দেন।[৭৫]

আওয়ামী লীগের অনেক বড় বড় নেতা নির্বাচনে হেরে যান। এঁদের মধ্যে ছিলেন ড. কামাল হোসেন, জোহরা তাজউদ্দীন, সালাউদ্দিন ইউসুফ ও মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, শেখ হাসিনাই তাঁদের হারিয়ে দিয়েছেন। কোনো কোনো নেতা দলীয় সভানেত্রী সম্পর্কে বেশ খারাপ মন্তব্য করতেন।[৭৬]

আওয়ামী লীগের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় সংসদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা নির্বাচনী ফলাফল বাতিলের আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা ও তাঁর সমর্থকেরা তাঁদের যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা সংহত করার দিকে মনোযোগ দেন। ফলে দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়।[৭৭]

নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের নিজস্ব হিসাব ছিল। নির্বাচনের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত। প্রথাগত রাজনীতির মূলধারা থেকে বিএনপিকে হটিয়ে সংসদে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং এরশাদবিরোধী আন্দোলনের ফসল নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের ঘরে তোলা যাবে মনে করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।[৭৮]

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশ নেওয়াকে বিএনপি একটি 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে দেখেছে। এ প্রসঙ্গে বিএনপির একটি দলিলে বলা হয় :

> সব দখলদার বাহিনীর মতোই এরশাদ বাহিনী ক্ষমতাচ্যুত বিএনপিকে ধ্বংসের কাজে আত্মনিয়োগ করে প্রথম হইতেই। এই কাজে তাহার সঙ্গে সাগ্রহ সহযোগিতা করে ঐ মুখচেনা স্বৈরতন্ত্রী চক্রটি। মুখে মুখে আন্দোলনে সাড়া দিলেও এই গণধিকৃত চক্রটি স্বৈর সরকারের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র চালাইতে থাকে অব্যাহত গতিতে।
>
> এই ষড়যন্ত্রের নীলনকশা স্পষ্ট হইল ১৯৮৬ সালের তথাকথিত নির্বাচনের সময়। এই সময় হঠাৎ যৌথ আন্দোলনের পথ পরিহার করিয়া এই চক্রটি এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যাইবার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনে পূর্ব সমঝোতার ভিত্তিতে কয়েকটি আসন পাইয়া বিরোধী দলের নেত্রীর আসনটি দখল করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। যদিও ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যুর অভিযোগ আনা হইল কিন্তু উহা ছিল একটি পাতানো খেলা। কেননা নির্বাচনের ফলটি এই চক্রটি গ্রহণ করিয়া প্রথমে কিছু মান অভিমান ও দর-কষাকষি করিয়া সবশেষে সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয়। এই কর্মটির ফলে সেই সময়েই স্বৈরতন্ত্র উৎখাতের একটি সুবর্ণ সুযোগ দেশবাসীর হাতছাড়া হয়।...[৭৯]

সামরিক শাসনের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কারণে আওয়ামী লীগ প্রশ্নবিদ্ধ হয়। অন্যদিকে নির্বাচনের টোপ না গেলার কারণে অথবা যেভাবেই হোক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য খালেদা জিয়ার 'আপসহীন' ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে।

এরশাদের বিদায়

জেনারেল এরশাদ একটা গণভোটের আয়োজন করে বৈধতা পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। বিএনপিকে বাইরে রেখে মোটামুটি নির্বিঘ্নে তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনটা সেরে ফেললেন। এখন তাঁর ইচ্ছে হলো নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হবেন।

১৯৮৬ সালের ৩১ আগস্ট এরশাদ সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। ২ সেপ্টেম্বর তিনি জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন এবং এর চেয়ারম্যান মনোনীত হন। তিনি ঘোষণা দিলেন, ১৫ অক্টোবর (১৯৮৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে। এ নির্বাচন নিয়ে প্রধান বিরোধী দলগুলোর কোনো আগ্রহ ছিল না। ১৫ দল, ৭ দল এবং জামায়াতে ইসলামী ঘোষণা দিল, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন, অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর তারা সারা দেশে হরতাল পালন করবে। ১৩ অক্টোবর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে তাঁদের নিজ নিজ বাসায় অন্তরীণ করা হলো।

১২ জন প্রার্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নেন। এরশাদ ছাড়া বাকি সবাই ছিলেন ডামি প্রার্থী। এঁদের অনেকের নামও আগে কেউ শোনেননি। নির্বাচনে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, এটা দেখানোর জন্যই অনেক প্রার্থী জোগাড় করা হয়েছিল। এঁদের ভূমিকা ছিল সাক্ষী-গোপালের। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এরশাদ শতকরা ৮৩ দশমিক ৫৭ ভাগ ভোট পেয়ে জয়ী হন। স্বতন্ত্র প্রার্থী মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) ছিলেন 'নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি শতকরা ৫ দশমিক ৬৯ ভাগ ভোট পান। এই নির্বাচনে ফ্রিডম পার্টির নেতা সৈয়দ ফারুক রহমানও প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি পান শতকরা ৪ দশমিক ৩১ ভাগ ভোট। বাকি নয়জন প্রার্থী মিলে পেয়েছিলেন শতকরা ৫ দশমিক ৪ ভাগ ভোট। এঁদের মধ্যে ছিলেন ওলিউল ইসলাম, মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী, মেজর (অব.) আফসার উদ্দিন, মোহাম্মদ আনসার আলী, খলিলুর রহমান মজুমদার, মো. আবদুস সামাদ, জহির খান, সৈয়দ মনিরুল হুদা চৌধুরী ও স্কোয়াড্রন লিডার (অব.) মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, শতকরা ৫৪ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছিলেন।[৮০] বিবিসি অবশ্য জানিয়েছে, ভোটার উপস্থিতি ছিল শতকরা ৩ ভাগের কম। এ নির্বাচন নিয়ে কারোরই তেমন উৎসাহ ছিল না।

১৯৮৭ সালের ২৮ অক্টোবর ১৫ দল ও ৭ দলের নেতাদের একটা সভা হয় মহাখালীর আণবিক শক্তি কমিশনের আবাসিক কলোনির একটি ফ্ল্যাটে। এই ফ্ল্যাটটি ছিল শেখ হাসিনার স্বামী এম এ ওয়াজেদ মিয়ার। এখানে হাসিনা এবং খালেদার মধ্যে দেখা ও কথা হয়। তাঁরা একটা যৌথ ইশতেহারও তৈরি করেন।[৮১]

দুই জোটের মতিগতি দেখে এরশাদ প্রমাদ গুনলেন। তিনি জাতীয় সংসদ ভেঙে দিলেন।

৩ মার্চ (১৯৮৮) এরশাদ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। এবার প্রধান বিরোধী দলগুলো সবাই নির্বাচন বর্জন করল। কেবল এরশাদের বশংবদ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশ নেয়। তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর জন্য প্রচুর টাকা দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের হিসাবে দেখানো হয়, শতকরা ৫৪ দশমিক ৭৪ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছেন। শতকরা ৬৮ ভাগ ভোট পেয়ে জাতীয় পার্টির ২৫১ জন নির্বাচনে জয়ী হন। জাসদের (রব) নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দল শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ ভোট পেয়ে ১৯টি আসনে জয়ী হয়। জাসদ (শাজাহান সিরাজ) পায় তিনটি এবং ফ্রিডম পার্টি পায় দুটি আসন। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৫টি আসনে জয় পায়।[৮২]

ফ্রিডম পার্টি ও স্বতন্ত্র সদস্যদের সমর্থন নিয়ে আ স ম আবদুর রব সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হলেন। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ মূলধারার অধিকাংশ দল নির্বাচন বয়কট করায় এ সংসদের কোনো আকর্ষণ থাকল না। আ

শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া পরম বন্ধু—যখন শত্রু এরশাদ

স ম রবের কপালে গৃহপালিত বিরোধীদলীয় নেতার তকমা আটকে গেল। এ সংসদ কোনো নৈতিক বৈধতা পায়নি।

১১ মে (১৯৮৮) জাতীয় সংসদে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে একটা বিল পাস হয়। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার জন্য দেশে কোনো আন্দোলন হয়নি, রাজপথে কোনো বিক্ষোভ মিছিল হয়নি। এ বিল পাস করার জন্য সরকারের কোনো দায় ছিল না। তবু এরশাদ এটা করলেন একটা ধারণা দেওয়ার জন্য যে তিনিই ইসলামের একজন খাঁটি সেবক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই বিল আর রদ করা হবে না। কেননা যিনিই এই বিল বাতিলের চেষ্টা করবেন, তাকেই ইসলামের শত্রু হিসেবে দেখানো হবে। এ দেশে 'ইসলামের শত্রু'—এই পরিচিতি নিয়ে কারও পক্ষেই রাজনীতি করা সম্ভব নয়। এরশাদ বুঝেশুনেই এই চালটি চেলেছিলেন।

১৯৮৮ সালে বিএনপি তৃতীয়বার ভাঙনের মুখে পড়ে। দলের মহাসচিব কে এম ওবায়দুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান জামালউদ্দিন আহমদ ও আবুল হাসনাত এতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। বেগম খালেদা জিয়া ১৯৮৮ সালের ২১ জুন দলের স্থায়ী কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল করে দেন এবং আবদুস সালাম তালুকদারকে মহাসচিবের দায়িত্ব দেন। এদিকে শাহ আজিজুর রহমান ১৭ জুলাই তাঁর নেতৃত্বাধীন বিএনপি বিলুপ্ত করেন। ২৬ আগস্ট তিনি খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন দলের মূলধারায় ফিরে আসেন।[৮৩]

এরশাদ ১৯৮৮ সালের ১১ আগস্ট কাজী জাফর আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং ১২ আগস্ট মওদুদ আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। জাতীয় পার্টির মহাসচিব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রধানমন্ত্রী পদের অন্যতম দাবিদার ছিলেন। এরশাদ এ ব্যাপারে তাঁকে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজী জাফর যেভাবেই হোক এরশাদকে 'সন্তুষ্ট' করে প্রধানমন্ত্রীর পদটি বাগিয়ে নেন।[৮৪]

১৯৮৭ সালের নভেম্বরের পর প্রেসিডেন্ট এরশাদকে হটানোর লক্ষ্যে বিরোধী দলগুলো বড় কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। এর প্রধান কারণ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যকার মতপার্থক্য। এরশাদ প্রায়ই গর্বের সঙ্গে বলতেন, যত দিন এই দুই নেত্রী ঝগড়া করবেন, তত দিন তিনি ভালো থাকবেন।[৮৫]

১৯৯০ সালের শেষ দিকে এরশাদবিরোধী আন্দোলন আবার জোরদার হয়। এরশাদের রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য বড় একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। ১৯৮৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগের কাছ থেকে এই সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁর যে গোপন সমঝোতা হয়েছিল, তা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় ওই সংসদ টেকেনি। ১৯৮৮ সালে তিনি কোনো বড়

দলের সমর্থন পাননি। যেসব ছোট দলকে নিয়ে তিনি নির্বাচন করেছিলেন, দেশের মাটিতে তাদের কোনো ভিত্তি ছিল না। সুতরাং, এরশাদের অবস্থা দিন দিন নাজুক হয়ে পড়ে।

১৯ নভেম্বর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮-দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭-দলীয় জোট এবং বামপন্থীদের ৫-দলীয় জোট আলাদাভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে। ২১ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এরশাদ-সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে গোলাগুলি হয়। গোলাগুলির মধ্যে পড়ে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক ডা. শামসুল আলম মিলন নিহত হন। ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী এরশাদকে জানিয়ে দেয়, সমস্যার সমাধান করতে না পারলে এরশাদকেই তাঁর দায়িত্ব নিতে হবে; সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ থাকবে। ৪ ডিসেম্বর রাতে এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন। কিন্তু এরশাদ পদত্যাগ করলে দায়িত্ব কে নেবেন, এ নিয়ে কিছু জটিলতা তৈরি হয়।

তিন জোটের নেতাদের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়েছিল যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ চাইছিল, এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারকে রাষ্ট্রপতি করতে। খালেদা জিয়া আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রধান বিচারপতিই হবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান। সারা দিন অপেক্ষা করার পর আওয়ামী লীগ প্রধান বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে মেনে নিতে রাজি হলো।[৮৬]

ক্ষমতার চূড়া থেকে এরশাদের পতনের শেষ দৃশ্যটি খুব কাছে থেকে দেখেছেন রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মনজুর রশীদ খান। পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার পর এরশাদ শেষবারের মতো তেজগাঁও বিমানবন্দরের উল্টো দিকে তাঁর অফিসে যান। তিনি সেখানে ৩০ মিনিটের মতো ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র সরিয়ে নেন। ওই সময়ই তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ৪ কোটি ৮ লাখ ৬৫ হাজার টাকা অফিস থেকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হন।[৮৭]

এরশাদ সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর অনুগত নবম ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল রফিকুল ইসলামের ওপর নির্ভর করে শেষ চেষ্টা করেছিলেন। পরিস্থিতি আঁচ করে সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নূরউদ্দীন রফিকের পুরো বাহিনী শেরেবাংলা নগর থেকে সাভার পাঠিয়ে দেন। এরশাদ সারা দিন টেলিফোনে সেনাপ্রধান নূরউদ্দীন এবং সিজিএস মেজর জেনারেল আবদুস সালামের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তাঁরা কেউ টেলিফোন ধরেননি। সেনা কর্মকর্তাদের একটা বড় অংশ তখন এরশাদের 'দুর্নীতি ও

অপকর্মের' দায় আর বয়ে বেড়াতে চায়নি। ফলে এরশাদের সময় শেষ হয়ে এসেছিল। ৬ ডিসেম্বর বেলা দুইটায় উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শপথ নেন এবং এরশাদ নবনিযুক্ত উপরাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। এভাবেই শেষ হয় নয় বছরের এরশাদ-জমানা।[৮৮]

এরশাদ নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। *ভোরের কাগজ*-এর সম্পাদক মতিউর রহমানের একটি মন্তব্য প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, নব্বইয়ের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই তিনি দেশত্যাগের চিন্তা করেছিলেন। ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এরশাদের মধ্যপ্রাচ্যের এক ঘনিষ্ঠ ও ধনাঢ্য বন্ধু হানি সালামের একটা ৭৪৭ বোয়িং বিমান অপেক্ষমাণ ছিল। নভেম্বরের শেষে গণ-আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে হানি সালাম ঢাকা ছেড়ে ব্যাংককে চলে যান। জানা যায়, সেখানেও তিনি এরশাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের কারণে এরশাদের দেশত্যাগের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।[৮৯]

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়ে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। সাহাবুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সব সদস্যই ছিলেন নির্দলীয় এবং নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তাঁদের পদবি হলো 'উপদেষ্টা'। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি এম এ খালেক, কফিল উদ্দীন মাহমুদ, ফখরুদ্দীন আহমেদ, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ডা. এম এ মাজেদ, এ বি এম জি কিবরিয়া, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, এ কে এম মুসা, আলমগীর এম এ কবীর, কাজী ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ, ইমামউদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, এ এম আনিসুজ্জামান, চৌধুরী এ কে এম আমিনুল হক ও বি কে দাস। এঁরা ৮ ডিসেম্বর (১৯৯০) থেকে ৯ জানুয়ারির (১৯৯১) মধ্যে বিভিন্ন তারিখে উপদেষ্টা পরিষদে যোগ দেন এবং ৩ মার্চ (১৯৯১) পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।[৯০]

শিক্ষক রাজনীতি

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বরাবরই ছিল। ছাত্রদের মধ্যে যেমন, শিক্ষকদের মধ্যেও কম নয়। ক্ষমতাসীন সরকারগুলো সব সময়ই এখানে থাবা বসাতে চেয়েছে। আবার ক্ষমতাসীনদের অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে শিক্ষকেরাও অনেক সময় সরব হয়েছেন, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করেছেন। যতই দিন গেছে, ইহজাগতিক লাভালাভের কারণে

শিক্ষকদের একটি অংশ সরকারি দলের মোসাহেবি করেছেন এবং না-পাওয়ার বেদনা থেকে অনেকেই বিরোধিতা করেছেন অথবা ভবিষ্যতে কিছু পেতে পারেন এই আশায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। আদর্শবাদী শিক্ষকও ছিলেন কেউ কেউ। তবে তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের পছন্দের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), কবীর চৌধুরী (ইংরেজি), নীলিমা ইব্রাহীম (বাংলা) প্রমুখ। আওয়ামী লীগের বিরোধী শিক্ষকেরা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। এই গোষ্ঠীর সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন আহমদ শরীফ (বাংলা), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজি), এম এ লতীফ (ভূতত্ত্ব), এ বি এম হবিবুল্লাহ (ইসলামের ইতিহাস) প্রমুখ। আওয়ামী লীগ-সমর্থক শিক্ষকদের গ্রুপটি 'নীল' দল এবং আওয়ামী লীগবিরোধী গ্রুপটি 'গোলাপি' দল নামে পরিচিত হয়।[৯১]

জেনারেল এরশাদ যখন রাষ্ট্রক্ষমতায়, তখন জিয়াউর রহমানের সমর্থকেরা শিক্ষকদের নিয়ে আরেকটা দল করার পরিকল্পনা করেন। উদ্যোগটা নিয়েছিলেন বিএনপির নেতা মেজর জেনারেল (অব.) মজিদ উল হক। তাঁর স্ত্রীর বড় বোন রোকেয়া হলের প্রভোস্ট নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসার বাসায় গোপনে সলাপরামর্শ হয়। 'গোলাপি' দলের মধ্য থেকে এই উদ্যোগে মূল ভূমিকা রেখেছিলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা (ভূগোল), এস এম এ ফায়েজ (মৃত্তিকাবিজ্ঞান), আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী (সমাজবিজ্ঞান), শহীদ উদ্দিন আহমদ (ব্যবস্থাপনা), ইউসুফ হায়দার (পদার্থবিদ্যা), ওয়াকিল আহমদ (বাংলা) প্রমুখ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও এঁদের সঙ্গে ছিলেন। একটা কমিটি তৈরি করার জন্য তাঁরা বেশ কয়েকবার বৈঠক করেন। ১৯৮৮ সালের ৪ এপ্রিল এরকম একটি বৈঠকে কমিটি তৈরি করা নিয়ে মতভেদ হয়। ওই সভায় ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মনিরুজ্জামান মিঞা, আহমদউল্লাহ মিঞা (সমাজকল্যাণ), এস এম এ ফায়েজ, আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, শহীদউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশারফ হোসেন (ভূতত্ত্ব) ও সাঈদ-উর রহমান (বাংলা) সাধারণ সভা ডেকে পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরির দাবি জানান এবং কাজ চালানোর জন্য আপাতত দুজন আহ্বায়ক ও চারজন যুগ্ম আহ্বায়ক মনোনীত করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি করার পরামর্শ দেন।[৯২]

পরে বিএনপিপন্থীরা 'সাদা' দল নামে নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিলেন। এঁদের অনেকেই এসেছিলেন 'গোলাপি' দল থেকে। এঁদের সমর্থন নিয়েই মনিরুজ্জামান মিঞা উপাচার্য এবং ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ শিক্ষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে শিক্ষক

কেন্দ্রীয়

৪ঠা এপ্রিলের পরিষদ সভায় প্রদত্ত বিবৃতি

আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে বলেছি, এখনও বলছি যে, দলের বর্তমান অবস্থায় এবং বর্তমান অবস্থায়ও দলের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই পরিষদে ভোটাভুটির মাধ্যমে আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচন দলের জন্য বাঞ্ছনীয় হবে না, পরিবর্তে বরং একটি ঐক্যমত প্রতিষ্ঠাই দলের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার উপায় হতে পারে :

(ক) বর্তমান প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়ে সর্বসম্মত একটি প্যানেল তৈরি করা, সেটা সম্ভব না হলে ;

(খ) বর্তমান প্রার্থীদেরকে যৌথভাবে দায়িত্ব দেওয়া, সে-ক্ষেত্রে যৌথভাবে দু'জন আহ্বায়ক ও দু'জন [illegible] যুগ্ম আহ্বায়ক থাকবেন, যারা আবর্তক (Rotative) রীতি অনুযায়ী কাজ করবেন, তাও গ্রহণযোগ্য না হলে ;

(গ) নির্বাচন করতে হবে, তবে তা সাধারণ সভায় করা বাঞ্ছনীয় হবে, যাতে সকল সদস্য অংশ ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন।

আমরা এই বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে অনুরোধ জানিয়ে এই পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তাতে যোগদানে অপারগতা প্রকাশ করছি।

(ইয়াজউদ্দিন আহমদ) (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী) (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা)

(আমিনউল্লাহ মিঞা) (এম, এম, এ, কাদের) (আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী)

(খোন্দকার মোশাররফ হোসেন) (শরফউদ্দিন আহমদ) (সাঈদ-উর রহমান)

এই পরিষদে ভোট হলে তাতে আমরাও অংশ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

(ইউসুফ হায়দার)

আমরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারিনি, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে সাধারণ সভা এই পরিষদকে ভোটের মাধ্যমে আহ্বায়ক/যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচনের কোনো এখতিয়ার দেয়নি।

(আনোয়ারা বেগম) (তৌফিকুল আনোয়ার) (আশরাফউদ্দিন আহমেদ)

এছাড়াও ৫ জন সদস্য ব্যালট পেপার নিয়েছেন কিন্তু ভোটে অংশ গ্রহণ করেননি। সভায় সর্বমোট ৩৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর এম, এ, লতিফ সভায় উপস্থিত থাকেন এবং ভোটে অংশ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৮৮-র কেন্দ্রীয় সভায় আমি শেষের দিকে স্বল্প সময়ের জন্য উপস্থিত ছিলাম কিন্তু নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিনি।

(নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাদা দলের প্রস্তুতিপর্বের একটি সভার কার্যবিবরণীর অংশ

সমিতির আহ্বানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক একযোগে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

সাদা দলের সামনে তখন একটা বড় যুদ্ধক্ষেত্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আসন্ন সিন্ডিকেট নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থীকে জিতিয়ে আনা। ১৯৮৯ সালের ৭ ডিসেম্বর এই নির্বাচন হয়। সিন্ডিকেট হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত প্রয়োগকারী ফোরাম। সিন্ডিকেট নির্বাচনে 'সাদা' দলের প্রার্থী ছিলেন আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী (ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ), কে এম মোহসীন (প্রভোস্ট, সলিমুল্লাহ হল), এস এম এ ফায়েজ (অধ্যাপক, মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগ), হুমায়ূন আহমেদ (সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ), মো. আনোয়ার হোসেন (সহকারী অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন বিভাগ) এবং এ বি এম শহিদুল ইসলাম (মার্কেটিং বিভাগ)।[৯৩]

১৯৯০ সালের ২৪ ডিসেম্বর 'সাদা' দল শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে সভাপতি ও মো. আনোয়ার হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী করে। ১৯৯০ সালে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ডাকসু নির্বাচনে একচেটিয়া জয় পায়। তাদের এই জয়ে তাদের শিক্ষকদের অবদান কম ছিল না। বিএনপির 'বুদ্ধিবৃত্তিক' দিকটার নেতৃত্বে তখন ছিলেন 'সাদা' দলের শিক্ষক নেতা আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও মো. আনোয়ার হোসেন। আনোয়ার হোসেন একসময় জাসদ-গণবাহিনীর ঢাকা নগর শাখার কমান্ডার ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি মোটেও নিষ্কাম নয়। সমিতির নেতারাই সচরাচর উপাচার্য পদে নিয়োগ পান। বিভিন্ন সরকারি এবং সাংবিধানিক 'কমিশন'-এ জায়গা পাওয়া এবং নানা সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পৃষ্ঠপোষকতা তো আছেই। এ জন্য কেউ কেউ সরকার বদল হলে নিজের রংও পাল্টে ফেলেন। এরকম একজন হলেন মো. আনোয়ার হোসেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর তিনি হঠাৎ 'বঙ্গবন্ধুর সৈনিক' হয়ে যান এবং নীল বর্ণ ধারণ করেন। এই দল থেকে তিনি পরে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৯৪]

১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী শিক্ষকদের নির্বাচিত তিনজনের প্যানেল থেকে আচার্য (রাষ্ট্রপতি) একজনকে উপাচার্য নিয়োগ করেন। প্যানেলে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পান, তাঁকে উপাচার্য নিয়োগের কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই।

১৯৭৬ সালে 'নীল' প্যানেল থেকে অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন। তাঁর পরেই ছিলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও সবশেষে অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরী। মতিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা ছিল। কবীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রচার ছিল যে তিনি কমিউনিস্ট। ওইবার ফজলুল হালিম চৌধুরীকে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি একনাগাড়ে সাত বছর ওই দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৮৩ সালে 'নীল' প্যানেল থেকে কবীর চৌধুরী সবচেয়ে বেশি

আসন্ন সিন্ডিকেট নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী

পদ	প্রার্থী	ভোট দানের পদ্ধতি
ডীন	ডঃ আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ	X
প্রভোস্ট	ডঃ কে. এম. মোহসীন সলিমুল্লাহ হল	X
অধ্যাপক	ডঃ এস. এম. এ. ফায়েজ মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ	X
সহযোগী অধ্যাপক	ডঃ হুমায়ুন আহমেদ রসায়ন বিভাগ	X
সহকারী অধ্যাপক	ডঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রাণরসায়ন বিভাগ	X
প্রভাষক	জনাব এ. বি. এম. শহিদুল ইসলাম মার্কেটিং বিভাগ	X

স্থান : ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র

তারিখ : বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৭, ১৯৮৯

সময় : সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১ টা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট নির্বাচনে বিএনপিপন্থী সাদা দলের প্রার্থী-তালিকা

ভোট পেয়েও উপাচার্য হতে পারেননি। প্যানেলে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন অধ্যাপক এ কে এম সিদ্দিক। সবচেয়ে কম ভোট পেয়ে অধ্যাপক শামসুল হক উপাচার্য হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটো ঘটনাই ঘটেছিল সেনাশাসকের আমলে।[৯৫] উপাচার্য পদ পাওয়ার জন্য অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন। এ যেন জীবনের একটা মোক্ষলাভ।

রাজপথের পরীক্ষায় পাস

বিএনপির জন্ম হয়েছিল ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে দলটি তৈরি করেন। কিন্তু বিএনপির সত্যিকার অর্থে একটি রাজনৈতিক দল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়, যখন দলটি ক্ষমতার বৃত্ত থেকে ছিটকে পড়ে। এরশাদের ক্ষমতা দখলের পর থেকেই বিএনপি প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়ে। নানা প্রলোভনে পড়ে শীর্ষস্থানীয় অনেক নেতাই দল ছেড়ে চলে যান। এ সময় বিএনপির একটি দল হিসেবে টিকে থাকাটাই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ।

১৯৭৯ সালে জিয়া বিএনপির একটা স্থায়ী কমিটি (স্ট্যান্ডিং কমিটি) তৈরি করেন এবং এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে মহাসচিবের দায়িত্ব দেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরী শত বিপদের মধ্যেও দল ছাড়েননি। এরপর কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান এবং কে এম ওবায়দুর রহমান কিছুকালের জন্য দলের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে মহাসচিব পদে পরিবর্তন আসে। তখন এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন আবদুস সালাম তালুকদার। মূলত বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ও পরে আবদুস সালাম তালুকদারের নেতৃত্বে ভর করে বিএনপি এরশাদের স্বৈরশাসনের জামানা পার করে। বিরোধী দলে থেকেই বিএনপি ধীরে ধীরে একটা রাজনৈতিক দলের চরিত্র অর্জন করে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব অপরিসীম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রসংগঠনের প্রাধান্য বেশি, তা অধিকাংশ সময়ে জাতীয় রাজনীতির সমীকরণ নির্ধারণ করে থাকে। ১৯৭০ সালের পর ডাকসু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ছাত্রলীগ কখনো জয় পায়নি। হল সংসদগুলোতে ১৯৮০ সাল থেকেই বিএনপি-সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জিততে থাকে। অবশ্য ১৯৮৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে আওয়ামী-সমর্থিত ছাত্রলীগের সুলতান মোহাম্মদ মনসুর সহসভাপতি হয়েছিলেন। সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের ডা. মুশতাক হোসেন। ছাত্র ইউনিয়নের নাসিরুদ্দোজা সহসাধারণ সম্পাদক এবং অশোক কর্মকার সাংস্কৃতিক সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৯০ সালের ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল নিরঙ্কুশ জয় পায়। ডাকসুতে ছাত্রদলের আমানউল্লাহ আমান ও খায়রুল কবির খোকনের নেতৃত্বাধীন ছাত্র সংসদ তখন প্রকাশ্যেই জানান দিচ্ছিল, বিএনপি দেশের একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। এর প্রতিফলন ঘটেছিল পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।

নবযাত্রা

সরকারে বিএনপি

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সরকারের চরিত্র ছিল অরাজনৈতিক ও নির্দলীয়। যদিও তাঁর উপদেষ্টাদের মধ্যে কয়েকজনের রাজনৈতিক পক্ষপাত অজানা ছিল না। যাহোক, তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান কাজ ছিল সুষ্ঠুভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা। ৭ ডিসেম্বর (১৯৯০) বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন:

> ...আমার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কাজ হলো দেশে একটা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সদস্যারা নির্বাচিত হবেন এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব শেষ হবে। এবং আমি আমার আসল কাজে (সুপ্রিম কোর্টে) ফিরে যাব। বাকি আল্লাহর মর্জি।
>
> আমার অন্তর্বর্তী সরকার একটা বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য গঠন করা হয়েছে। এ জন্য আমি রাষ্ট্রের অন্য কোনো কাজ—যেখানে নীতিগত প্রশ্ন জড়িত—সেখানে হাত দেব না। যেসব অনাবশ্যক এবং বিতর্কিত কাজের ফলে জনমনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে, আমি অবশ্য সেগুলো বাতিল করব। স্বাস্থ্যনীতি এবং ১৯৯০ সালের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ—সংক্ষেপে শিক্ষা অধ্যাদেশ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাতিল করা হবে। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪-এর ক্ষেত্রেও এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পরিশেষে আমি ছাত্রসমাজ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাই। দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আছে। জাতি গর্বের সঙ্গে সব সময় তাদের লড়াই, ত্যাগ ও ধৈর্যের কথা স্মরণ করবে। বর্তমান আন্দোলনে তারা একতার যে উদাহরণ তৈরি করেছে, তা তুলনাহীন। আমি এখন বিশেষভাবে অনুরোধ করব, তারা যেন নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে যায় এবং সত্যিকার অর্থেই শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য আমি শিক্ষকদেরও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব।...[১]

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেন, ২৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৯১) জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে তিন জোটের আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় ছোট-বড় অনেক দল পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল। বড় দলগুলো সব সময় ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি করে। তাদের কাছে আবেগের চেয়ে ক্ষমতার কদর অনেক বেশি। আবেগকে তারা প্রশ্রয় দেয় ছোট দলগুলোকে কাছে টানার এবং ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য। যেমন জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস; রাজনীতিতে ছোট-বড় বলে কোনো কথা নেই, আমরা সবাই গণতন্ত্রের পথের যাত্রী; দল যার যার হলেও রাষ্ট্র সবার—এই সব কথা আন্দোলন এবং নির্বাচনের আগে বলতে হয়। না বললে রাজনৈতিক দলের জোট বড় করা যায় না। ছোট দলগুলো ভালো করেই জানে, নির্বাচনের রাজনীতিতে তাদের লাভালাভের বিষয়টা গৌণ। বড় কোনো দলের সঙ্গে থাকতে পারলে দর-কষাকষি করে পাওনা-গন্ডা কিছু বুঝে নেওয়া যায়। তিন জোটের রূপরেখা এবং পরবর্তী সময়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তৈরি হওয়ার পর তারা অনেকেই ভাবতে শুরু করে, তারা এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার হতে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তারা সব সময় 'জাতীয় ঐকমত্য' কিংবা 'বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের' কথা বলে থাকে। অবচেতন মনে অবশ্য কাজ করে মন্ত্রিসভায় একটু জায়গা পাওয়া।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হওয়ার পর এরশাদবিরোধী আন্দোলনের আর কোনো তাৎপর্য থাকল না। রাজনৈতিক শত্রু হিসেবেও এরশাদ তখন চোখের সামনে থেকে সরে গেছেন। ১২ জানুয়ারি (১৯৯১) অবৈধ অস্ত্র রাখার এক অজুহাতে এরশাদকে কারাবন্দী করা হয়েছে। এখন রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের মুখোমুখি, ক্ষমতার মসনদটি কে দখল করবে।

এরই পাশে সিপিবি, ন্যাপ (মোজাফফর), বাকশাল এবং আরও কয়েকটি দল নির্বাচনে তিন জোটের একসঙ্গে অংশগ্রহণ এবং পরে ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'জাতীয় সরকার' গঠনের প্রস্তাব করে। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এ ধরনের প্রস্তাবে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। জাতীয় সরকার প্রসঙ্গে খালেদা জিয়া বলেন, এটা 'অপ্রয়োজনীয়'। শেখ হাসিনা বললেন, এটা একটা 'হাস্যকর' প্রস্তাব।[২] আন্দোলন হলো একধরনের লড়াই এবং নির্বাচন হলো অন্য ধরনের যুদ্ধ। এই দুইয়ের ফারাক অনেকেই বুঝতে পারেন না।

২৭ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সমীকরণ আলোচনা করা যেতে পারে। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় চারটি পক্ষ ছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছিল ৮-দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বে ছিল ৭-দলীয় জোট। এ ছাড়া ছিল বাম দলগুলোর ৫-দলীয় জোট এবং এককভাবে জামায়াতে ইসলামী। ৫-দলীয় জোটের ভেতরে নির্বাচনে কোন জোটের সঙ্গে গাঁটছড়া

বাঁধবে, এই নিয়ে টানাপোড়েন ছিল। বাসদ ৫-দলীয় জোটের ভিত্তিতেই নির্বাচনে যেতে ইচ্ছুক ছিল। তাদের কথা হলো, ৮ এবং ৭-দলীয় জোট দুটোই বুর্জোয়া জোট। সুতরাং, এদের সঙ্গে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। জাসদ ছিল দোদুল্যমান। তবে তারা কেউ চাইছিল আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট বাঁধতে, কেউ অতীতে আওয়ামী-সন্ত্রাসের শিকার হওয়ার কারণে বিএনপির সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক ছিল। স্বাধীনতা পার্টি তখন পাঁচ দলের সঙ্গে ছিল। ওরা 'ঐক্য প্রক্রিয়া' নামে নতুন একটা দল করেছিল। তাঁরাও চেয়েছিল বিএনপির সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতায় যেতে। ওয়ার্কার্স পার্টি বিএনপির সঙ্গেই নির্বাচনী জোট বাঁধতে আগ্রহী ছিল।

বিএনপির সঙ্গে ৫-দলীয় জোটের নেতাদের একটা সভা হয় ধানমন্ডির ২৭ নম্বর সড়কে বিএনপির অফিসে। সভায় বিএনপির মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদারের সঙ্গে ওয়ার্কার্স পার্টির হায়দার আকবর খান রনো ও অন্যদের কথাবার্তা হয়। ঠিক হয় বিএনপি ৫-দলীয় জোটের নেতাদের ৪০টি আসন ছেড়ে দেবে। ৫-দলীয় জোট অবশ্য ৪২টি আসন দাবি করেছিল।[৩] ঐক্য প্রক্রিয়ার নেতা নঈম জাহাঙ্গীরের ভাষ্য অনুযায়ী, আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছিল। তাঁরা বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছিলেন।[৪] পাঁচ দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোটে যেতে বিএনপির নেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরীর আগ্রহ ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'জামায়াতের সঙ্গে গেলে আমাদের ভোট বাড়বে; কিন্তু পাঁচ দল সঙ্গে থাকলে আমরা উজ্জ্বলতর হব।'[৫]

বিএনপির সঙ্গে নির্বাচনী জোট করা নিয়ে হায়দার আকবর খানের ভাষ্য এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> শেষমেশ আমাদের ১৫টা আসন দেওয়া হবে, এমন কথা জানানো হলো। বলা হলো, আমরা যেন বদরুদ্দোজা চৌধুরীর কাছে নামগুলো দিই। আমরা বসে ১৫টা নাম ঠিক করলাম। ১৫ জনের মধ্যে মেনন ছিল। জাসদের কাজী আরেফও ছিলেন। তিনি আবার তাঁর নাম-ঠিকানা লিখে দিলেন, যাতে কোনো ভুল না থাকে। আমি নামগুলো নিয়ে মগবাজারে বদরুদ্দোজার বাড়িতে গেলাম। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তবে অন্য লোক ছিলেন। তিনি বিষয়টা জানতেন। তিনি নামের তালিকাটা রাখলেন। কিন্তু পরে বিএনপি থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি।[৬]

৫-দলীয় জোটের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছিল। যত দূর জানা যায়, এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের তেমন উৎসাহ ছিল না। একপর্যায়ে আওয়ামী লীগ বলেছিল, তারা ৫-দলীয় জোটের নেতাদের বড়জোর ১২টা আসন ছেড়ে দিতে পারে। তবে ঐক্য প্রক্রিয়ার নঈম জাহাঙ্গীর এবং শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের নির্মল সেনকে কোনো আসন দেওয়া হবে

না। নঈম জাহাঙ্গীর লোকমুখে এসব কথা শুনেছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো সভায় অংশ নেননি।[৭] আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবেই নির্বাচন করতে চেয়েছিল।

আওয়ামী লীগ বরাবরই 'একলা চলো নীতি' বজায় রেখে এসেছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ৮-দলীয় জোটের মধ্যে ঐক্যের সুতো যাতে একেবারেই না ছিঁড়ে যায়, সে জন্য জোটের পাঁচটি শরিক দলকে তারা ৩৬টি আসন ছেড়ে দেয়। এতে হিতে বিপরীত হয়। জোটগতভাবে পুরোপুরি সমঝোতা না হওয়ার কারণে ৮-দলীয় জোটের শরিক দলগুলোর প্রার্থীরা ১৫০টির বেশি আসনে পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় তাঁরা কেউ 'আওয়ামী লীগ', কেউ '৮-দলীয় জোট', আবার কেউ-বা 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটে'র প্রার্থী হিসেবে ভোট চেয়ে বেড়ান।[৮]

বিএনপি তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে তাদের একটা গোপন সমঝোতা হয়। এই সমঝোতা অনুযায়ী জামায়াতকে ৬৮টি আসন ছেড়ে দেওয়া হয়। জামায়াত অবশ্য বিএনপির সঙ্গে প্রকাশ্য সমঝোতা চেয়েছিল। বিএনপি রাজি হয়নি।[৯] নির্বাচনকে সামনে রেখে কয়েকটি 'ইসলামী দল' একটা নির্বাচনী জোট তৈরি করে। 'ইসলামী ঐক্যজোট' নামের এই মোর্চায় শরিকদের মধ্যে ছিল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ইসলামী মোর্চা, নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন ও ফরায়েজী আন্দোলন।[১০]

নির্বাচনের আগের দিনে, ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৯১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ দেশবাসীর উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে একটা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষা ও তাগিদ ছিল। তিনি বলেন :

> ...জাতির ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একটি অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশে। সমগ্র জাতি আজ নির্বাচনমুখী।...ভোটাররা দলে দলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটকেন্দ্রে এলে নির্বাচনে অবৈধ তৎপরতা ও দুর্নীতির বিশেষ চক্র আপনা থেকেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান হলে কোনো বিশেষ দলের পক্ষে ভোটকেন্দ্র দখল, ছোট কারচুপি ইত্যাদি অপরাধ করা এমনিতেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। তবু যদি এমন কিছু ঘটেই যায়, তবে নির্বাচনসংক্রান্ত ঘটনার প্রকৃত মূল্যায়ন করে নির্ভীকভাবে তাৎক্ষণিক ও সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।...প্রয়োজন হলে এ ধরনের কেন্দ্রে নির্বাচন কমিশন বারবার ভোটগ্রহণ

করতেও দ্বিধা করবে না। তবু মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত নির্বাচনী ফলাফল কমিশন মেনে নেবে না।[১১]...

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে প্রচার চালায়। বিএনপি তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, ইসলাম বিপন্ন, বিসমিল্লাহ বলার অধিকার—এসবের ওপর জোর দেয়। জামায়াতে ইসলামী যথারীতি আল্লাহর শাসন কায়েমের ঘোষণা দেয়।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যায় জিতবে, এরকম একটা প্রচারণা ছিল। আওয়ামী লীগের নিজস্ব হিসাবও তা-ই ছিল। বিএনপি তখনো ছিল অগোছালো একটা দল। অনেক আসনে তাদের দলীয় প্রার্থী খুঁজে পাওয়া যায়নি। নবাগত অনেককেই তখন বিএনপি দলে নিয়েছিল। সকাল সকাল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ভোট দিয়ে 'ভি' চিহ্ন দেখিয়ে দলীয় সমর্থকদের উৎসাহিত করলেন। ৫-দলীয় জোটের নেতা হায়দার আকবর খান রনো অবশ্য আগাম আভাস দিয়েছিলেন, নির্বাচনে বিএনপি জিতবে। তাঁর মতে, ডাকসুতে তখন ছাত্রদলের রাজত্ব। আওয়ামী-সমর্থক ছাত্রলীগ ধারেকাছেও নেই। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জাতীয় রাজনীতির নির্ণায়ক।[১২]

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিএনপি নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। তারা পেয়েছিল ১৪০টি আসন। এর মধ্যে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া পাঁচটি আসনে দাঁড়িয়ে পাঁচটিতেই বিপুল ভোটে জিতে যান। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদও পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনিও সব কটিতে জয়ী হন। দুর্ভাগ্য আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার। তিনি তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ঢাকার তেজগাঁও-টঙ্গী আসনে বিএনপির অখ্যাত প্রার্থী মেজর (অব.) আবদুল মান্নানের কাছে তিনি বেশ ভালো ব্যবধানেই পরাজিত হন। পুরান ঢাকার একটি আসনে রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত নতুন বিএনপির যুবনেতা সাদেক হোসেন খোকা হাসিনাকে হারিয়ে দেন। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়ার একটি আসনে জয়ী হয়ে হাসিনা কোনোমতে তাঁর সম্মান বজায় রাখলেন। ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ নির্বাচনে হেরে যান।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল বিএনপি শতকরা ৩০ দশমিক ৮ ভাগ ভোট পেয়ে ১৪০টি আসন পেয়েছে। অন্যদিকে শতকরা ৩০ দশমিক ১ ভাগ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগের ভাগে জুটেছে ৮৮টি আসন। জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসন এবং জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসন পায়। তবে জামায়াতে ইসলামী জাতীয় পার্টি থেকে বেশি ভোট পেয়েছিল। অন্য যেসব দলের প্রার্থীরা জয় পেয়েছিলেন,

সে দলগুলোর মধ্যে ছিল বাকশাল (৫), সিপিবি (৫), ন্যাপ মোজাফফর (১), ওয়ার্কার্স পার্টি (১), জাসদ-সিরাজ (১), গণতন্ত্রী পার্টি (১), ইসলামী ঐক্যজোট (১), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (১) এবং স্বতন্ত্র (৩)। এরশাদ সরকারের পরম পরাক্রমশালী প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ এবং বিরোধী দলের নেতা আ স ম আবদুর রব নির্বাচনে হেরে যান। ছোট দলগুলোর জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইসলামী ঐক্যজোটের মওলানা ওবায়দুল হক, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, জাসদ-সিরাজের শাজাহান সিরাজ, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ন্যাপ মোজাফফরের মো. আবদুল হাফিজ, বাকশালের মহিউদ্দিন আহমেদ, আবদুর রহিম, মো. ইসহাক ও আবদুর রাজ্জাক এবং সিপিবির মোজাহার হোসেন, দবিরুল ইসলাম, নজির হোসেন, মো. ইউসুফ ও শামসুদ্দোহা।[১৩]

পরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসন বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী ভাগাভাগি করে নেয়। বিএনপি নেয় ২৮টি আর জামায়াত নেয় ২টি।

ভোটের হিসাব দিয়ে অবশ্য দলগত শক্তির বিচার করা সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগ এককভাবে বিএনপি থেকে কিছু কম ভোট পেলেও ৮-দলীয় জোটের প্রার্থীরা (এঁরা সবাই নৌকা মার্কা নিয়ে নির্বাচন করেছিলেন) শতকরা ৩৪ ভাগ ভোট পেয়ে ১০০টি আসন পান।[১৪] তবে বিএনপি এবং জামায়াতের ভোট একত্র করলে দেখা যাবে, তারা শতকরা ৪২ দশমিক ৯ ভাগ ভোট পেয়ে ১৫৮টি আসনে জয়ী হয়েছিল।[১৫] নির্বাচনী সমঝোতার কারণে যেসব আসনে জামায়াতের প্রার্থী ছিল, সেসব আসনে বিএনপির ভোটাররা স্বাভাবিকভাবেই জামায়াতকে ভোট দিয়েছিলেন। অন্যদিকে জামায়াতের সমর্থকেরা বিএনপির প্রার্থীদের আসনে বিএনপিকেই ভোট দিয়েছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

সব দলের প্রার্থীদের মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন ব্যবসায়ী। জামায়াত ছাড়া অন্যান্য দলে পেশাগত দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন আইনজীবীরা। এই নির্বাচনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সংসদীয় অভিজ্ঞতা ছিল না। অর্থাৎ সংসদে এবার নতুন সদস্যের ছড়াছড়ি।[১৬] নতুন সদস্য এবং পেশায় ব্যবসায়ী, এই দুইয়ের সম্মিলন নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দেয়।

একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে অধ্যাপক রেহমান সোবহান মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, 'প্রথমবারের মতো দেশে দ্বিদলীয়ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবে রাজনৈতিক দলগুলো এখনো তাদের কর্মসূচি জনগণের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পারেনি, যাতে জনগণ

তাদের পছন্দটি সত্যিকারভাবে প্রয়োগ করতে পারে। দেশ এখনো ব্যক্তিপূজায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।'[১৭]

নির্বাচনের আগে নেতারা যা কিছু বলেছিলেন, নির্বাচনের পর তাঁদের অনেকেরই সুর পাল্টে যায়। ২৮ জানুয়ারি (১৯৯১) শেখ হাসিনা এক সমাবেশে বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের গণজোয়ারে বিএনপি আতঙ্কিত হয়েছে।' ২৮ ফেব্রুয়ারি তাড়াহুড়ো করে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'এক অদৃশ্য শক্তির গোপন আঁতাতের মাধ্যমে নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে।'[১৮]

বিএনপি তখন রীতিমতো হাওয়ায় উড়ছে। ২৫ জানুয়ারি নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে এক সমাবেশে খালেদা জিয়া অভিযোগ করেছিলেন, 'নির্বাচনে কারচুপির চেষ্টা চলছে।' নির্বাচনে তাঁর দল জিতল। কিন্তু একবার যখন কারচুপির কথা বলেই ফেলেছেন, সেখান থেকে তো আর সরে আসা যায় না! ১ মার্চ নির্বাচন-উত্তর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বললেন, 'নির্বাচন অত্যন্ত সুন্দরভাবে হয়েছে।' তবে তিনি বলেন, 'ভোটার লিস্ট ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ভোটার লিস্টে ত্রুটি না থাকলে আমরা দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেতাম।'[১৯]

নির্বাচনে বিএনপির জয়ে এবং আওয়ামী লীগের কম আসন পাওয়ায় আওয়ামী লীগের সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা অবাক হয়েছিলেন। বিএনপিও কম বিস্মিত হয়নি। তারা অপেক্ষাকৃত নতুন দল। জিয়ার মৃত্যুর পর দলটির ওপর বারবার আঘাত এসেছে। জেনারেল এরশাদ বিএনপির উঁচু পর্যায়ের অনেক নেতাকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, বিএনপি ভাঙায় উসকানি দিয়েছিলেন। নির্বাচনের সময় দলটি পুরোপুরি নিজেদের গুছিয়ে আনতে পারেনি। তবু বিএনপি নির্বাচনে বেশি আসন পেল। এটা ছিল জনমনে আওয়ামী লীগের একটি বিকল্প খোঁজার চেষ্টা। এখানে দুটো বিষয় যুগপৎ কাজ করেছে। প্রথমত, বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা ও প্রচারণা। দ্বিতীয়ত, সজ্ঞানে কিংবা অবচেতন মনে জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশের মধ্যে জিয়াউর রহমানের ভাবমূর্তি এবং 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে অস্পষ্ট হলেও একধরনের পক্ষপাত।

আশির দশকজুড়ে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে দুই দলের আচরণ এবং কাজকর্মের একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার সুযোগও জনগণ পেয়েছিল। এই সময়ে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার একটা 'আপসহীন' ভাবমূর্তিও তৈরি হয়েছিল। মানুষ এটা পছন্দ করেছিল।

বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ১ মার্চ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন বলেন, কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে না।

বিএনপি রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেল। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধিদল ৪ মার্চ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে বলে, 'অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক মীমাংসা ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে পারেন না।'[২০]

ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের মধ্যে ছোটখাটো একটা নাটক হয়ে গেল। নির্বাচনে 'পরাজয়ের' দায় নিয়ে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। অমনি আওয়ামী লীগের হাজার হাজার কর্মী ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে ধরনা দিলেন, পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে হবে। বুলন্দ আওয়াজ উঠল, 'শেখ হাসিনা যেখানে, আমরা আছি সেখানে।' ৫ মার্চ শেখ হাসিনা কর্মীদের চাপে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন। ১৪ মার্চ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা বসল। সভায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. কামাল হোসেন বোমা ফাটালেন। ১২ পৃষ্ঠার এক চিঠিতে তিনি বললেন, 'অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, আত্মম্ভরিতা এবং কর্মবিমুখতা নির্ব্যচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের কারণ।'[২১] কামাল হোসেনের বিবৃতিতে দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হলো ভীষণ। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁকে দল থেকে বের করে দেওয়া হলো।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরপরই প্রধানমন্ত্রী পদে কাকে নিয়োগ দেওয়া যায়, সে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। জামায়াতে ইসলামী বিএনপিকে সমর্থন জানানোয় বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায় এবং খালেদা জিয়া ২০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতারা যোগ দেননি।[২২] ২১ মার্চ শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন।

দেশে তখনো রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা বহাল। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন বারবার অনুরোধ করছেন, সংসদে যেন তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সরকারপদ্ধতিতে সংশোধনী আনা হয়। তাঁর অনুরোধে বিএনপি তেমন কর্ণপাত করেছে বলে মনে হয় না। বিএনপির দলীয় গঠনতন্ত্রে অবশ্য রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারপদ্ধতির কথা বলা ছিল।

রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা থেকে সংসদীয় পদ্ধতিতে ফিরে আসা নিয়ে জল অনেক ঘোলা হয়েছে। বিএনপির অনেক নেতা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পক্ষে কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনের ওপর চাপ ছিল, তিনি যদি স্পিকারের কাছে দায়িত্ব ছেড়ে দেন, তাহলে বিএনপি সহজে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদে বিএনপির দুই-তৃতীয়াংশ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। এ জন্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা ছিল জরুরি। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মে. জে. মনজুর রশীদ খান জানিয়েছেন, এ সময় অনেক রাজনীতিবিদ ও পেশাজীবী নেতা বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং সরকারপদ্ধতি সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর মতামত জানার জন্য তাঁর সামরিক সচিবের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিতেন। তাঁদের অধিকাংশের ধারণা ছিল, সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পক্ষে এবং তারা বেগম জিয়াকে এ ব্যাপারে সমর্থন দিচ্ছে। সামরিক সচিবের ব্যাখ্যা ছিল, এ ধরনের রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত দেওয়ার কোনো সুযোগ সেনাবাহিনীর নেই।[২৩]

কিছুদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, বিএনপি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে চাচ্ছে। বেগম জিয়া দেশের প্রেসিডেন্ট হতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাই সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে বিএনপির কোনো আশু উদ্যোগ দেখা যায়নি। এটা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়। ৬ এপ্রিল ১৯৯১, জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে তিনি তিন জোটের যৌথ ঘোষণার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'যদিও এই ঘোষণা কোনো সাংবিধানিক বৈধতা বহন করে না, তবু তাতে রয়েছে বিরাট রাজনৈতিক গুরুত্ব।' ১৪ এপ্রিল আওয়ামী লীগ সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনী বিল উত্থাপন করলে 'পদ্ধতিগত ত্রুটি'র অজুহাত তুলে ওই আলোচনা বিলম্বিত করা হয়। প্রথম অধিবেশন চলে ৪১ দিন। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের জন্য বিএনপি কোনো সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি। প্রতিমন্ত্রী নাজমুল হুদা প্রকাশ্যেই বলেন, স্পিকারের কাছেই প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। এ ধরনের আচরণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মর্মাহত হন। বিএনপির নেতাদের মধ্যে দাম্ভিক ভাব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাঁদের আচরণ, কাজ ও কথায় আওয়ামী লীগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেতে থাকে।

১৯৯১ সালের ৫ জুন রেডিও ও টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তর-সংক্রান্ত সংবিধানসম্মত ফর্মুলা উদ্ভাবনের দায়িত্বের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। অবশেষে ১ জুলাই (১৯৯২) খালেদা জিয়া বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে বললেন, 'সময়ের চাহিদা অনুসারে সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'[২৪] ২ জুলাই জাতীয় সংসদে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয়। প্রথম বিলে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নিয়োগ ও পরবর্তীতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর দেওয়া সব আদেশের বৈধতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। দ্বাদশ সংশোধনী বিলে সংসদীয় সরকারপদ্ধতিতে ফিরে আসার প্রস্তাব করা হয়।[২৫]

৬ আগস্ট (১৯৯২) সংসদে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। শুধু জাতীয় পার্টি বিলের বিরোধিতা করে। দেশ সংসদীয় পদ্ধতিতে ফিরে আসে প্রায় ১৮ বছর পর। ১৫ সেপ্টেম্বর সরকারপদ্ধতি পরিবর্তন প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশনের হিসাবমতে, প্রায় ৩৫ শতাংশ ভোটার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হন এবং ৮৫ শতাংশ ভোটার সংবিধান সংশোধনীর পক্ষে ভোট দেন।[২৬] নিয়মরক্ষার জন্যই এই ভোট। পর্যবেক্ষকদের মতে, শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ ভোটারও ভোটকেন্দ্রে যাননি।

৮ অক্টোবর (১৯৯১) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ঠিক করা হয়। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন যথাক্রমে স্পিকার আবদুর রহমান বিশ্বাস এবং সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী। উভয় প্রার্থীই নিজ নিজ দলীয় প্রধানের সম্মতিতে জামায়াতের সমর্থন পাওয়ার আশায় জামায়াতের নেতা গোলাম আযমের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ চান। শেখ হাসিনা সংসদে সব বিরোধী দলের এক সভায় বলেন, বদরুল হায়দার চৌধুরী দলীয় প্রার্থী নন, জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।[২৭] ৮ অক্টোবর ১৮২-৯২ ভোটে আবদুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। দায়িত্ব ত্যাগের পর প্রথম অনুভূতি প্রকাশ করে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, 'একজন জ্যান্ত মানুষকে কবর দেওয়ার পর তাকে কবর থেকে তুললে যে অবস্থা হয়, আমারও সে অবস্থা হয়েছে।'[২৮] সাহাবুদ্দীন আহমদ আগের সমঝোতা অনুযায়ী তাঁর পূর্বপদে, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে যোগ দেন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো একটা অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের জন্য তিনি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। তিনি ছুটি নিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ জন্যই সংবিধানের একাদশ সংশোধনী করতে হয়েছিল। কথায় বলে, রাজনৈতিক ঐকমত্য ও সমঝোতা থাকলে সংবিধান কোনো বাধা নয়।

খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টোর পর তিনিই 'ইসলামি উম্মাহ'র দ্বিতীয় মহিলা সরকারপ্রধান।

গোলাম আযম বিতর্ক

বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালের ২০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। খালেদার প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মজিদ উল হক, এ এস এম মুস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ

সাইফুর রহমান, আবদুস সালাম তালুকদার, অলি আহমদ, মো. কেরামত আলী, এম কে আনোয়ার, শামসুল ইসলাম খান ও চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ। ১৫ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাস হওয়ার পর সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গৃহীত হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর খালেদা জিয়া মন্ত্রিসভা বড় করেন। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন তরিকুল ইসলাম, এম শামসুল ইসলাম, নাজমুল হুদা, আবদুল মতিন চৌধুরী, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, রফিকুল ইসলাম মিয়া, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, জমিরউদ্দিন সরকার, আবদুল্লাহ আল নোমান, হান্নান শাহ এবং এ এম জহিরউদ্দিন খান। এঁদের কয়েকজন অবশ্য ২০ মার্চ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন।

৫ এপ্রিল (১৯৯১) স্পিকার হিসেবে আবদুর রহমান বিশ্বাস নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) পদত্যাগ করেন। বিএনপির সাংসদ শেখ রাজ্জাক আলী স্পিকার নির্বাচিত হন।

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একটা বড় ধাক্কা খায়। নির্বাচনে হেরে যাবে, এটা ছিল তাদের কল্পনার বাইরে। এরশাদবিরোধী আন্দোলন কিংবা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার—এসব আওয়ামী লীগের হিসাবে ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ক্ষমতায় যাওয়া। তখন তারাই ছিল একমাত্র সংগঠিত রাজনৈতিক দল। বিএনপিকে নিয়ে তারা যুগপৎ আন্দোলন করেছিল ক্ষমতায় যাওয়ার প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য। কিন্তু ভোটারদের মনে ছিল অন্য চিন্তা। ১৯৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত আওয়ামী শাসনের স্মৃতি তখনো তাঁদের মনে ছিল সতেজ। এ বিষয়টা আওয়ামী লীগ হিসাবের মধ্যে রাখেনি। এ ছাড়া যুগপৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিএনপি এবং খালেদা জিয়া জনগণের সামনে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, নিজেদের একটা গণমুখী রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এটা আওয়ামী লীগের জন্য বুমেরাং হয়েছিল। আওয়ামী লীগের নেতা তোফায়েল আহমেদ পরে স্বীকার করেছিলেন, 'বিএনপির সঙ্গে এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন করা ছিল একটা ভুল। আমরা যদি এটা না করতাম, তাহলে বিএনপির কোনো অস্তিত্ব থাকত না।'[২৯]

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ছিল বিএনপির কৌশলগত মিত্র। ভোটের সমীকরণে এই আঁতাত ছিল খুবই জরুরি। কিন্তু গোল বাধালেন গোলাম আযম নিজেই। তিনি ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে স্বল্পমেয়াদি ভিসায়। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি ১৯৭৭ সালে যে আবেদন করেছিলেন, তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তখনো ফাইলবন্দী ছিল। ১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামীর আমির নির্বাচন করা হয়। একজন 'বিদেশি' নাগরিককে দেশের একটি রাজনৈতিক

দলের প্রধান করা ছিল সংবিধানের সুস্পষ্ট বরখেলাপ। আওয়ামী লীগ সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করে বলল, জাতীয় রাজনীতিতে একজন বিদেশির নাক গলানো দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত।[৩০]

সংসদে বিরোধী দলের সদস্যরা গোলাম আযমকে জামায়াতের আমির নির্বাচন করার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং 'যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে গোলাম আযমের বিচার দাবি করেন।[৩১] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ১২ জানুয়ারি (১৯৯২) এক বিবৃতিতে বলেন, গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক নন। জামায়াতে ইসলামী কেমন করে তাঁকে দলের আমির নির্বাচন করল, সরকার তার আইনগত দিক খতিয়ে দেখবে।[৩২]

গোলাম আযমের জামায়াতে ইসলামীর আমির হওয়ার প্রতিবাদে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় ১০১ সদস্যের একটি নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, পরবর্তী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের আগে সরকার যদি গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিষ্কার না করে, তাহলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যুদ্ধাপরাধের জন্য গণ-আদালতে গোলাম আযমের বিচার হবে। নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে যাঁরা সই করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, লে. কর্নেল (অব.) কাজী নূরুজ্জামান, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত, এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) সদরুদ্দিন, জাহানারা ইমাম, সরদার ফজলুল করিম, শামসুর রাহমান, কাইয়ুম চৌধুরী, মওলানা আবদুল আওয়াল, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হাশেম খান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান প্রমুখ।[৩৩]

২২ মার্চ লন্ডনে বাংলা পত্রিকার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করার সময় সফররত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, 'গোলাম আযম আইনের ঊর্ধ্বে নন। তবে গণ-আদালতে বিচারের কোনো যুক্তি নেই।'[৩৪]

মন্ত্রিপরিষদের এক উচ্চপর্যায়ের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গোলাম আযমের বিরুদ্ধে 'কারণ দর্শাও' বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তাতে জানতে চাওয়া হয়, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তিনি কেন বাংলাদেশ ত্যাগ করছেন না এবং সংবিধান লঙ্ঘন করে জামায়াতের আমির হওয়ার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। মন্ত্রিসভার ওই বৈঠকে গণ-আদালতের উদ্যোক্তাদের প্রতিও 'কারণ দর্শাও' নোটিশ জারি করা হয়।[৩৫]

২৪ মার্চ (১৯৯২) বিদেশি নাগরিক আইনের আওতায় গোলাম আযমকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।[৩৬] ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৭ মার্চের স্মৃতিস্তম্ভের পাশে চারটি ট্রাক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একটা এজলাস বানানো হয়। এই এজলাস থেকে বেলা ১২টা ২০ মিনিটে 'বাংলাদেশ

গণ-আদালত-১'-এর চেয়ারপারসন হিসেবে জাহানারা ইমাম গোলাম আযমের বিচারের রায় ঘোষণা করেন। গণ-আদালতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগপত্রের শেষ পরিচ্ছেদটিতে বলা হয় :

> মাননীয় আদালত
>
> আমি গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করছি। ইনি সেই গোলাম আযম, যাঁকে ফেরার ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিজ এলাকার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে নির্দেশ দেন; ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল এক প্রজ্ঞাপনবলে বাংলাদেশ সরকার যাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করে দেন; যিনি পাকিস্তানি পাসপোর্ট ও তিন মাসের ভিসা নিয়ে ১৯৭৮ সালের ১১ই জুলাই বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যিনি বেআইনিভাবে এ দেশে রয়ে যান; ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯ ও ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করেও যিনি নাগরিকত্ব ফেরত পাননি; বাংলাদেশ সরকার যাঁকে ১৯৮৮ সালের ২০শে এপ্রিলের মধ্যে দেশত্যাগের নির্দেশ দিলেও যিনি বাংলাদেশে থেকে যান; যাঁর নাগরিকত্ব ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা বাংলাদেশ সরকারের নেই বলে ১৯৮৮ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একাধিকবার জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেছেন; সেই গোলাম আযমের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য এই গণআদালতের কাছে আমি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করলাম।[৩৭]

গণ-আদালতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন জাহানারা ইমাম (চেয়ারম্যান), অ্যাডভোকেট গাজীউল হক, অধ্যাপক আহমদ শরীফ, স্থপতি মাযহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, শিল্পী কলিম শরাফী, মওলানা আবদুল আউয়াল, কর্নেল (অব.) কাজী নূরউজ্জামান, কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী ও ব্যারিস্টার শওকত আলী খান। বিচারকমণ্ডলীতে বেগম সুফিয়া কামাল ও শওকত ওসমানের নাম ছিল। সরকার ২৬ মার্চ কী ব্যবস্থা নেবে এবং ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সুফিয়া কামাল তা মোকাবিলা করতে পারবেন কি না, তা চিন্তা করে বিচারকমণ্ডলী থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। শওকত ওসমান নির্দিষ্ট সময়ে আসতে পারেননি বিধায় তাঁর বদলে সাক্ষীদের একজন সাংবাদিক মওলানা আবদুল আউয়ালকে বিচারক হিসেবে রাখা হয়। অভিযোগকারী ছিলেন তিনজন : সৈয়দ শামসুল হক, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অভিযোগকারীদের কৌসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না, অ্যাডভোকেট শামসুদ্দীন বাবুল ও অ্যাডভোকেট কুলসুম রেখা। গোলাম আযমের অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য গণ-আদালতে

অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলামকে (আসিফ নজরুল নামে পরিচিত) নিযুক্ত করেন। রায়ে বিচারকেরা বলেন :

> অভিযুক্ত গোলাম আযমের বিরুদ্ধে প্রতিটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করি এবং আনীত প্রতিটি অভিযোগের প্রত্যেক অপরাধে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করছি। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে উপরোক্ত অপরাধ দৃষ্টান্তমূলক মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।
>
> যেহেতু গণআদালত কোনো দণ্ডাদেশ কার্যকর করে না, সেহেতু গোলাম আযমকে আমরা দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে বাংলাদেশ সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।[৩৮]

কথা ছিল প্রেসক্লাবে গিয়ে জাহানারা ইমাম সাংবাদিকদের কাছে বিচার-প্রক্রিয়া ও রায় ব্যাখ্যা করবেন। সেখানে গিয়ে তিনি বলেন, 'গোলাম আযমের ফাঁসির আদেশ হয়েছে।' পরে আনিসুজ্জামান তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি এ কথা কেন বললেন—রায়ে তো ফাঁসির কোনো কথা নেই। জবাবে তিনি বলেন, উত্তেজনাবশত তিনি অমন বলে ফেলেছেন—তাঁর ভুল হয়েছে।[৩৯]

সন্ধ্যায় *আজকের কাগজ*-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জাহানারা ইমাম বলেন, 'রায় কার্যকর না করলে দুর্বার গণ-আন্দোলন। পর্যায়ক্রমে সমস্ত ঘাতকের বিচার করব।' শেখ হাসিনা একে 'জনতার বিজয়' বলে অভিহিত করেন।[৪০]

সরকার ২৮ মার্চ গণ-আদালতের সদস্যসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। যাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জাহানারা ইমাম, গাজীউল হক, আহমদ শরীফ, মাযহারুল ইসলাম, শফিক আহমেদ, ফয়েজ আহমেদ, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, মওলানা আবদুল আওয়াল, কাজী নূরুজ্জামান, শওকত আলী খান, আবু ওসমান চৌধুরী, জেড আই খান পান্না, শামসুদ্দিন বাবুল, উম্মে কুলসুম রেখা, মো. নজরুল ইসলাম, আনিসুজ্জামান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ শামসুল হক, ইয়াহিয়া মাহমুদ, আলী যাকের, মুশতাক হোসেন, আবদুল মান্নান চৌধুরী এবং শাহরিয়ার কবির।[৪১] তাঁরা সবাই ২৯ মার্চ হাইকোর্টে উপস্থিত হয়ে আগাম জামিন নেন।[৪২]

ইতিমধ্যে গোলাম আযম তাঁর নাগরিকত্ব কেন বাতিল করা হলো—এই মর্মে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। হাইকোর্টের দুই সদস্যের একটি এজলাস ১২ আগস্ট (১৯৯২) গোলাম আযমের আবেদনের পরিপেক্ষিতে বিভক্তি আদেশ দেন। জ্যেষ্ঠ বিচারক ইসমাইল উদ্দিন তাঁর রায়ে বলেন, গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল আইন অনুযায়ী বৈধ। অন্যদিকে বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ১৯৭৩ সালে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল করার বিষয়টি আইনসম্মত হয়নি।[৪৩]

মামলাটি এরপর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হয়। প্রধান বিচারপতি মামলাটি হাইকোর্টের তৃতীয় একজন বিচারপতি আনোয়ারুল হকের এজলাসে পাঠান। ২২ এপ্রিল (১৯৯৩) বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেন, গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিলের আদেশ ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ। বিচারপতি আরও বলেন, গোলাম আযম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক এবং তিনি এ দেশের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। পাসপোর্ট একটি সাময়িক দলিল মাত্র।[৪৪]

একদিকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে গণ-আদালতের বিচার, অন্যদিকে নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত মামলা, এর ফলে বিষয়টি জটিল হয়ে পড়ে। গণ-আদালতের চেয়ারম্যান জাহানারা ইমাম তাঁদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন, তাঁদের অভিযোগ হচ্ছে যুদ্ধাপরাধ-সম্পর্কিত। নাগরিকত্ব বিষয়টি তাঁদের কাছে মুখ্য নয়, এটা সরকার এবং গোলাম আযমের মধ্যকার বিষয়।[৪৫]

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে যায়। আপিল বিভাগে তখন প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল থাকলেও চারজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটা বেঞ্চ তৈরি হয়। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ছিলেন 'প্রিসাইডিং জজ'। বিচারপতি মোস্তফা কামাল ছাড়াও অন্য দুজন বিচারপতি ছিলেন এ টি এম আফজাল ও লতিফুর রহমান। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চের রায়—অর্থাৎ গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করার পক্ষে মত দেন।[৪৬] মনে হতে পারে, গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরে পেলেন বিচারিক প্রক্রিয়ায়, কোনো রাজনৈতিক কৌশলের কারণে নয়। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের সেরা বিচারপতিরা এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন। অবশ্য এ নিয়ে পরবর্তী সময়ে জল অনেক ঘোলা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জামায়াতের নেতা মতিউর রহমান নিজামী হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। নিজামীর বয়ানটি ছিল এরকম :

> গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যাবতীয় প্রক্রিয়া বিএনপি সরকার ১৯৭৯ সালে সম্পন্ন করেছিল। তখন এতে শুধু প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর বাকি ছিল বলে হতে পারেনি। গত বছর নির্বাচনের পরপর বিএনপি সবার আগে গোলাম আযমের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সে সময় সরকারকে সমর্থন দিয়েছিলাম, শর্ত দিইনি। তবে কথা হয়েছিল যে বিএনপিকে তার '৭৯ সালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে হবে। আমি তার জীবন্ত সাক্ষী। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দায়িত্ব এখন বিএনপি সরকারের।[৪৭]

২৪ জুন (১৯৯৪) দলীয় সমর্থকদের এক সমাবেশে গোলাম আযম বলেন, 'অতীতে ভুল করে থাকলে দুঃখিত।'[৪৮]

গোলাম আযম বাংলাদেশের মানুষের কাছে একজন নিন্দিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭১ সালে যে কয়টা রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা এবং পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, জামায়াত ছিল তাদের মধ্যে প্রধান। জামায়াতের পূর্ব পাকিস্তানের ওই সময়ের আমির গোলাম আযম পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দহরম-মহরম করেছিলেন বলে অভিযোগ ছিল। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বেই একাত্তরের ঘাতক 'বদর বাহিনী'র জন্ম হয় এবং এই বাহিনীর হাতে অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী নৃশংসভাবে নিহত হন।

জামায়াতের আমির গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যখন দেশের নাগরিকেরা আন্দোলন করছিলেন, সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে নানা রকম মদদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সরকার সরাসরি তাঁকে সমর্থন না দিলেও তাঁর ব্যাপারে নির্লিপ্ত থেকেছে। এটা জিয়াউর রহমান, এরশাদ এবং খালেদা জিয়া—সবার জন্যই প্রযোজ্য। গোলাম আযম ও একাত্তরের অন্যান্য 'যুদ্ধাপরাধী'র বিচারের দাবিতে 'ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি' নামে একটা নাগরিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ওই সময় রাজনীতির দুই পরাশক্তি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে চলছিল শীতল লড়াই। গণ-আদালত এবং নির্মূল কমিটিও শেষ পর্যন্ত দুই দলের রাজনৈতিক লড়াই থেকে দূরে থাকতে পারেনি। ফলে যাঁরা যুদ্ধাপরাধের বিচার চেয়েছেন, কিন্তু যাঁরা আওয়ামী লীগ সমর্থন করেন না, তাঁদের অনেকেই এসব কমিটি থেকে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিটকে পড়েন। কমিটিগুলোর আন্দোলন শেষমেশ দলীয়করণের ফাঁদে পড়ে তাদের আসল কর্তব্য থেকে অনেকটাই দূরে সরে যায়। ফলে জামায়াতে ইসলামী রাজনীতিতে ধীরে ধীরে পুনর্বাসিত হয়ে যায়। গণ-আদালতের অন্যতম উদ্যোক্তা ও স্পষ্টভাষী হিসেবে খ্যাত অধ্যাপক আহমদ শরীফের অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে ছিল বেশ তিক্ত। তাঁর বয়ান এখানে উল্লেখ করা হলো।

> রাজাকারদের '৯১ সাল পর্যন্ত সহ্য করা হয়েছে। শাহ আজিজরা দেশ শাসন করেছে। জিয়া রাজাকার সহযোগিতায় নায়কতন্ত্র চালু করেছিল। রাজাকার-নায়ক গোলাম আযমকে বাংলাদেশে জিয়া ৪ বছর পুষেছে। হঠাৎ জাহানারার নেতৃত্বে কিন্তু কর্নেল কাজী নুরুজ্জামানের উদ্যমে-উদ্যোগে-আয়োজনে গণ-আদালতি আন্দোলন গড়ে উঠল, জোরালো হলো। তাদের দাবি ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধী রূপে গোলাম আযমের বিচার। সংসদের অধিবেশনকালে এ আন্দোলন মন্দা বা বিলুপ্ত করার অভিপ্রায়ে সরকারি দলের উপনেতা ডাক্তার বদরুদ্দোজা চৌধুরী ঘোষণা করলেন, গোলাম আযম অবশ্যই অপরাধী এবং তাঁর বিচার হবে আদালতে। জাহানারা ইমামের আন্দোলনে ট্রাইব্যুনাল মিলল না। সরকারও আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে কথা রাখল না। জাহানারা ইমামরাও আদালতের আশ্রয় নিলেন না। মধ্যখানে গোলাম আযমের

দৈনিক সংগ্রাম

DAINIK SANGRAM

25 October 1992

আহমদ শরীফের প্রকাশ্যে ফাসি দাবী

গণআদালতের অন্যতম বিচারক অধ্যাপক আহমদ শরীফের ফাঁসির দাবিতে ঢাকায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের মিছিল

সন্তানের আবেদনক্রমে সুপ্রিম কোর্ট গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকরূপে স্বীকৃতি দিল। তবু বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁর প্রতি মারমুখো রইল। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে পুরো মেয়াদ অবধি রাজত্ব করতে না দেওয়ার মতলবে তুচ্ছ অজুহাতে সংসদ বর্জন করল, সঙ্গে নিল স্বৈরাচারী বলে ধিকৃত ও বিতাড়িত এরশাদের জাতীয় পার্টিকে আর রাজাকার বলে ঘৃণিত

জামায়াতে ইসলামী দলকে। এভাবে আওয়ামী লীগ সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করে আত্মহননের ও ঘৃণ্য হওয়ার পথ বেছে নিল। জনগণের সারল্যের ও অবজ্ঞার সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রচার করল যে জাতীয় পার্টির ও জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আঁতাত করেছে সংসদীয় সংগ্রামে সহযোগী ও সঙ্গীরূপে পাওয়ার জন্য—সাধারণ শত্রু বিএনপিকে গদিচ্যুত করার লক্ষ্যে। তাই বলে জামায়াতকে কিংবা জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগ মিত্র ভাবে না, ভাবে না সহযোগীরূপে রাজনীতিক অঙ্গনে। জনগণকে বিভ্রান্ত রাখার গরজে সৈয়দ হাসান ইমাম-শাহরিয়ার কবির প্রভৃতি সব আওয়ামী লিগার দিয়ে গঠন করিয়েছে নির্মূল ও সমন্বয় কমিটি। অর্থ আত্মসাৎ প্রভৃতি অভিযোগ ও দ্বন্দ্বে কমিটি দুভাগ হয়েছে। এটা আর জমবে না আন্দোলন হিসেবে। আমি চরম ঘৃণায় তাঁদের সম্পর্ক ত্যাগ করেছি—গণ-আদালতি আসামি হয়েও। আমি রাজাকারদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি নিরর্থক ও অন্যায় বলেই মানি, কেননা এক রাষ্ট্রপতি তাদের ক্ষমা করেছেন, অন্য এক জঙ্গি নায়ক জিয়া তাদের তাঁর সহযোগী সম্বল করে রাজত্ব করেছিলেন। তখন কেউ আন্দোলন করেনি। সবাই উক্ত দুই শাসকের সিদ্ধান্তের বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি যথাসময়ে। আমার লক্ষ্য ছিলেন গোলাম আযম। কারণ, আমার চোখে তিনি ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন একজন একটি ইসলামিক দলের সর্বজনমান্য নেতা ও ব্যক্তিত্ব, একটি রাজনৈতিক দলের, একটি আদর্শের, একটি লক্ষ্যের, একটি প্রতিষ্ঠানের, একটি রাজনীতিক ও শাস্ত্রিক শক্তির প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ; তাই তাঁর পতনে বা শাস্তিতে আমার ধারণা জামায়াতে ইসলামী দল হৃতবল, হীনবল হয়ে হয়ে আত্মবিলুপ্তি পেত।[৪]

উপনির্বাচন

১৯৮০-এর দশকে দেশে যখন 'স্বৈরাচারবিরোধী' আন্দোলন চলছিল, তখন অনুমান করা হয়েছিল, রাজনৈতিক দলগুলো বুঝি মননে ও আচরণে গণতান্ত্রিক হয়ে গেছে। ১৯৯১ সালে নতুন করে যখন সংসদীয় গণতন্ত্রের পথচলা শুরু হলো, জনগণের আশা তিমিরেই থেকে গেল।

বিএনপি সরকার তার মেয়াদে কয়েকটি উপনির্বাচনের আয়োজন করে। উপনির্বাচনগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এ নিয়ে অনেক অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ ওঠে। ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ভোটারদের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়নি, সবাই মোটামুটি এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। ধারণা করা হয়েছিল, এরশাদ-পরবর্তী জমানায় অবস্থার পরিবর্তন হবে; ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে এবং তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে জয়ী করতে পারবেন। বিএনপি সরকারকে প্রথম পরীক্ষায় নামতে হলো ঢাকার মিরপুরের একটি আসনে উপনির্বাচন নিয়ে।

সাংসদ হারুনুর রশীদ মোল্লার মৃত্যু হলে তাঁর শূন্য আসনে ২ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৩) উপনির্বাচন হয়। নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হলে আওয়ামী লীগের সদস্যরা জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন। আওয়ামী লীগ ১৬টি কেন্দ্রে আবার নির্বাচন দাবি করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ উপনির্বাচনের ফল বাতিল করে পুনরায় ভোট গণনার আদেশ দেন। দ্বিতীয়বার ভোট গণনার পর ১৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপির প্রার্থীকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনের ফল ঘোষণা নিয়ে দৈনিক *সংবাদ*-এ একটা বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। প্রতিবেদনের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> মিরপুর উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা নিয়ে নানা রকম ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন রাত ১০টার খবরে বার্তা সংস্থা ইউএনবির বেসরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে বিএনপি প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে। রেডিও বাংলাদেশ রাত ১১টার খবরে কারও বরাত না দিয়েই একই খবর দিয়েছে। এদিকে ভয়েস অব আমেরিকা রাত ১০টার খবরে বিভাগীয় কমিশনারের বরাত দিয়ে জানিয়েছিল, ভোট গণনাই হবে রাত ১২টা পর্যন্ত। রাত সাড়ে ১১টায় *সংবাদ*-এর এক প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশনারের একটি সূত্র জানায়, তারা কোনো প্রার্থীর পক্ষে তখনো ফল ঘোষণা করেনি। নির্বাচন কমিশন মিরপুরে অবস্থিত তাদের অস্থায়ী কার্যালয়ের বরাত দিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মোট ৭৮টি কেন্দ্রের বেসরকারি ফল প্রকাশ করে। সেই ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীন পেয়েছিলেন ৫০ হাজার ৬৭৮টি ভোট, আওয়ামী লীগ প্রার্থী পেয়েছিলেন ৪৯ হাজার ৪২২ ভোট। এরপর তারা আর কোনো খবর দেয়নি। তবে রাত আটটা পর্যন্ত কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় জানিয়েছিল যে তারা মোট ১০৫টি কেন্দ্রের ফলাফল পেয়েছে। সেই ফল অনুযায়ী কামাল মজুমদার (আ.লীগ প্রার্থী) বিপুল ভোটে এগিয়েছিলেন। জানা গেছে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর থেকে জটিলতার সৃষ্টি হয়।...একপর্যায়ে আবার গণনা শুরু হলে ১০৫টি কেন্দ্রের ফল পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত কামাল মজুমদার বিপুল ভোটে এগিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর অজ্ঞাত কারণে ভোটের ফল ঘোষণা স্থগিত হয়ে যায়। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচন কমিশন তাদের পাওয়া ফলের বিপরীতে ঘোষণা দিতে আপত্তি জানালেই বিপত্তি বাধে। সেই থেকে অচলাবস্থা। গভীর রাত পর্যন্ত এই অচলাবস্থা চলছিল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারসহ সকল পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেখানে অবস্থান করছেন।[৫০]

৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে বলেন, 'এই আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিজয় ছিল সুনিশ্চিত। বিএনপি সরকার মিডিয়া ক্যু করে এই বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে।'[৫১]

১৯৯৪ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি মেয়রের পদগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। ঢাকায় আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ হানিফ এবং চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের মহিউদ্দিন চৌধুরী মেয়র নির্বাচিত হন। অন্যদিকে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী তৈয়বুর রহমান ও মিজানুর রহমান মিনু যথাক্রমে খুলনা ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন।

মেয়র নির্বাচন ভালোভাবে হয়ে গেলেও গোল বাধে মাগুরায় উপনির্বাচন নিয়ে। ১৬ ডিসেম্বর (১৯৯৩) মাগুরা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সাংসদ আসাদুজ্জামানের মৃত্যু হলে ওই আসনে ২০ মার্চ (১৯৯৪) উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপনির্বাচনকে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয়েই মর্যাদার লড়াই হিসেবে বিবেচনা করে। দুই দলের দুই শীর্ষ নেত্রী একাধিকবার মাগুরা সফর করে নির্বাচনের গুরুত্ব এবং উত্তেজনা দুই-ই বাড়িয়ে দেন। তাঁদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিল, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।' মাগুরায় এযাবৎ সব নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী হয়ে এসেছেন। কিন্তু বিএনপি এবার এটা বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতে রাজি হলো না।

নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী কাজী সলিমুল হক কামালকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিএনপির পক্ষ থেকে নির্বাচনী দায়িত্বে ছিলেন মন্ত্রী মজিদ উল হক। নির্বাচনে লাগামহীন কারচুপি দেখে তিনি নিজেও বিব্রত হন। নির্বাচনে গোলমাল হতে পারে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারও এরকম আশঙ্কা করেছিলেন। গণমাধ্যমে বিষয়টা এভাবে উঠে এসেছে :

> গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ মাগুরা ত্যাগ করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।...বার্তা সংস্থা ইউএনবি জানিয়েছে, ঢাকায় রওনা হওয়ার মুহূর্তে বিচারপতি আবদুর রউফ স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে আজকের উপনির্বাচনের নিরপেক্ষতার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থায় আবারও নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করা যায় না বলেই আমার ধারণা। পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। আমি চাই না আমার উপস্থিতিতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটুক। আমি এর দায়িত্ব নিতে চাই না।[৫২]

নির্বাচনের ফল ঘোষণার সময়ই আওয়ামী লীগের প্রার্থী শফিকুল হাসান বাচ্চু নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে আবার নির্বাচন দাবি করেন। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায়, ১০২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯৯টিতে সলিমুল হকের পাওয়া ৭৩ হাজার ২৪৮ ভোটের বিপরীতে তিনি মাত্র ৩৯ হাজার ৬২৩ ভোট পেয়েছেন। গণমাধ্যমে ভোটে ব্যাপক জালিয়াতির সংবাদ ছাপা হয়। *ভোরের কাগজ*-এর

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন স্থানে ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভোট কারচুপি, এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, এসব কেন্দ্রে বিএনপি-সমর্থকেরা বিরোধীদলীয় পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়।[৫৩]

রাজনৈতিক বিরোধ

দীর্ঘকাল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সেনাশাসন থাকার পর ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রের নবযাত্রা শুরু হয়েছিল। তিন বছরের মধ্যেই সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়ে। সংসদীয় মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে ঐকমত্যের অভাব, বিশেষ করে বিরোধী দলের লাগাতার অধিবেশন বর্জনের ফলে সংসদীয় ব্যবস্থা হোঁচট খায়। সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার দলগুলোর ঘোষণার মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। গঠনমূলক রাজনীতির অনুপস্থিতিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে দূরত্ব বাড়তেই থাকে। জনগণের সমস্যাগুলো পাশ কাটিয়ে তারা শুধু বচসা আর বাগাড়ম্বরেই ব্যস্ত থাকে। সরকারি ও বিরোধী দল দুটোই এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।[৫৪]

কথায় কথায় হরতাল ডাকা একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। বিরোধী দলের আহ্বানে শুধু ১৯৯৪ সালেই ১৪টি হরতাল, চারটি অবরোধ ও তিনটি ঘেরাওয়ের আয়োজন করা হয়েছিল।[৫৫] এর ফলে অর্থনীতি প্রচণ্ড ক্ষতির মধ্যে পড়ে। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জাপানি সাহায্য এসেছিল ১২৫ মিলিয়ন ডলার। অথচ ১৯৯১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ডাকা হরতালের ফলে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১২৮ মিলিয়ন ডলার।[৫৬] রাজনৈতিক সংকটের অন্যতম কারণ ছিল বিরোধী দলের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই সরকারের এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা এবং অন্যদিকে বিরোধী দলের 'বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা' করা।[৫৭]

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির সরকারের সময় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন। ১৯৯২ সালের ৫ আগস্ট সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে মোট সাতটি অনাস্থা প্রস্তাব তোলা হয়। প্রস্তাবগুলো আলাদাভাবে তোলে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ, ন্যাপ (মোজাফফর), সিপিবি এবং গণতন্ত্রী পার্টি। আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ। স্পিকার কেবল সামাদ আজাদের প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করেন। এই

প্রস্তাবে বিরাজমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সন্ত্রাস ও দেশের নানা সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি অভিযোগ ছিল। প্রস্তাবের পক্ষে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছাড়াও সামসুদ্দোহা (সিপিবি), শেখ আনসার আলী (জামায়াতে ইসলামী), শাজাহান সিরাজ (জাসদ-সিরাজ) ও মওদুদ আহমদ (জাতীয় পার্টি) বক্তব্য দেন। স্পিকার প্রস্তাবটি ভোটে দিলে তা ১৮৬-১২২ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামীর ১৮ জন সদস্য ভোটে অংশ নেননি। এ ছাড়া এনডিপির সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ইসলামী ঐক্যজোটের সদস্য ও দুজন স্বতন্ত্র সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন।[৫৮]

প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা রেখে সংসদে নিজেদের বিকল্প সরকার হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রবণতা ছিল ক্ষণস্থায়ী। অচিরেই তারা সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিহীন নেতিবাচক রাজনীতির পথে পা বাড়ায়।[৫৯]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি

১৯৯৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছিল। ১ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শেখ হাসিনা আবারও বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে সরকারকে বাধ্য করব।' মিরপুর ও মাগুরা উপনির্বাচনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আরও জোরদার হয়। বিরোধী দল ৪-৬ মে (১৯৯৪) সংসদে বাজেট অধিবেশন বর্জন করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ১০ ও ২৬ এপ্রিল হরতাল পালন করে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীও একই দাবিতে হরতালে অংশ নেয়। ১৭ জুন আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে। তাদের মূল দাবি ছিল, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সংসদ নির্বাচনের আগে একটা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে। এ জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

২৭ জুন (১৯৯৪) আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের রূপরেখা ঘোষণা করে। সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা, মওদুদ আহমদ ও মতিউর রহমান নিজামী নিজ নিজ দলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিন দলের রূপরেখায় বলা হয়, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন। রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনার জন্য জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শক্রমে একজন নির্দলীয় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। নির্বাচনের পর নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে।[৬০] এ ছাড়া নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করারও দাবি জানানো হয়।[৬১]

১ অক্টোবর (১৯৯৪) মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, 'বিরোধী দলের দাবি ও প্রস্তাব অসাংবিধানিক।' তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে নমনীয় বক্তব্য দিলে ৪ নভেম্বর তিনি মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত হন।[৬২] সব বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে এবং ২৭ ডিসেম্বরের (১৯৯৪) মধ্যে দাবি মেনে নেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেয়। দাবি পূরণ না হলে ১৪৭ জন বিরোধীদলীয় সাংসদ ২৮ ডিসেম্বর একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন।[৬৩]

বিরোধী দলের লাগাতার আন্দোলনের মুখে বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন অনড়। ডিসেম্বরে পদত্যাগ করার আগে আওয়ামী লীগের সাংসদেরা ৮ সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের নেতা শেখ হাসিনার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। এটা ছিল সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের একটা কৌশল। কিন্তু খালেদা জিয়া তাতে দমেননি। ৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা অবস্থান ধর্মঘট করেন। সেখানে দুই দলে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। দুই শতাধিক সদস্য আহত হন। বিএনপি সংসদীয় দলের সভায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জোরের সঙ্গেই বলেন, 'ক্ষমতা হারাতে পারি, কিন্তু নীতি ও আদর্শচ্যুত হব না।' এ সময় ব্যক্তিগত আক্রমণও হতে থাকে। ১৫ নভেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করার সময় শেখ হাসিনা খালেদাকে এরশাদের অনুগ্রহজীবী হিসেবে ইঙ্গিত করে বলেন, 'খালেদা জিয়া এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়ও ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন।'[৬৪] বাজারে অবশ্য গুঞ্জন ছিল, ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ এরশাদের কাছ থেকে প্রচুর নগদ নারায়ণ পেয়ে নির্বাচনের মাঠে নেমেছিল আর নির্বাচন না করার জন্য বিএনপিকে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়েছিল।

২৮ ডিসেম্বর (১৯৯৪) জাতীয় সংসদ থেকে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মো.), বাকশাল, জাতীয় পার্টি, এনডিপি (সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী) ও জামায়াতের সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করেন।[৬৫] ১ জানুয়ারি (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলগুলোকে সাংবিধানিক রাজনীতিতে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানান। ২

জানুয়ারি থেকে শুরু হয় বিরোধী দলের তিন দিনব্যাপী হরতাল। ১৩ জানুয়ারি ড. কামাল হোসেন সংকট উত্তরণের জন্য জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানান। বিএনপি সংসদীয় দলের উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী সংলাপের আহ্বান জানালে ১৮ জানুয়ারি বিরোধী দল ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

অনিয়ম-দুর্নীতি

বিএনপি সরকার শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক সংবাদ প্রচারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হচ্ছে না এই অভিযোগে জাপান সরকার বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। বিটিভির তিনটি প্রকল্পে প্রত্যাশিত জাপানি সাহায্যের পরিমাণ ছিল বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৫০ কোটি। জাপানি দূতাবাসের চিঠিতে বলা হয়, 'আমাদের জানামতে, বিটিভি থেকে প্রচারিত সংবাদ ও তথ্য রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ নয় বলে বাংলাদেশে জনমত রয়েছে।'[৬৬]

কয়েকটি দাতা দেশ ও সংস্থা সরকার পরিচালিত কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি, পল্লি উন্নয়ন, শিক্ষার জন্য খাদ্য, টেস্ট রিলিফসহ বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য গম বরাদ্দ প্রক্রিয়া ও নীতিমালা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। দাতাদের ধারণা হলো, এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দলীয় পক্ষপাতের কারণে প্রকৃত দুস্থ ও অভাবী মানুষ সাহায্য পাচ্ছে না। দাতাদের এসব অভিযোগের জবাবে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তারা সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি।[৬৭]

এ সময় (আগস্ট ১৯৯৫) ইয়াসমিন নামের এক কিশোরীকে পুলিশ ধর্ষণ করলে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইয়াসমিনের মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটে দিনাজপুরে। ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা এবং এর জের ধরে পরে আরও সাতজন নিহত হওয়ার পর জনরোষের ভয়ে ডিসি ও এসপি যখন পালিয়ে গিয়েছিলেন, তখন এডিএম আবু হাফিজ জেলা প্রশাসনের হাল ধরেন। বিশেষ মহলের চাপে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে বদলি করা হলে দিনাজপুরের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে, মহিলা সাংসদ এবং প্রধানমন্ত্রীর বড় বোন বেগম খুরশীদ জাহান হকের চাপেই এডিএমকে দিনাজপুর থেকে বদলি করা হয়। বদলির কারণটি ছিল অতি তুচ্ছ। ইয়াসমিন হত্যার এক মাস পর খুরশীদ জাহান দিনাজপুরে এলে জেলা প্রশাসন থেকে তাঁকে কোনো গাড়ি দেওয়া হয়নি। জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে আগে তিনি সব সময় গাড়ি পেতেন। ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক জানিয়ে দেন, ব্যক্তিগত কাজে সরকারি গাড়ি দেওয়া যাবে না। তখন থেকেই খুরশীদ জাহান এডিএমের ওপর নাখোশ ছিলেন।[৬৮]

প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং সরকারি সম্পত্তি নানা ছলে দখলে নেওয়ার অভিযোগ ছিল। গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এ বিষয়ে অনেক তথ্য উঠে আসে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার অধিগ্রহণকৃত ১৯ কোটি টাকা মূল্যের একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান মাত্র পাঁচ কোটি টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চগড়ে অবস্থিত জাজ ডিস্টিলারি নামের এই প্রতিষ্ঠানটি বিক্রি করা হয় খালেদা জিয়ার পরিবারের মালিকানাধীন মার্শাল সার্ভিসেস নামের একটি কোম্পানিকে। কোম্পানির অফিস ছিল ঢাকার কাকরাইলে। শুধু নামমাত্র মূল্যেই এটা বেচা হয়নি, আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ছাড়াই সম্পূর্ণ অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠানটি হস্তান্তর করা হয়। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরিবার অন্য যেসব শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছে, তার মধ্যে আছে ইউনিটেক্স অ্যাপারেলস লিমিটেড, ক্রোনোটেক্স, ক্রিমেন্টাইল লি., টারটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লি., রহমান নেভিগেশন কোম্পানি লি., ইসলাম ট্রেডিং কনসোর্টিয়াম লি., অ্যাসোসিয়েট সয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং লি., ঢাকা কনসালটিং লি., ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এজেন্সি লি., উডল্যান্ড অ্যাপারেলস, রূপসী ডেইরি অ্যান্ড ফিশারিজ কমপ্লেক্স, ঢাকা হাসপাতাল লি. এবং ড্যান্ডি ডায়িং লি.। এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় প্রধানমন্ত্রীর দুই ছেলে তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান, ভাই সাঈদ ইসকান্দার ও তাঁর স্ত্রী নাসরিন সাঈদ ছাড়াও রয়েছেন কাজী গালিব আবদুস সাত্তার, গিয়াসউদ্দিন আল মামুন প্রমুখ।[৬৯] প্রধানমন্ত্রীর পরিবার তত দিনে বিরাট এক আর্থিক সাম্রাজ্যের মালিক বনে গেছে।

জামায়াতের পুনর্বাসন

একাত্তরের প্রজন্ম গোলাম আযমকে ভালো করেই চিনত। 'ইসলাম' ও 'মুসলমান' শব্দ ব্যবহার করে যে দলগুলো এ দেশে রাজনীতি করত, জামায়াতে ইসলামী ছিল তার মধ্যে প্রধান। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তারা বাংলাদেশে জাতীয় পরিষদে কোনো আসন পায়নি। যারা উঠতে-বসতে জামায়াতকে গাল দেয়, ভোটের হিসাবে তারা অনেকেই ছিল জনগণের কাছে নিতান্তই পরিত্যক্ত দল। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে জামায়াত সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিল বগুড়ায় (১৯ দশমিক ৮ শতাংশ)। এর পরেই জামায়াতের ভোট বেশি পাওয়া জেলাগুলোর মধ্যে ছিল দিনাজপুর (১৩ শতাংশ), খুলনা (১২ শতাংশ), রংপুর (১০ দশমিক ৯ শতাংশ), পাবনা (১০ দশমিক ৬ শতাংশ), যশোর (১০ দশমিক ৫ শতাংশ), নোয়াখালী (৮ শতাংশ) এবং

রাজশাহী (৬ দশমিক ৬ শতাংশ)। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ শতকরা ৭০ দশমিক ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৮৭ আসনে জয়ী হলেও, জামায়াতে ইসলামী শতকরা ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ ভোট পেয়ে একটি মাত্র আসনে জয়ী হয়।[৭০]

১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াতের মোটামুটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে যথাক্রমে ৪৪ ও ৫৮ শতাংশ আসনে। যদিও ভোটের ব্যবধান ছিল অনেক। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হলেও জামায়াত ভোটের হিসাবে ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম দল।[৭১]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার অভিযোগে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া সংবিধানে ধর্মভিত্তিক দল করার ব্যাপারে বিধিনিষেধ থাকার কারণে আপনা-আপনি এসব দল লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। এই দলগুলোর মধ্যে ছিল জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, পিডিপি, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), মুসলিম লীগ (কনভেনশন), মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) ও ইসলামিক গণতান্ত্রিক দল। জিয়াউর রহমান সংবিধান সংশোধন করায় ইসলামভিত্তিক দলগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় এবং তারা রাজনীতিতে নিজেদের আবার সংগঠিত করে। ভোটের সমীকরণে জামায়াতে ইসলামীর গুরুত্ব ছিল অনেক। এই সমীকরণটিই জামায়াতকে বিএনপির কাছাকাছি নিয়ে আসে। জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার কারণে বিএনপি পচে গেছে কিংবা পাকিস্তানের দালাল হয়ে গেছে, এরকম প্রচারণা আছে। ক্ষমতার রাজনীতিতে ক্ষমতায় যাওয়াটাই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। এ জন্য প্রয়োজনে রাজনৈতিক দলগুলো শয়তানের সঙ্গে আঁতাত করতেও পিছপা হয় না। এ দেশের রাজনীতিতে তাই জামায়াতকে নিয়ে বড় দুই দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে টানাহেঁচড়া লেগেই ছিল। উদ্দেশ্য একটাই, ভোটের হিসাব বাড়ানো।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের সমঝোতা হওয়ার কারণে জামায়াত জাতীয় সংসদে চতুর্থ প্রধান দল হতে পেরেছিল। সংসদীয় রাজনীতিতে জামায়াত ১৯৮৬ সাল থেকেই পুনর্বাসিত হতে থাকে। কিন্তু একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা করার কারণে তার কোনো নৈতিক বৈধতা ছিল না। জামায়াতের জন্য এটা খুবই দরকারি ছিল। এ জন্য বিএনপির একটা 'সার্টিফিকেট' যথেষ্ট ছিল না। প্রয়োজন ছিল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের একটা 'সার্টিফিকেট'। আওয়ামী লীগের সহযাত্রী হয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলনে নেমে জামায়াত আওয়ামী লীগের বন্ধুতা ও নৈকট্য পাবে এমন একটা হিসাব মনে মনে কষেছিল। সে জন্য বিএনপি থেকে মুখ

ফিরিয়ে নিতে জামায়াতের বাধেনি। ভোটের সমীকরণে আওয়ামী লীগও চেয়েছিল জামায়াত যেন বিএনপির সঙ্গ ছাড়ে। বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন পরস্পরবিরোধী এই দুটো রাজনৈতিক দলকে এক মেরুতে নিয়ে আসে, অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে। নৈতিকতা-বিবর্জিত এই সমীকরণ অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি। এমনকি যাঁরা সব সময় আওয়ামী লীগকে ভোট দেন, তাঁরাও আওয়ামী লীগের এই 'জামায়াত-তোষণ' কৌশল পছন্দ করেননি।

এ দেশের নতুন প্রজন্ম একাত্তরে জামায়াতে ইসলামীর চেহারা দেখেনি। গোলাম আযমকে তারা চেনে না। গোলাম আযমের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং এই প্রক্রিয়ায় তাঁর নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি রীতিমতো তারকাখ্যাতি পেয়ে গেলেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফের তির্যক মন্তব্য এখানে উল্লেখ না করলেই নয় :

> ১৯৭২ সালের সংবিধান তৈরি করেছিল আওয়ামী লীগই, আবার তা বাতিল-বর্জন করল আওয়ামী লীগই।...মুক্তিযুদ্ধের সেনানী ছিলেন জিয়াউর রহমান, আবার এ জিয়াউর রহমানই রাজাকার নিয়ে করলেন রাজত্ব, হলেন ইসলামপন্থী, ভারতবিদ্বেষী ও পাকিস্তানপ্রেমী। এরশাদ মুসলিমদের খুশি করার জন্য ইসলামকে করলেন নামত রাষ্ট্রধর্ম। যদিও তিনি নিজে ছিলেন পাপ-পুণ্যে আস্থাহীন লম্পট ও অর্থলিপ্সু-ধূর্ত অমানুষ।[৭২] ...ধর্মকে পুঁজি-পাথেয় করেই তারা অজ্ঞজনের ভোট জোগাড় করে অর্থের বিনিময়ে। তা ছাড়া জোর-জুলুম প্রয়োগ আছেই। গুন্ডা-মস্তান-খুনির ক্রয় করা সহায়তা তো পায়ই। ওই তিন রাজনীতিক শক্তির আঁতাত হয়েছে পৌর-ইউনিয়ন-উপজেলা নির্বাচনের উপলক্ষে। এ সময় ইসলামপন্থীদের প্রতি ঘৃণা-ভয়-অনাস্থা জনগণের মনে সঞ্চারিত করার লক্ষ্যেই আওয়ামী লীগ এমনই যুক্তিতে অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস্য স্থূল ঘটনা ঘটিয়েছে। সবটাই বানানো।...নইলে সেনা-গোয়েন্দা, পুলিশ-গোয়েন্দা ও স্থানীয় প্রশাসকদের অজ্ঞাতে একটা দল গড়ে উঠল কী করে! তালেবান বা হিজবুল্লাহর কথা তো যথাসময়েই শোনা গিয়েছিল।[৭৩]

১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে দেশে একটা অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি কেউ কোনো রকম ছাড় দিতে চায় না। কারণ, কেউ একটু ছাড় দিলেই প্রতিপক্ষ ধেই ধেই করে বলবে, 'আমরা জিতে গেছি, ওরা আত্মসমর্পণ করেছে।' এর মাঝে ৩১ অক্টোবর (১৯৯৪) দুই দলের দুই উপনেতার মধ্যে দেড় ঘণ্টার বৈঠক হলো। কিন্তু এসব বৈঠকে তো আর মীমাংসা হয় না। কেননা সিদ্ধান্ত নেন দলের সভানেত্রীরা।

এর মাঝে কমনওয়েলথের মহাসচিব চিফ এমেকা আনিওয়াকু দূতিয়ালির প্রস্তাব দিলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) মহাসচিবের মধ্যস্থতায় সংলাপে বসতে দুই নেত্রী রাজি হলেন। কয়েক দিন পরই খালেদা জিয়া উল্টো সুরে কথা বললেন। ১ অক্টোবর (১৯৯৪) মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর এক জনসভায় তিনি বললেন, 'বিরোধী দলের দাবি ও প্রস্তাব অসাংবিধানিক।'[৭৪] ২৬ জানুয়ারি (১৯৯৫) শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করার দাবি জানান।[৭৫]

২৭ এপ্রিল (১৯৯৫) বিচারপতি এ কে এম সাদেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হন। ২০ মে আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশন অফিস ঘেরাও করে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ দাবি করে। এদিকে জাতীয় পার্টির সঙ্গে বিএনপি পরোক্ষ সহযোগিতার হাত বাড়ায়। আসন্ন নির্বাচনকে নিয়ে দলের সমর্থন বাড়ানোই ছিল উদ্দেশ্য। ২৬ জুন (১৯৯৫) এরশাদ অস্ত্র মামলা থেকে খালাস পেয়ে যান।[৭৬]

১৯৯৫ সালের ২ জুন থেকে বিরোধী দলের ৩২ ঘণ্টার হরতাল শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রসচিব রবিন র‍্যাফেল ৪ জুন ঢাকায় আসেন। ৫ জুন তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন। ৭ জুন খালেদার সঙ্গে বৈঠক করে রবিন র‍্যাফেল বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করা আমেরিকার কাজ নয়।'[৭৭]

১৬ সেপ্টেম্বর বিরোধী জোটগুলো যুগপৎ ৭২ ঘণ্টার হরতাল ডাকে। শেখ হাসিনা ২৩ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোকে অনুরোধ করেন, তারা যেন বিএনপি সরকারকে কোনো রকম সাহায্য না দেয়। ২৫ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একটা মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগসহ প্রধান বিরোধী দলগুলো এই সভা বয়কট করে। ১৬ অক্টোবর বিরোধী দলগুলো ৯৬ ঘণ্টার যুগপৎ হরতাল আহ্বান করে। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্নর জেনারেল স্যার নিনিয়ান স্টেফান ঢাকায় আসেন অক্টোবরে। তাঁর সমঝোতার প্রয়াসও কাজে আসেনি। ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের উদ্যোগও ব্যর্থ হয়।[৭৮]

১৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া একটা কাণ্ড করে বসেন। তিনি রাজনীতিতে প্রায় পরিত্যক্ত জাসদের একাংশের সভাপতি শাজাহান সিরাজকে প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ১১ নভেম্বর বিরোধী দলের টানা ছয় দিনের হরতাল শুরু হয়। ৯ ডিসেম্বর আবার শুরু হয় টানা ৭২ ঘণ্টার হরতাল।[৭৯] এই ডামাডোলের মধ্যে বিএনপির সরকার ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে।

ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিরোধী তিন জোট ও জামায়াতে ইসলামীর অনেকেই প্রার্থী হয়েছিলেন। পরে নিজ নিজ দলের সিদ্ধান্তে তাঁরা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে

নেন। বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ এক প্রাক্-নির্বাচন জরিপে দেখায়, সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি না হলে আসন্ন নির্বাচনে ভোটদানের হার হবে ৭ শতাংশেরও কম।[৮০]

১৫ ফেব্রুয়ারির আগেই অনেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যান। এঁদের সংখ্যা ছিল ৪৪। এঁরা সবাই বিএনপির টিকিটে প্রার্থী হয়েছিলেন।[৮১]

১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আগাম প্রতিক্রিয়া জানায়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশে পুরোপুরি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মুখপাত্র গ্লিন ডেভিস বলেন, এটা ঠিক যে একদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণত সবার পূর্ণ অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে না।[৮২]

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬) বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ৪৮ ঘণ্টার লাগাতার হরতালের আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজপথ, রেলপথ ও নৌপথ অবরোধ করা হবে এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি হবে 'গণকারফিউ'।[৮৩]

১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সচিবালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক যৌথ সমাবেশে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগের দিন তাঁরা কিছু সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও করে রাখেন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে কর্মচারীরা কোনো দায়িত্ব পালন করবেন না বলে ঘোষণা দেন।[৮৪]

নির্বাচন নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ কে এম সাদেক নিজেই হতাশা প্রকাশ করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনে ১০ শতাংশের বেশি ভোটার ভোট দিতে যাবেন না বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।[৮৫]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে একটা প্রস্তাব তোলা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বৈধ হতে পারে না, কেননা প্রধান বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচন বর্জন করেছে।[৮৬]

বিবিসি টেলিভিশনের ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বাংলাদেশের নির্বাচনের ওপর একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করে। রিপোর্টে বলা হয়, নির্বাচনটি ছিল বিতর্কিত এবং বিরোধী দলের কর্মসূচির কারণে নির্বাচনের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ভোট দেওয়ার হার বড়জোর ১০ শতাংশ হবে। ঢাকা থেকে ডেভিড লয়েনের পাঠানো এই প্রতিবেদনে বলা হয়, বিএনপির কর্মীরা অনেক জালভোট দিয়েছেন; সরকারের পক্ষ থেকে ব্যালট বাক্স ভর্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডেভিড লয়েনের রিপোর্টে আরও বলা হয়, ভোটকেন্দ্রে

ভোটার উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে, ক্যামেরা দেখে দ্রুত লোক এনে লাইন ভরানো হয়েছে।[৮৭]

বিএনপি বা বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে একসময় যাঁদের দহরম-মহরম ছিল, পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ায় তাঁরা অনেকেই সুর বদলে ফেলেন। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এবং কাজী জাফর আহমদ ১৪ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, 'দেশবাসী বেগম খালেদা জিয়ার প্রহসনমূলক নীলনকশার নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।...অধিকাংশ প্রার্থীরা পলায়ন করিয়াছে। নির্বাচনের প্রতিবাদে সমগ্র দেশবাসী বিক্ষুব্ধ। এমতাবস্থায় এই নির্বাচনের কোনো বৈধতা নাই।...' আগামী কয়েক দিনের মধ্যে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার পতন সুনিশ্চিত করার জন্য তাঁরা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।[৮৮]

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত ফলাফল নিয়ে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির 'আইনগত বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা' না থাকার অভিযোগ এনে তা পুড়িয়ে দেন।[৮৯]

রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস রাজনৈতিক সংকট দূর করার লক্ষ্যে ১০ মার্চ (১৯৯৬) প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে বঙ্গভবনে আলোচনার আহ্বান জানান। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সব দলকে আলাদাভাবে বৈঠকের সময় ঠিক করে নেতাদের চিঠি দেওয়া হয়।[৯০] ১৩ মার্চ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রপতির চিঠির জবাব দেয়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াত অভিন্ন ভাষায় জানিয়ে দেয়, ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিল এবং সরকারের পদত্যাগ ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা-সম্পর্কিত কোনো আলোচনা সফল হবে না। গণফোরামের ড. কামাল হোসেন একটি চিঠিতে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে পরামর্শ নিতে হবে।[৯১]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার

সরকারের প্রশাসন ভেঙে পড়ছিল। 'প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ' ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিল করে অবিলম্বে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। ২৪ মার্চ তারা সচিবালয়ে একটা সাধারণ সভা করে এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায় আওয়ামী লীগ স্থাপিত 'জনতার মঞ্চ'-এ উপস্থিত হয়ে একাত্মতা প্রকাশ করে। সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সরকারের সচিব মহীউদ্দীন খান আলমগীর। একই দিন ২৮ জন অবসরপ্রাপ্ত সচিব, অতিরিক্ত

সচিব, যুগ্ম সচিব ও উপসচিব এক বিবৃতিতে '৭১ সালের মতো নিজেদের বিবেকের প্রতি সাড়া দিয়ে জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের জন্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান।[৯২]

২৫ মার্চ আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন ও কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌসী রহমান প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিতে অনুষ্ঠানে যাননি।[৯৩]

আন্দোলনের মুখে ভোটারবিহীন নির্বাচনে গঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে ২৬ মার্চ ১৯৯৬ গভীর রাতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা গৃহীত হয়।[৯৪]

সচিবালয়ে সর্বাত্মক অসহযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ২৭ মার্চ বিসিএস (পররাষ্ট্র) সমিতির সভাপতি ফারুক সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়ে সদলবলে বঙ্গভবনে দুপুরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন এবং অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানান।[৯৫]

অবশেষে দীর্ঘ ২৫ মাসের সরকারবিরোধী আন্দোলনের একটা সমাপ্তি ঘটল। ৩০ মার্চ (১৯৯৬) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানান এবং রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় সংসদ বাতিল করার পরামর্শ দেন। এরপর রাষ্ট্রপতি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরে যাওয়া প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।[৯৬]

৩০ মার্চ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জনগণের উদ্দেশে একটা ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন, গণতান্ত্রিক সমাজ, রাজনীতির চর্চা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কথা বলেন। তাঁর ভাষণের কিছু অংশ এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

> ...সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া এবং নিরাপদে যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করাই আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।...
>
> আওয়ামী লীগ প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। তাই, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে জনগণের প্রতি আমার আহ্বান, কোনো অবস্থাতেই আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার যেকোনো অপচেষ্টা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করা সকল নাগরিকের দায়িত্ব।[৯৭]

১১ এপ্রিল (১৯৯৬) প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ড. মুহাম্মদ ইউনূস, ড. মোহাম্মদ শামসুল হক, শেগুফতা বখত চৌধুরী, এ জেড এম নাসির উদ্দিন, মেজর জেনারেল (অব.) আবদুর রহমান খান, ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, ড. নাজমা চৌধুরী ও ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। ৮ এপ্রিল পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ আবু হেনাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ফয়জুর রাজ্জাককে নির্বাচন কমিশনের সচিব নিয়োগ করা হয়।[৯৮]

১১ এপ্রিল এক বিবৃতিতে মওদুদ আহমদ বলেন, বাংলাদেশকে জাতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করা, গঙ্গার পানি আনতে ব্যর্থতা, বরাক নদীতে বাঁধ নির্মাণে বাধা না দেওয়া এবং পুশইনের ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে যুক্ত ইশতেহারে সই দেওয়ার পর বেগম খালেদা জিয়ার জাতীয়তাবাদী শক্তির দাবিদার হওয়ার বক্তব্য মানায় না।[৯৯] মওদুদ একসময় এরশাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদাকে রাজনৈতিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিলেন। খালেদা না এরশাদ, কে বেশি 'জাতীয়তাবাদী' এ নিয়ে দুই দলের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছিল। মওদুদ আবারও প্রমাণ করলেন যখন যার নুন খান, তখন তিনি তার।

বেগম খালেদা জিয়াকে গোলাম আযমও আক্রমণ করতে কসুর করেননি। ৪ জুন (১৯৯৬) এক বক্তব্যে তিনি বলেন, 'স্বেচ্ছাচারিতা ও জেদের রাজনীতি দিয়ে দেশ চলে না। গত পাঁচ বছরে ক্ষমতাসীন নেত্রীর জেদের কারণে দেশে এত অশান্তি, হানাহানি ও হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদের অপচয় হয়েছে। এই পাঁচ বছরে তাদের দুর্নীতি, লুটপাট এবং অন্যায়ভাবে প্রশাসনকে ব্যবহারের বিচার জনগণ একদিন করবে।'[১০০]

বিরোধী দলে

১৯৯৬-এর নির্বাচন

দেশে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একে অন্যকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করে। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বিএনপির একটা বড় প্রচার হলো, আওয়ামী লীগ দেশের স্বার্থ এবং সার্বভৌমত্ব ভারতের কাছে জলাঞ্জলি দিয়েছে এবং বিএনপি হলো সাচ্চা দেশপ্রেমিকদের দল। নির্বাচন এলেই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিএনপির দেশ বিক্রির নালিশ বেড়ে যায়। ১৯৯৬ সালের ২৪ এপ্রিল *বাংলাবাজার পত্রিকায়* বিশেষ প্রতিনিধির বরাত দিয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর উত্তেজক কথাবার্তার প্রসঙ্গ টেনে প্রতিবেদনে বলা হয় :

> নির্বাচন এলেই দেশ বিক্রির অভিযোগ। এন্তার ষড়যন্ত্রের ছড়াছড়ি। বাকি সময় ষড়যন্ত্র নেই। দেশ বিক্রির অভিযোগও নেই। সব ঠিকঠাক। দুনিয়ার কোনো দেশের রাজনীতিকেরা নিজের দেশ সম্পর্কে এরকম কোনো মন্তব্য করেন জানা নেই। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আমাদের রাজনীতিকেরা কথায় কথায় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। স্বাধীনতা এতই ঠুনকো বিষয় একজন অভিযোগ করলেই অন্য একজন জবাব দিলেই স্বাধীনতা হরণ হয়ে যায়। যাঁরা ঢালাওভাবে জনগণের সামনে দেশ বিক্রির অভিযোগ করছেন তাঁদের জানা উচিত, একটি দেশ কখনো বিক্রি হয় না। বিক্রির অভিযোগ এনে তাঁরাই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হালকা করে দেখছেন।...
>
> মজার ব্যাপার হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো যতটা না নিজস্ব কর্মসূচিনির্ভর, তার চেয়ে বেশি দেশ বিক্রি, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে ব্যস্ত। জনগণের সামনে তাদের কোনো কর্মসূচি নেই।...
>
> দুদিন আগে যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি কী করে দেশ বিক্রির অভিযোগ আনছেন এটা বোধগম্য হচ্ছে না। নিছক ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যদি করে থাকেন তাহলে বলব, ভুল করছেন। জনগণ এ স্লোগানে আর ভুলবে না। এটা জানা থাকলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার উচিত জনসমক্ষে তা প্রকাশ

করা। জনগণ সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে।[১]

দেশ বেচাকেনার এসব প্রচারণা বেশ মুখরোচক ও কার্যকর। কেউ কেউ নাকি গোপন ফাইলে দেশ বিক্রির দলিলে সই করা কাগজও দেখেছেন। এ দেশে অনেকেই এসব কথা বিশ্বাস করেন। এঁদের বেশির ভাগই লেখাপড়া জানা উচ্চশিক্ষিত মানুষ। দেশটা তাঁদের কাছে বেচাকেনার পণ্য।

নির্বাচনী প্রচারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো এবং উসকানি দেওয়া নতুন কিছু নয়। লক্ষ্য একটাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ভোটারের ধর্মীয় অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দিয়ে তাঁদের মন জয় করা। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হবে, এটা বুঝেই বিএনপি আগে থেকেই পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা শুরু করেছিল। অর্থাৎ যেনতেনভাবে প্রমাণ করা যে আওয়ামী লীগ 'হিন্দু-ভারতের' তাঁবেদার এবং আওয়ামী লীগের শাসনামলে দেশে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়বে।

১২ মে (১৯৯৬) এনডিপি বিলুপ্ত করে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বিএনপিতে যোগ দেন। তিনি কড়া মেজাজের 'জাতীয়তাবাদী' হয়ে গেলেন। তিনি বললেন :

> যাঁরা মনে করছেন মায়ের বোনকে মাসি এবং পিতার বোনকে পিসি সম্বোধন করতে হবে, তাঁদের স্বপ্নকে চুরমার করে দিতে হবে। আমরা পানি খেতে চাই, জল খেতে চাই না। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদীরা গোসল করে, স্নান করে না।[২]

সালাউদ্দিন কাদেরের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত নিম্নরুচির এবং সাম্প্রদায়িক কদর্যতায় ভরা। কিন্তু বিএনপির নেতারা তাঁকে বেশ আদরের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। বিএনপির ১৭ জন সাবেক মন্ত্রী হেরে যান। বরিশালের একটি আসনে রাশেদ খান মেনন প্রার্থী ছিলেন। হেরে গিয়ে বলেন, 'এবারের নির্বাচনে প্রশাসন ছিল দলীয়-ভাবাপন্ন।' ১৪৬টি আসনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তারা শতকরা ৩৭ দশমিক ৪৪ ভাগ ভোট পায়। শতকরা ৩৩ দশমিক ৬০ ভাগ ভোট পেয়ে বিএনপি ১১৬টি আসনে জয়ী হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বিরোধী দলের প্রার্থী জয়লাভ করেন। জাতীয় পার্টি ও জাসদের (রব) সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। স্পিকার নির্বাচিত হন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের নির্বাচনী আঁতাত না থাকার কারণে জামায়াত মাত্র তিনটি আসন পায়, তবে তারা ভোট পায় শতকরা ৮ দশমিক ৬১ ভাগ। জাতীয় পার্টি

শতকরা ১৬ দশমিক ৪০ ভাগ ভোট পেয়ে সংসদে তৃতীয় স্থানে থাকে। তারা ৩২টি আসনে জয়ী হয়। এবারের নির্বাচনেও বেগম খালেদা জিয়া এবং হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পাঁচটি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিটিতেই জয়ী হন। এই নির্বাচনে বাম দলগুলোর ভরাডুবি হয়। সিপিবি, ন্যাপ (মোজাফফর), ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ (ইনু) ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল একটা আসনও পায়নি। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত একতা পার্টিকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একীভূত করে নৌকা প্রতীক নিয়ে একটি আসনে জয়ী হন। ঢাকার ধানমন্ডি আসনে আওয়ামী লীগের মকবুল হোসেন জয়ী হন এবং তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ড. কামাল হোসেন এবং সালমান এফ রহমান জামানত হারান। ২২ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তাঁর বিদায়ী ভাষণে রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধ করে বলেন :

> নতুন জাতীয় সংসদকে কেন্দ্র করে আপনারা এমন রাজনৈতিক রীতি-রেওয়াজ গড়ে তুলুন, যেন ভবিষ্যতে আর কোনো দিন রাজনৈতিক কোনো সমস্যা সমাধানে রাজপথের আশ্রয় নিতে না হয়, সন্ত্রাসী শক্তি পোষণ করতে না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিতে না হয়।[৩]

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে কোণঠাসা করার জন্য বিএনপি জাতীয় পার্টির সঙ্গে গোপনে আঁতাত করতে চেয়েছিল। এ জন্য বিএনপি এরশাদকে জেল থেকে প্যারোলে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের কাছে সুপারিশ করেছিল বলে জানা যায়। বিচারপতি হাবিবুর রহমান পরে বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন :

> ৪ জুন ১৯৯৬ ওকাবের সঙ্গে বৈঠকে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'পত্রিকায় আমরা দেখেছি যে জাতীয় পার্টির নেতাদের মনে হয়েছে এরশাদকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার প্রশ্নে রাষ্ট্রপতির মনোভাব নমনীয়। আবার একই সময় তাঁরা বলছেন, এ প্রশ্নে আপনার মনোভাব কঠোর। আপনি কি দয়া করে এ ব্যাপারে আপনার মনোভাব খোলাখুলি বলবেন?'
>
> আমি বলি, 'জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ আমার সঙ্গে চার-পাঁচবার দেখা করেছেন। বেগম রওশন এরশাদ...আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।'
>
> আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'দেখুন, আমি আপনার স্বামীকে দীর্ঘদিন ধরে চিনি। কিন্তু আমার হাত-পা আইনের বাঁধনে বাঁধা।'
>
> ঢাকা শহরের গুরুতর আলোচনার বিষয়বস্তু এই ছিল যে রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস এরশাদকে প্যারোলে বা অন্য কোনোভাবে মুক্তি দিচ্ছেন। জেনারেল এরশাদ একবার বেরিয়ে এলে তাঁকে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় বাধ্য বা একতাবদ্ধ করা যাবে। দরকার হলে জাতীয়তাবাদীরা জাতীয় পার্টির কোনো

একজনকে প্রধানমন্ত্রী বানাবে। এতে আর কিছু না হোক আওয়ামী লীগকে তো ঠেকানো যাবে। পরে এরশাদ বলেছেন, খালেদা জিয়া নাকি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন।

তখন নির্বাচন হয়ে গেছে। একদিন রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস আমাকে টেলিফোন করে বললেন, 'এরশাদ তো পাঁচ-পাঁচটা আসন থেকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন, সুতরাং তাঁকে আপনি প্যারোলে মুক্তি দিতে পারেন কি না?'

আমি বললাম, 'প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার তো কতগুলো নিয়মকানুন রয়েছে।... আপনার কথা আমি উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের সামনে তাঁদের বিবেচনার জন্য পেশ করব।'

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখার পরপরই বেগম খালেদা জিয়া টেলিফোন করে বললেন, 'আপনি রাষ্ট্রপতির কথা শোনেন না।'

আমি তাঁকে বললাম, 'রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার এখনই, মাত্র কয়েক মিনিট আগে কথা শেষ হলো। রাষ্ট্রপতির কথা আমি শুনব না কেন? তাঁর কথা সব সময় শুনি। তাঁর অনুরোধও আমরা বিবেচনা করে দেখি।'

বেগম খালেদা জিয়া হঠাৎ মেজাজ উঁচু করে বললেন, 'আপনি যদি এমন করেন, তাহলে পরে আপনাকে আমরা ঘরে থাকতে দেব না, দেশেও থাকতে দেব না।'[৪]

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়ার টেলিফোন সংলাপ থেকে মনে হয়, রাষ্ট্রপতি বিশ্বাসের সঙ্গে খালেদা জিয়ার সব সময় যোগাযোগ ছিল এবং খালেদা জিয়ার অনুরোধ বা নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অনেক কিছু বলতেন বা করতেন। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের মতো একজন দৃঢ়চেতা প্রধান উপদেষ্টা থাকার কারণে রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস কিংবা খালেদা জিয়া বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি।

১৯৯৬-এর নির্বাচনের ফলাফল বিএনপি মেনে নেবে কি না, এ নিয়ে সন্দেহ ছিল। ১৩ জুন বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকের সম্মানে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় কয়েকজন পশ্চিমা কূটনীতিক প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে বলেন, তাঁরা অনেক চেষ্টা করেও খালেদা জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। তাঁরা বিচারপতি রহমানকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, 'আমরা কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।' তখন সন্ধ্যা। বিচারপতি বললেন, 'এখন তো পানের সময়। আপনারা পরস্পরের সুস্বাস্থ্য পান করে নিজেরা নিজেদের পরামর্শ দিন।'[৫]

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান *প্রথম আলোয়* 'বিপুলা পৃথিবী' শিরোনামে স্মৃতিচারণামূলক একটা ধারাবাহিক রচনার ১২ সেপ্টেম্বর (২০০৮) সংখ্যায়

লিখেছিলেন, বিএনপি বড় রকম প্রতিবাদের পরিকল্পনা করেছিল—পরবর্তীকালে আমাকে তা জানিয়েছিলেন একজন হাইকমিশনার ও একজন রাষ্ট্রদূত। তাঁদের দুজনের ভাষ্য ছিল হুবহু এক। তাঁরা বলেন, তাঁরা খবর পেয়েছিলেন, সংবাদ সম্মেলন করে খালেদা জিয়া নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশে, বিশেষ করে রাজধানীতে, ব্যাপক গোলযোগের সৃষ্টি হবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি কোনো চরম ব্যবস্থা নিয়ে ফেলবেন। এই খবর জানার পরে ব্রিটিশ হাইকমিশনের অফিসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান ও কানাডার রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনাররা একসঙ্গে বসে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, খালেদা জিয়াকে এ ব্যাপারে নিবৃত্ত করতে হবে। ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে ফোনে খালেদা জিয়ার সঙ্গে ওই পাঁচজন দেখা করার জন্য সময় চান। খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়, তিনি খুব ব্যস্ত, পরদিন রাতে ছাড়া দেখা হবে না। অথচ পরদিন বিকেলেই খালেদার সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা। কোনো উপায় না দেখে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের একটা জরুরি বার্তা বেগম জিয়াকে পৌঁছাতে চান এবং তাঁর সঙ্গে আরও চারজন রাষ্ট্রদূত থাকবেন। শেষমেশ তাঁদের সময় দেওয়া হয়। এর পরের ঘটনা বেশ চমকপ্রদ। আনিসুজ্জামানের লেখায় জানা যায় :

> নির্ধারিত সময়ে ওঁরা পাঁচজন খালেদা জিয়ার সামনে উপস্থিত হলে তিনি বিরক্ত হয়ে বাংলায় বলেন, এরা কেন এসেছে? এরা কিছু জানে না, বোঝে না, শুধু মাতব্বরি করতে চায়। বেগম জিয়ার দোভাষী ইংরেজিতে বলেন, আপনারা আসায় ম্যাডাম অত্যন্ত খুশি হয়েছেন এবং তিনি আপনাদের আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছেন। জাপানি রাষ্ট্রদূত বাংলা জানতেন, ফরাসি রাষ্ট্রদূত জানতেন জাপানিজ। ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে জাপানি রাষ্ট্রদূত খালেদা জিয়ার মন্তব্য তখনই জাপানিজে অনুবাদ করে শোনান। অনেকক্ষণ ধরে এই পাঁচজন কূটনীতিক বেগম জিয়াকে নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অনুরোধ করেন, নইলে বাংলাদেশ নতুন করে সংকটে পড়বে বলেও তাঁরা সতর্ক করে দেন। বেগম জিয়া তাঁদের কথায় আনুষ্ঠানিক সম্মতি না জানালেও একসময় তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, তিনি নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করবেন না। তাঁরা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে আসেন।[৬]

জয়ী হলে 'নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে', আর হেরে গেলে 'কারচুপি হয়েছে'—এ ধরনের গৎবাঁধা কথা রাজনৈতিক দলগুলোর মুখে মুখেই থাকে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অবশ্য বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই পরিস্থিতি সামাল দেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর একটি অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন :

১৫ জুন ১৯৯৬ বাংলাদেশে নিযুক্ত সাতটি দেশের হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতদের এক প্রতিনিধিদল আমার সঙ্গে সন্ধ্যা ছয়টায় সাক্ষাৎ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন মেরিল, যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার পিটার জে ফাউলার, অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার কেনেথ এন অ্যামপিন্যাল, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল ড্র্যারি, ইতালির রাষ্ট্রদূত রাফায়েল মিনিথেরো, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত বিয়র্ন আই স্টানবি এবং হল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রবার্ট এ ফোরনিসি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান নির্বাচনের ফলাফল মানবেন কি না তা নিয়ে তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন।... আমি নিজে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করিনি বা কোনো কূটনৈতিক সাহায্য, মধ্যস্থতা বা সমর্থন কামনা করিনি।[৭]

নির্বাচনের ফলাফলে বিএনপির নেতারা স্পষ্টতই নাখোশ হয়েছিলেন। দলের মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদার তাঁর পদ থেকে অপসারিত হন। নতুন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া মন্তব্য করেছিলেন :

এই নির্বাচন একটা কারচুপির নির্বাচন। চক্রান্তকারীদের নীলনকশা অনুযায়ী সেই নির্বাচনে চূড়ান্ত জালিয়াতি হয়েছে।...এটা ছিল একটা পুকুরচুরি। এই কাজ প্রকাশ্য রিগিংয়ের চেয়েও ভয়ংকর ছিল। দুটি অপরাধ একসঙ্গে ঘটেছে। নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, আবার সেই নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ বলে চালানো হয়েছে।[৮]

২২ জুন এক সংবাদ সম্মেলনে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, 'কারচুপি নয়, বলতে পারেন পুকুরচুরি হয়েছে।'[৯]

সরকারে আওয়ামী লীগ

২ জুলাই (১৯৯৬) আওয়ামী লীগ ঘোষণা করল, বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট সরকারি ছুটি থাকবে। ২০ জুলাই বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়। ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।

স্পিকারের 'পক্ষপাতমূলক আচরণের' প্রতিবাদে বিএনপির সদস্যরা ১১ নভেম্বর (১৯৯৬) সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন। ওই দিন সংসদের আলোচ্যসূচিতে কুখ্যাত 'ইনডেমনিটি' বিল বাতিলের প্রস্তাব ছিল।[১০] এই ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে বিএনপি সম্ভবত বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল, তারা এই আইনটির বাতিল চায় না। এর অর্থ দাঁড়ায়, ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না, এই অবস্থানটি বিএনপি বজায় রাখল।

এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। সরকারে আসায় আওয়ামী লীগের

বিএনপির মহিলা দলের নেত্রী মনি বেগমের ওপর পুলিশি বর্বরতা।

নেতা-কর্মীরা তখন বেশ বেপরোয়া। পুলিশ বাহিনীকেও তখন আওয়ামী লীগ থেকে আলাদা করা যাচ্ছিল না। বিজয়নগরে বিএনপির মহিলা দলের একটা মিছিলে পুলিশ হামলা করে। মহিলা দলের নেত্রী মনি বেগমের শাড়ি নিয়ে পুলিশ টানাটানি করে। ব্যাপারটা শুধু লজ্জার নয়, একেবারেই অসভ্যতার চূড়ান্ত। পরদিন গণমাধ্যমে এই ছবি ছাপা হয়েছিল। এ জন্য আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকে অনুতাপ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে আওয়ামী লীগ তখন প্রায় দিশেহারা। বিএনপির চারজন নেতা—খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আবদুল মান্নান, সাদেক হোসেন খোকা ও মির্জা আব্বাসকে গ্রেপ্তার করা হলো। তাঁরা হাইকোর্টে রিট করলে ৭ এপ্রিল (১৯৯৭) কোর্ট এই চার নেতাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক রাখার আদেশ অবৈধ ঘোষণা করে সরকারের প্রতি প্রত্যেককে এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেন।

সংসদ থেকে বিরোধী দলের নিয়মিত ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন আবার শুরু হলো। একই সঙ্গে চালু হলো যখন-তখন হরতাল ডাকা।

৩১ আগস্ট (১৯৯৭) ডিগবাজির রাজনীতির আরেকটি উদাহরণ দেখা গেল। জাসদ (ইনু), জাসদ (রব) ও বাসদ (মাহবুব)-এর একাংশ আবার একসঙ্গে মিলে গেল। রূপান্তরিত জাসদের সভাপতি হলেন আ স ম আবদুর রব এবং সাধারণ

পুলিশি নির্যাতনের শিকার বিএনপির নেতা সাদেক হোসেন খোকা। আলোকচিত্র : জিয়া ইসলাম

সম্পাদক হলেন হাসানুল হক ইনু। এতে উভয়েরই লাভ হলো। রব সাংসদ ও 'ঐকমত্যে'র সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু বড় নেতা হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর দল বলতে হাতে গোনা কয়েকজন লোক। অন্যদিকে ইনু অপেক্ষাকৃত বড় জাসদের ছোট নেতা। তাঁর সাধ জাগল সরকারের অংশ হতে। রবের সঙ্গে একীভূত হওয়ার ফলে পুরো জাসদই এখন 'ঐকমত্যে'র সরকারের শরিক হলো। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আহমদ শরীফের মন্তব্য বেশ চমকপ্রদ :

> যে জাসদ এরশাদের, আওয়ামী লীগের সেবা করে, সে জাসদের (রব) নীতি-আদর্শ-চরিত্র অবশ্যই নিন্দিত-গণধিকৃত, নন্দিত নয়। আবার তার সঙ্গে যে জাসদ (ইনু) ঐক্যবদ্ধ হয়, তারই বা নীতি-আদর্শ-চরিত্র আমজনতার কাছে আকর্ষণীয় হবে কেন? হতেই পারে না।...আজকের আনোয়ার জাহিদ, কাজী জাফর, মওদুদ, ওবায়দুর রহমান প্রভৃতি সুবিধেবাদী, সুযোগসন্ধানী, ডিগবাজিপ্রবণ, গণ-ঘৃণ্যরা আজও রাজনীতির অঙ্গন কলুষিত করে, বিরাজ করে দূষিত পরিবেশে। রব-ইনু সম্ভবত আওয়ামী লীগের শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হবেন। অবশ্য মানুষ হচ্ছে কষিত কাঞ্চন। তার অপকর্ম-অপরাধপ্রবণতা দোষ-ত্রুটি সংশোধিত হতে পারে। কবি কালিদাস রায় বলেন :
>
> এমনি হরির অহেতু করুণা প্রেমের এমনি যাদু
> কয়লা হৃদয় গলি হীরা হয়, তস্কর হয় সাধু।[১১]

এর মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। ২ ডিসেম্বর (১৯৯৭) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের একটি শান্তিচুক্তি সই হয়। এ চুক্তির প্রতিবাদে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা ২১ ডিসেম্বর সংসদ ভবনে কালো ব্যাজ পরে আসেন। তাঁরা কালো পতাকা নিয়ে মিছিল করে রাষ্ট্রপতির কাছে একটা স্মারকলিপি দেন।[১২]

৩ মে (১৯৯৮) সংসদে পার্বত্য জেলা পরিষদের তিনটি বিল উত্থাপিত হলে এই বিল ঠেকানোর জন্য বিএনপির সংসদ সদস্যরা ১৪৫৫টি সংশোধনী প্রস্তাব জমা দেন। এগুলো আলোচনা করা ছিল একটা অসম্ভব ব্যাপার। স্পিকার বিএনপির আটজন এবং জাতীয় পার্টির তিনজনকে বিলটির ওপর আলোচনার সুযোগ দেন। এর প্রতিবাদে বিএনপির সদস্যরা ওয়াকআউট করেন।[১৩] খালেদা জিয়া সংসদে বলেন, 'বিতর্কিত বিল পাস হলে পার্বত্যাঞ্চলে আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।' ৪ মে তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিল সই করবেন না।' জবাবে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'সবকিছু হবে সাংবিধানিকভাবে।' ৬ মে সংসদে বিএনপির অনুপস্থিতিতে ও জাতীয় পার্টির বিরোধিতার মুখে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিল পাস হয়। এই বিল পাস হওয়ার পর বিএনপির সদস্যরা আর ওই অধিবেশন চলাকালে সংসদে ফিরে যাননি। বিল পাসের প্রতিক্রিয়ায় খালেদা জিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হলে দেশ লেবানন-শ্রীলঙ্কার মতো গৃহযুদ্ধের দিকে যেতে পারে।'[১৪]

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সম্পর্ক দিন দিনই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এর সঙ্গে জাতীয় পার্টিও যোগ দিল। জাতীয় পার্টি সরকার গঠনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছিল। এর ফলে কারাবন্দী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ একটার পর একটা মামলায় আদালত থেকে জামিন পেতে থাকেন এবং ৯ জানুয়ারি (১৯৯৭) জেল থেকে ছাড়া পান। জাতীয় পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু তখন 'ঐকমত্যের' সরকারের মন্ত্রী। এরশাদ তাঁকে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে বলেন। মঞ্জু এরশাদের কথা শোনেননি। ২৯ জুন (১৯৯৮) সংসদে এরশাদ ঘোষণা দেন, 'আমরা বিরোধী দল, সরকারের অংশীদার নই।' এরশাদকে 'কাফকো' সম্পর্কে ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দেওয়ার সুযোগ না দেওয়ায় সংসদ থেকে জাতীয় পার্টির সদস্যরা ওয়াকআউট করেন। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ওয়াকআউটে যোগ দেননি। ফলে জাতীয় পার্টি ভেঙে গেল। মঞ্জু কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আলাদা জাতীয় পার্টি বানিয়ে মন্ত্রিত্ব বহাল রাখলেন।

১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি সংসদ বর্জনের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্তের জন্য বিএনপি-দলীয় সদস্যদের পদত্যাগপত্র জমা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পদত্যাগ নাটকের শুরু হয় ১৩ জুলাই। বিএনপিতে নবাগত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীসহ ৩০ জন সংসদ সদস্য বেগম জিয়ার কাছে গোপনে তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দেন। দলের চারজন শীর্ষ নেতা—অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সাইফুর রহমান, অলি আহমদ এবং কে এম ওবায়দুর রহমান ১৫ জুলাই বেগম জিয়ার সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগের বিরোধিতা করেন। ১৬ জুলাই দলের স্থায়ী কমিটির সভায় এ ব্যাপারে চার নেতা সোচ্চার ছিলেন। এ নিয়ে মাস তিনেক দলে তোলপাড় চলে। শেষমেশ অবশ্য তাঁরা 'চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত' মেনে নেন।[১৫]

এদিকে নেতা-নেত্রীরা লাগামহীন কথাবার্তা বলা শুরু করলেন। ২৯ জুলাই (১৯৯৮) পল্টনে এক জনসভায় খালেদা জিয়া বললেন, 'আগামী দিনেও '৭৫-এর মতো অবস্থা হবে। '৭৫-এ যেমন কেউ চোখের পানি ফেলেনি, ইন্নালিল্লাহ পড়েনি, জনগণ বলেছিল নাজাত পেয়েছি, আবারও তা-ই হবে।'[১৬] ৮ ডিসেম্বর (২০০০) খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায় অতিথি বক্তা সাংবাদিক নেতা গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন, 'জিয়াউর রহমান চাননি স্বাধীন বাংলাদেশে একজন মুসলমানের পরাজয়ের চিহ্ন থাকুক। সে জন্য নিয়াজি যেখানে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সেখানে শিশু পার্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।'[১৭]

১৯৯৯ সালের ৬ জানুয়ারি বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) এবং ইসলামী ঐক্যজোট চারদলীয় জোট তৈরি করে।[১৮] জোট তৈরি করার পর বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, জামায়াতে ইসলামীর আমির গোলাম আযম এবং ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস আজিজুল হক এক যৌথ ঘোষণায় সই দেন এবং প্রত্যেকেই আলাদাভাবে সংবাদ সম্মেলন করেন। তাঁদের চারটি দাবি ছিল : প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সব রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগসহ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, পৌরসভাসহ সব সিটি করপোরেশনের ভোটারদের আইডি কার্ড দেওয়া এবং জেলে আটক বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আনা সব 'মিথ্যা মামলা' প্রত্যাহার ও গ্রেপ্তার-হয়রানি বন্ধ করা।[১৯]

সংবাদ সম্মেলন শেষে একটা যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। চার নেতার সই দেওয়া চার পৃষ্ঠার এই ঘোষণায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে সরকারের পতনের কথা বলা হয়। ঘোষণায় ভবিষ্যৎ সরকারের দায়িত্ব হিসেবে ২৪টি বিষয় নির্ধারণ করা হয়। এই বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' বাতিল, রেডিও-টিভির

স্বায়ত্তশাসন, সংবিধানের মূলনীতিবিরোধী সব আইন সংশোধন ইত্যাদি। তাঁরা নিজেদের 'জাতীয়তাবাদী ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক শক্তি' হিসেবে পরিচয় দেন।[২০]

আওয়ামী লীগ এরশাদকে চারদলীয় জোট থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকে। তাঁর বিরুদ্ধে তখনো বেশ কয়েকটা মামলা ছিল। এরশাদ আর জেলে ফিরে যেতে চাইছিলেন না। শেখ হাসিনা এরশাদকে লক্ষ করে বলেন, 'এরশাদ রাজপথে থাকবেন না রাজঘরে (জেলে) তা নির্ভর করবে এরশাদের ওপর নয়, তাঁর (শেখ হাসিনা) ওপর।' এই কথাতেই কাজ হলো। এরশাদ ২০০১ সালের প্রথম দিকে চারদলীয় জোট থেকে বেরিয়ে এলেন। জাতীয় পার্টিতে ছোটখাটো একটা ভাঙন ধরল। মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জুর নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির একটা ভগ্নাংশ চারদলীয় জোটে থেকে গেল।[২১]

বিএনপিতে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছেন। দলে স্বাধীনতাবিরোধী অনেক লোকেরও সমাবেশ ঘটেছে। এ নিয়ে দলের মধ্যে নানা প্রশ্ন ছিল। এ বিষয়ে দলের অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা কর্নেল (অব.) অলি আহমদের ক্ষোভ ছিল। ৩০ এপ্রিল ১৯৯৯ দৈনিক *মাতৃভূমি*তে ছাপা এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> ১৯৭১ সালে রাজাকাররা পাকিস্তানের দালালি ছিল। এ দেশের মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠনের ব্যাপারে পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করেছে। রাজাকারদের হাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু নিরীহ জনগণ, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, রাজনীতিক খুন হয়েছেন।...তাই ওই সময় এ ধরনের ঘৃণিত ব্যক্তিদের সামনে পেলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দিতাম না। একবার যে বেইমানি করে বা দালালি করে সে সারা জীবনই বেইমানি ও দালালি করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।...মাতৃভূমির সঙ্গে যারা বেইমানি করেছে তাদের বিরুদ্ধে হয়তো এখন আমি কোনো ব্যবস্থা নিতে না পারি তবে এখন তাদের সঙ্গে প্রেমপ্রীতিতে আবদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ নেই।...বিভিন্ন দলে রাজাকাররা আত্মগোপন করে আছে দেশের জন্য বা দলের জন্য নয়—রাজাকাররা নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলে আশ্রয় নিয়ে গণতন্ত্রপরিপন্থী কাজে লিপ্ত হয়। কারণ এ দেশে সঠিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে রাজাকারদের অনেককে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হতো, যা হয়েছে জার্মানিতে এবং এখনো হচ্ছে।[২২]

অকার্যকর সংসদ

সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকেই সরকারি আর বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে কটু কথা চালাচালি ও বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। ১৪ জুলাই (১৯৯৬) শেখ হাসিনার ঐকমত্যের সরকারের মন্ত্রী জাসদের সভাপতি আ স ম আবদুর রব

বিরোধী দলের সদস্যদের দিকে বুড়ো আঙুল তুলে কিছু মন্তব্য করলে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই 'অভদ্র' আচরণের প্রতিবাদ জানানো হয়। তাঁরা রবকে মাপ চাইতে বলেন। স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১৮ জুলাই এ বিষয়ে রুলিং দেবেন বলে জানান। স্পিকার অবশ্য 'বুড়ো আঙুল' বিষয়টি প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠিয়ে দেন। ৫ আগস্ট বিরোধী দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়া কথা বলার সময় একপর্যায়ে সরকারি দলের সদস্যদের উদ্দেশ করে 'বেয়াদব' শব্দটি উচ্চারণ করেন। এতে সরকারি দলের সদস্যদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। সংসদ অধিবেশনে হট্টগোল চলে। স্পিকার সবাইকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, সংসদকক্ষ ঝগড়া করার জায়গা নয়, তাঁর (বেগম জিয়া) মুখে 'বেয়াদব' শব্দটি অনাকাঙ্ক্ষিত।[২৩]

২৫ আগস্ট সংসদ অধিবেশন চলাকালে আরেকটি ঘটনা ঘটে। বিএনপির সদস্য মোর্শেদ খানের বক্তব্যের পর স্পিকার আওয়ামী লীগের আবুল কালাম আজাদকে ফ্লোর দেন। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে কারও নাম উল্লেখ না করে আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'আমাকে একজন দুই নম্বরি (অসৎ) লোকের পর বলতে দেওয়া হলো, যিনি এর আগে জিয়া ও এরশাদের জুতা চেটেছেন, এখন তিনি খালেদা জিয়ার জুতা চাটছেন। একসময় তিনি মুজিব কোট পরে ঘুরে বেড়াতেন।'[২৪] এ কথার পর বিএনপির সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়ে স্পিকারকে এসব কথা 'এক্সপাঞ্জ' করতে অনুরোধ করেন। স্পিকার বলেন, যেহেতু সদস্য কারও নাম বলেননি, কার্যবিধির ২৭৪ ধারা এখানে প্রযোজ্য হবে না। বিএনপির আবু ইউসুফ মো. খলিলুর রহমান দাঁড়িয়ে স্পিকারকে উদ্দেশ করে বলেন, 'তারা আমাদের সদস্যদের জড়িয়ে কটু ও নোংরা কথা বলছে, কিন্তু আপনি আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে সংসদীয় রীতি ভেঙেছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এটা আপনার একপেশে আচরণ।' স্পিকার রেগে গিয়ে বলেন, 'আপনি যদি আবারও চেয়ারের (স্পিকারের) দিকে ইঙ্গিত করে কোনো বাঁকা কথা বলেন, আমি আপনাকে কথা বলার অনুমতি দেব না।' এ সময় বিএনপির মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান আবু ইউসুফের হাত থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে স্পিকারকে উদ্দেশ করে কিছু অশোভন উক্তি করেন।[২৫]

আখতারুজ্জামানের কথার পর সংসদকক্ষে হইচই শুরু হয়ে যায়। স্পিকার রুলিং দিয়ে বলেন, কারও হাত থেকে মাইক কেড়ে নেওয়া অভদ্রতা। এরকম একটা খারাপ নজির তৈরির জন্য তিনি আখতারুজ্জামানকে দায়ী করেন এবং তাঁর কথাগুলো না ছাপার জন্য গণমাধ্যমকে অনুরোধ জানান।[২৬]

১৯৯৮ সালের ১৫ এপ্রিল সংসদ অধিবেশন চলাকালে চরম গন্ডগোল হয়। কথা বলার সুযোগ না পেয়ে একপর্যায়ে বিএনপি-দলীয় কয়েকজন সদস্য

স্পিকারের দিকে ছুটে যান। তাঁরা ফাইল ও অন্যান্য কাগজপত্র ছুড়ে মারেন। তাঁরা একটা টিভি ক্যামেরা ভেঙে ফেলেন এবং সংসদের রিপোর্টিং ডেস্ক তছনছ করে দেন। ঘটনাটি ছিল নজিরবিহীন। একটি জাতীয় দৈনিকে এমন খবরও ছাপা হয়েছিল যে বিরোধী দলের একজন সদস্য জুতা ছুড়ে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই ঘটনায় দেখা গেছে, বিরোধী দলের উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী স্বয়ং নেতৃত্ব দেন। স্পিকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সার্জেন্ট-অ্যাট-আর্মসকে তৈরি থাকতে বলেন। দশ মিনিট ধরে এই অরাজক অবস্থা ছিল।[২৭]

স্পিকার বিএনপির ১৪ জন সংসদ সদস্যের নাম উল্লেখ করে বলেন, এঁদের বিরুদ্ধে কার্যবিধির ১৫ ও ১৬ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সদস্যরা হলেন : বিরোধী দলের উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সাবেক স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী, বিরোধী দলের চিফ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন, আলমগীর কবির, রুহুল কুদ্দুস দুলু, আবুল কালাম আজাদ, আমানুল্লাহ আমান, এহছানুল হক মিলন, কাজী শাহজাহান, মশিউর রহমান, জিয়াউল হক জিয়া, ফজলুর রহমান পটল এবং কে এম ওবায়দুর রহমান। বিরোধী দলের নেতা খালেদা জিয়া মন্তব্য করেন, স্পিকারের দলীয় পক্ষপাতের কারণেই সংসদ সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 'স্পিকার চান না দুঃশাসন, জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাওয়া, নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে আমরা কথা বলি।'[২৮]

সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বিএনপির সদস্যদের আচরণের কঠোর নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'এসব কাজ তাদের জন্য নতুন নয়। পারলে তারা আপনাকে (স্পিকারকে) খুন করে ফেলত। খুন করা তাদের অভ্যাস।' হাসিনা বিরোধী দলকে 'অগণতান্ত্রিক শক্তি' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বিএনপি সংসদকে অপমান করেছে।[২৯] এক মন্তব্য প্রতিবেদনে *ডেইলি স্টার*-এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন :

> স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সংসদে যা করেছেন, তা নিয়মের মধ্যে পড়ে না।...আমরা মনে করি বিএনপি তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে সংসদ, নির্বাচিত সদস্য, গণতন্ত্র, এমনকি নিজেদেরও লজ্জায় ডুবিয়েছে। এটা রীতিমতো গুন্ডামি।...স্পিকারের দিকে ছুটে যাওয়া, কাগজের গোলা ছুড়ে মারা, গালাগাল দেওয়া নিতান্তই অশোভন এবং তা সংসদীয় ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করেছে।[৩০]

স্পিকার ১৯ এপ্রিল এ বিষয়ে তাঁর রুলিং দেন। তিনি বলেন, এটা সংসদীয় ইতিহাসে একটা খারাপ নজির তৈরি করেছে এবং সংসদের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে। তিনি বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে পাঠান। ১২ মে

আরেকটি রুলিংয়ে স্পিকার ওই ঘটনার জন্য সরাসরি জড়িত সংসদ সদস্যদের দায়ী করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন।[৩১]

১৯৯৯ সালের ৯ নভেম্বর সংসদের অধিবেশনে সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের নেতা শেখ হাসিনা কিছু 'আপত্তিকর' মন্তব্য করেন। বিরোধী দলের ডাকা হরতালের সমালোচনা করে তিনি বলেন :

> হরতালের ফলে ছাত্রদের ক্ষতি হচ্ছে। বিরোধী দলের নেতা নিজে লেখাপড়া করেননি, জাতি শিক্ষিত হোক তিনি চান না। নিজে পরীক্ষায় ফেল করেছেন বলে অন্যদের পরীক্ষায় বসতে দিতে চান না। রাজনীতির সম্মানটা তিনি কোথায় টেনে নামিয়েছেন? ঢাকা শহরে নিজের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি হোটেলে রাত কাটান। পূর্বাণী হোটেলে দরজা বন্ধ অবস্থায় একটা কামরায় তাঁকে পাওয়া গেছে। কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহবধূ কি হোটেলে রাত কাটায়? কেন তিনি সেখানে ছিলেন? কী অবস্থায় ছিলেন তিনি—এটা তাঁর চেয়ে এরশাদ ভালো জানে।[৩২]

বিএনপির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। দলের এক জরুরি সভায় এ বিষয়ে মন্তব্য করে বলা হয়, এ ধরনের অশোভন কথা বলার পর শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন। সাংবাদিক সোহরাব হাসান এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, বিরোধী দলের নেতা খালেদা জিয়াকে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও গালাগাল দেওয়া রাজনৈতিক শিষ্টাচারের বাইরে। খালেদা জিয়া সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা শুধু অশোভন নয়, রীতিমতো অসভ্যতা। এ ধরনের কথা দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোভা পায় না।[৩৩]

সংসদে দুই দলের দুই প্রয়াত নেতাকে নিয়ে প্রায়ই অশোভন মন্তব্য করা হতো। একবার আওয়ামী লীগের একজন সদস্য বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলেন। জবাবে বিএনপির একজন সদস্য শেখ মুজিবকে 'ফেরআউনের' সঙ্গে তুলনা করেন।[৩৪] সংসদে এ ধরনের বচসা এবং খিস্তিখেউড় হতো প্রায়ই। এ প্রসঙ্গে মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্য থেকে একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, যেখানে বাংলাদেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক নেতার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কটির ছায়া দেখা যায়।

> কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
> কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥[৩৫]

রাজনৈতিক দলগুলো কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, সহ্যও করে না। সবাই মিলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিতে রাজি হলেও নির্বাচনের ফলাফল পক্ষে না এলে সেই নির্বাচনকে তারা গ্রহণযোগ্য মনে করে না। এভাবেই জোড়াতালি দিয়ে চলছিল গণতন্ত্রের গাড়ি। সংসদ কার্যকর ছিল

না। যখন-তখন ওয়াকআউট, সংসদ বর্জন, গালাগাল, ফাইল ছুড়ে মারা ইত্যাদি নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। স্পিকার ডান দিকে বেশি তাকান না বাম দিকে বেশি, এ নিয়ে তর্ক চলতেই থাকে। বিরোধী দলের আসন ছিল স্পিকারের বাঁ দিকে।

সাংবাদিক অজয় দাসগুপ্তের একটা বিশ্লেষণী লেখা থেকে দেখা যায়, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত হরতাল হয়েছে মোট ৫৯ দিন। তার পরই হরতালের সংখ্যা বাড়তে থাকে জ্যামিতিক হারে। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে (১৯৮২-৮৯) ৩২৮ দিন হরতাল হয়। 'গণতান্ত্রিক' সরকারের প্রথম পর্বে (১৯৯১-৯৬) হরতাল হয় ৪১৬ দিন। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯—এই কয়েক বছরে ২৪৪ দিন হরতাল হয়।[৩৬] মনে হয়, হরতাল এ দেশের রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, ১৯৯১-৯৪ সালে বছরে গড়ে ৭২ দিন হরতাল হয়েছে। সংখ্যাটি বেড়ে ১৯৯৫-৯৮ সালে হয় বছরে গড়ে ৯৩ দিন। ১৯৯৯-২০০০ সালে বছরে গড়ে ১০০ দিনের বেশি হরতাল হয়েছিল।[৩৭]

মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে একসময় অনেকগুলো লেন ছিল। ১৯৮০ সালে সব ভেঙে এটাকে সমান করে ফেলা হয়েছিল। সব গাছও কেটে ফেলা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, এখানে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ হবে। আওয়ামী লীগ সরকার আবার বেশ চওড়া করে সেখানে ডিভাইডার তৈরি করে এবং মাঝখানে অনেক গাছ লাগায়। বিএনপি ধরে নেয়, এর ফলে জনসভা করার একটা উপযুক্ত জায়গা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হলো। মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ডিভাইডার তৈরির প্রতিবাদে বিএনপি হরতাল ডেকেছিল।

জাতীয় সংসদ কার্যকর না হওয়ার আরেকটি কারণ হলো সংসদে বিরোধী দলের পর্যাপ্ত উপস্থিতি না থাকা। তাঁরা সংসদ ভবনে যান, পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় যোগ দেন, ডাইনিং রুমে নিয়মিত খানাপিনা করেন, বেতন-ভাতা তোলেন সময়মতো, কিন্তু সংসদের ভেতরে ঢুকে আসল কাজটা করেন না।

হিসাব করে দেখা গেছে, পঞ্চম সংসদে (১৯৯১-৯৬) সংসদ অধিবেশন বসেছিল মোট ২৯৫ দিন। সংসদ নেতা (খালেদা জিয়া) উপস্থিত ছিলেন ২৫৬ দিন এবং বিরোধী দলের নেতা (শেখ হাসিনা) উপস্থিত ছিলেন ১১৯ দিন। বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের আগ্রহটা দিন দিন বাড়তে থাকে। সপ্তম সংসদে (১৯৯৬-২০০১) অধিবেশন বসেছে মোট ৩৮৩ দিন। সংসদ নেতা শেখ হাসিনা ২৯৮ দিন (৭৮ শতাংশ) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া হাজির হন মাত্র ২৮ দিন (৭ শতাংশ)।[৩৮] জাতীয় সংসদের আইনে একাধারে ৯০ কার্যদিবস সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাওয়ার বিধান আছে। দেখা গেছে, বিরোধী দলের অনেক সাংসদ

৯০ দিন পার হওয়ার দু-এক দিন আগে কয়েক মিনিটের জন্য সংসদ অধিবেশনে হাজির হয়ে তাঁদের সদস্যপদ টিকিয়ে রাখতেন। এ ছাড়া সংসদ অধিবেশন বর্জন তো চলছিলই। পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলের (আওয়ামী লীগসহ) সদস্যরা ১৩৫ দিন (৩৪ শতাংশ) সংসদে যাননি। বিএনপিও কম যায় না। সপ্তম সংসদে বিরোধী দলের সদস্যরা (বিএনপিসহ) ১৬৩ দিন (৪৩ শতাংশ) সংসদ অধিবেশন বর্জন করেন।[৩৯]

সন্ত্রাস

জনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছিল। দলের প্রধান নেতার প্রতি শর্তহীন আনুগত্য, সংগঠনে নিয়ম-নীতির কোনো বালাই না থাকা, সহযোগী ছাত্রসংগঠনের সদস্যদের মাত্রাহীন যথেচ্ছাচার—সব মিলিয়ে রাজনীতির একটা অশুভ পরিচিতি দাঁড়িয়ে গেল। সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের আনুকূল্য না পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে সিট পাওয়া যায় না। এমনকি বিরোধীদলীয় ছাত্র নেতা-কর্মীরা ছাত্রাবাসে ঢুকতেই পারেন না। ২০০১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বললেন, 'রাজনৈতিক দল

বিএনপির মিছিলে আওয়ামী লীগের সাংসদ ডা. এইচ বি এম ইকবালের নেতৃত্বে সশস্ত্র ক্যাডারদের হামলা

থেকে ছাত্রসংগঠন বিচ্ছিন্ন হলে সন্ত্রাস থাকবে না।'[৪০]

১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ আয়োজিত এক সেমিনারে বলা হয়, 'দেশে ৮০টি সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট কাজ করছে। এর মধ্যে ২৮টিই রাজধানীতে। ঢাকা শহরে ৫০ হাজারসহ সারা দেশে প্রায় দুই লাখ অবৈধ অস্ত্র আছে।'[৪১] কথাটা মিথ্যা নয়। সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যেত, রাজপথে রাজনৈতিক দলের ক্যাডাররা অস্ত্র হাতে বিরোধীদের তাড়া করছে। অস্ত্র উঁচিয়ে বিরোধীদের দিকে তাক করা সাংসদের ছবিও ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। সংগঠনগুলোতে নিয়মকানুনের ধার ধারত না কেউ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কোনো গঠনতন্ত্র ছিল না। দলের সভাপতি নাসির উদ্দিন পিন্টু এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) যা বলবেন, সেটাই আমাদের গঠনতন্ত্র।'[৪২] ছাত্রসংগঠনগুলোর ভূমিকা ছিল অনেকটা জমিদার-জোতদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর মতো। ১১ দলীয় বাম জোটের এক সমাবেশে ৩১ মার্চ (২০০১) বাসদের এক অংশের আহ্বায়ক আ ফ ম মাহবুবুল হক সাবেক ও বর্তমান ক্ষমতাসীন দলগুলোর চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ভিন্ন ভিন্ন নাম, একই কাম। ক্ষমতায় যাও, লুটেপুটে খাও।'[৪৩] এর মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) একটা বোমা ফাটাল। তাদের বৈশ্বিক প্রতিবেদনে দেখানো হলো, বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। সবচেয়ে কম দুর্নীতি হয় ফিনল্যান্ডে।[৪৪] বলা বাহুল্য, টিআইর এই প্রতিবেদনে সরকারের প্রতিক্রিয়া হলো মারাত্মক। বিএনপি এই রিপোর্টটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, সরকারের লাগামহীন দুর্নীতির কারণেই দেশের এই অবস্থা।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যুযুধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পরস্পরের মুখোমুখি। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে কয়েকটা বিষয়ে ঐকমত্য না হলে সংকট এড়ানো সম্ভব নয়। এ দেশে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং শাসকদল সব সময় তাদের নিজেদের ইচ্ছা ও শর্ত অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করেছে।

দেশে যখন এই অবস্থা, তখন দুই দলের মধ্যে দূতিয়ালি করার জন্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ঢাকায় এলেন। দুই দলের নেতাদের সঙ্গেই তিনি কথাবার্তা বললেন। ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার আগে ৪ আগস্ট (২০০১) এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানালেন, দুই দল কয়েকটি বিষয়ে একমত হয়েছে। বিষয়গুলো হলো : (১) সংসদ বর্জন আর নয়, (২) আর হরতাল নয়, (৩) সন্ত্রাস নয়, (৪) ভোটকেন্দ্রে স্থানীয় পর্যবেক্ষক থাকবে, (৫) কমপক্ষে ৬০ জন মহিলা সাংসদ রাখার ব্যবস্থা হবে।[৪৫]

দুই দলের মধ্যকার সমঝোতা আদৌ টিকবে কি না, তা নিয়ে জনমনে সন্দেহ ছিল। ১০ আগস্ট *প্রথম আলো* একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ছয় মাসে পাঁচ হাজার অস্ত্রের লাইসেন্স দিয়েছে সদ্য বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সন্ত্রাস দমনের সঙ্গে নিতান্তই সাংঘর্ষিক।[৪৬]

নির্বাচন ২০০১

ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। শেখ হাসিনা মেয়াদ শেষ হওয়ার শেষ মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। বিচারপতি লতিফুর রহমান ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দেন। তাঁরা হলেন সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ চৌধুরী, এস এম শাহজাহান, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহি, আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, এ কে এম আমানুল ইসলাম চৌধুরী, এম হাফিজুদ্দিন খান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবদুল মালেক, মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী ও রোকেয়া আফজালুর রহমান। ওই রাতেই বিচারপতি লতিফুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ২৪ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে বদলি করে দেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটাই বোঝাতে চেয়েছে, আওয়ামী লীগের ঢেলে সাজানো প্রশাসন নিয়ে তারা নির্বাচন পরিচালনা করবে না। প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও এক মাস শেখ হাসিনা গণভবনে ছিলেন। গণভবন ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর ওপর বিরোধী দলগুলোর চাপ ছিল। যদিও সরকার থেকে প্রকাশ্যে কোনো কিছু বলা হয়নি। ১৬ আগস্ট (২০০১) হাসিনা গণভবন ছেড়ে তাঁর নিজের বাড়িতে চলে যান। যাওয়ার সময় আক্ষেপ করে বলেন, 'এত কিছু শুনতে ভালো লাগে না, আমরা পছন্দও করি না। যখন আমরা কিছুই নিইনি, তখন কিছু নিলামই না। গণভবন ছেড়ে চলে যাচ্ছি। পরিষ্কার কথা।'[৪৭]

২ অক্টোবর (২০০১) জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। বিএনপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হলো। আওয়ামী লীগের ২৮ জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, ৫২ জন সাবেক সাংসদ এবং ২৪ জন সাবেক আমলা হেরে যান। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সামরিক বাহিনীর ১১ জন সাবেক জেনারেলের মধ্যে আটজনই পরাজিত হন। শেখ হাসিনা নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'সূক্ষ্ম নয়, স্থূল কারচুপি করে ফলাফল বদলে দেওয়া হয়েছে।'[৪৮]

নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের অভিযোগের জবাব দেন কাদের সিদ্দিকী। ৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন :

আওয়ামী লীগ অভিযোগ করেছে, নীলনকশার নির্বাচন হয়েছে। আর সে নীলকশা নাকি রাষ্ট্রপতি, নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার করেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর (হাসিনা) অনশনের হুমকির মুখে সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। এত যত্ন করে যাঁকে রাষ্ট্রপতি বানানো হলো, নির্বাচনের পরদিন থেকে তিনি বেইমান, মোনাফেক হয়ে গেলেন।... নীলনকশা হলে তা পাঁচ বছর আগে নির্বাচনের সময়ই হয়েছে। তাঁদের আশা ছিল, রাষ্ট্রপতি তাঁদের পক্ষে কাজ করবেন। নীলনকশা দিয়ে যে অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা নিয়ে সংসদে দুই ঘণ্টা সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন।[৪৯]

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ স্বল্পভাষী মানুষ। রাজনীতির কূটকৌশল তেমন বোঝেন না। তাঁকে নিয়ে আওয়ামী লীগ যেসব প্রশ্ন তুলছে এবং নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইছে, সে সম্পর্কে তিনি তিন মাস নীরব ছিলেন। ২০০২ সালের ৪ জানুয়ারি তিনি প্রথমবারের মতো মুখ খুললেন। তখন আর তিনি রাষ্ট্রপতি নন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন বলেছিলেন :

আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে জেতানোর মুচলেকা দিয়ে আমি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিনি।...তাদের সব কথা শুনলে আমি ফেরেশতা, নইলে আমি শয়তান।...হেরে যাওয়ার পর তাঁরা আমাকে নির্বাচন বাতিল করে রাষ্ট্রপতির অধীনে পুনরায় নির্বাচন করার অনুরোধ করেন। আমি তাতে রাজি হইনি।[৫০]

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট ২১৬টি আসনে জয়ী হয়। জোটের প্রধান শরিক বিএনপি শতকরা ৪০ দশমিক ৯৭ ভাগ ভোট পেয়ে ১৯৩টি আসন পায়। তাদের সহযোগী জামায়াত, জাতীয় পার্টি (নাজিউর) ও ইসলামী ঐক্যজোট পায় যথাক্রমে ১৭, ৪ ও ২টি আসন। আওয়ামী লীগ শতকরা ৪০ দশমিক ১৩ ভাগ ভোট পেয়ে ৬২টি আসনে জয়ী হয়। এরশাদের জাতীয় পার্টি পায় ১৪টি আসন। নির্বাচনে বাম দলগুলোর ভরাডুবি হয়। জাসদ (ইনু), ওয়ার্কার্স পার্টি, বাসদ (উভয় গ্রুপ) ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল একটি আসনও পায়নি।৫১ ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন এবং জাসদের হাসানুল হক ইনু নিজ নিজ এলাকায় ভোটের হিসাবে ছিলেন যথাক্রমে পাঁচ ও তিন নম্বরে। এটাই ছিল তাঁদের নিজস্ব দলের প্রতীক নিয়ে শেষ নির্বাচন।

দ্বিতীয় যাত্রা

খালেদা জিয়া যথাবিহিত বিএনপি সংসদীয় দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। দলে নেতাদের মধ্যে টানাপোড়েন থাকায় কাউকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদীয় দলের উপনেতা করা হয়নি। শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। উপনেতা হন আবদুল হামিদ। শুরু হলো প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের দ্বিতীয় যাত্রা। ক্ষমতা গ্রহণ করেই বিএনপি সরকার প্রথমে যে কয়েকটি পদক্ষেপ নিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- ৭ নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হলো। আগের আওয়ামী লীগ সরকার এই ছুটি বাতিল করে দিয়েছিল।
- ১ মার্চ (২০০২) শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, এরশাদসহ সাড়ে তিন হাজার ব্যক্তির আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল করা হয়।
- ২১ মার্চ (২০০২) 'জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন রহিতকরণ বিল' পাস।
- ২১ জুন (২০০২) রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার পর জিয়াউর রহমানের মাজারে না যাওয়া এবং তাঁর বাণীতে জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক না বলার 'অপরাধে' তাঁকে এই মূল্য দিতে হলো।
- ২২ জুন (২০০২) খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমানকে বিএনপির ১ নম্বর যুগ্ম মহাসচিব নিয়োগ করা হয়।
- ৫০ বছরের পুরোনো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আদমজী পাটকল ৩০ জুন (২০০২) বন্ধ করে দেওয়া হয়।
- ২৪ সেপ্টেম্বর (২০০২) সরকার 'রাজনৈতিক কারণে' দায়ের করা তিন হাজার মামলা তুলে নেয়। এ ছাড়া ৩৮ হাজার ১৯০ জন আসামিকে অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়।
- ২৯ জানুয়ারি (২০০৩) মিগ-২৯ ক্রয়ে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সেনাবাহিনী ও

বিমানবাহিনীর প্রধান, প্রতিরক্ষা সচিবসহ সাতজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়।

- ২৫ মার্চ (২০০৩) স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান সমগ্র জাতির সম্পদ।'[১]

প্রতিহিংসা

২০০১ সালের নির্বাচনে পরপর আওয়ামী লীগের সমর্থকদের অনেকেই নির্যাতনের শিকার হন। 'বিএনপির ক্যাডাররা' দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে পরিচিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। তাঁরা দলবদ্ধ আক্রমণ ও গণধর্ষণের শিকার হন। গণমাধ্যমে 'সরকারি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের গণধর্ষণের শিকার পূর্ণিমার কথা' প্রকাশ পায়। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মীকে নানান মামলায় জড়ানো হয়।[২]

নির্বাচনে বিপুল বিজয় বিএনপিকে সংহত ও বিনয়ী করেনি। তারা আগেরবারের চেয়ে অনেক বেশি আক্রোশ ও প্রতিহিংসা নিয়ে ক্ষমতায় বসে। রাগটা আওয়ামী লীগের ওপরই বেশি। এক মন্তব্য প্রতিবেদনে *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন :

> বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপির এক প্রবীণ নেতা (এখন মন্ত্রী) আমাকে বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগ আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন করছে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেখবেন কী হয়, কীভাবে এসবের প্রতিশোধ নেওয়া হয়।'
>
> আর সেদিন আওয়ামী লীগের এক বড় নেতা (প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন) আমাকে বলেছেন, 'বিএনপি যেভাবে আমাদের ঘর থেকে বের হতে দিচ্ছে না, আমরা আবার ক্ষমতায় গিয়ে তাদের ঘরের ভেতরে আটকে দেব। ঘর ছেড়ে বের হওয়ার সামান্য সাহসও তারা পাবে না।'[৩]

রাজনীতি এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে মতান্তর থেকে ঝগড়াঝাঁটি ও খুনোখুনিতে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগে না। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সম্পর্কটাও সে পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। বৈরী মনোভাব যে কত প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে, তার একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো।

এটা ২০০২ সালের ঘটনা। ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু) আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী 'ওয়াটার কনফারেন্স' হলো। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে এটা যৌথভাবে আয়োজন করেছিল পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ও ব্র্যাক। খালেদা জিয়া তখন প্রধানমন্ত্রী। সম্মেলন

উদ্বোধনও করেছিলেন তিনি। সম্মেলনস্থলে ওয়ারপোর স্টলে একটা ভিডিও ডকুমেন্টারি দেখানো হয়েছিল, যেখানে 'জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' তৈরির খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। স্টলে কিছু স্থিরচিত্রও প্রদর্শিত হয়। আর যায় কোথায়? গোয়েন্দা সংস্থাগুলো রীতিমতো হামলে পড়ল। ওয়ারপোর পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১)। ওয়ারপোর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কেন ওই ভিডিও দেখানো হলো। একটি স্থিরচিত্রে দেখা গেল, ঢাকার কাছে একটা গ্রামে 'স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন' চলছে। উপস্থিত নারীদের মধ্যে একজনের চেহারা শেখ হাসিনার মতো। অভিযোগ উঠল, শেখ হাসিনার ছবি কেন দেখানো হচ্ছে। ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই নিম্ন রুচির।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে তদন্ত টিম এল ওয়ারপোর কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। ওয়ারপোর তখনকার একটি প্রকল্প ছিল 'সমন্বিত উপকূল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' নিয়ে। প্রকল্পের একজন পরামর্শককে ডেকে উপসচিব জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি সম্মেলনে কোনো রাজনীতিবিদের ছবি দেখেছেন?' তাঁর ইঙ্গিত ছিল ওই ভিডিও এবং স্থিরচিত্রটির প্রতি। পরামর্শক জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ দেখেছি, বিএনপির চেয়ারপারসনকে চাক্ষুষ দেখেছি, তিনিই সম্মেলন উদ্বোধন করেছেন।' যুগ্ম সচিব আমতা আমতা করে বললেন, 'না, আর কারও ছবি?' পরামর্শক মেজাজ গরম করে বললেন, সরকার বদল হলে তো আপনারাই আবার ভোল পাল্টে ফেলবেন।' যাহোক, ওয়ারপোর ওপর খড়্গ নেমে এসেছিল। ওয়ারপোর মহাপরিচালক গিয়াসুদ্দিন চৌধুরীকে 'শোকজ' নোটিশ দেওয়া হলো। 'আইটি' সেকশনের দায়িত্বে থাকা সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার আবদুল বাতেনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। ওয়ারপোর মহাপরিচালক বাতেনকে বাঁচানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। স্বাভাবিক চাকরিতে ফিরে আসতে বাতেনের প্রায় দুই বছর লেগেছিল। পরে তিনি কানাডায় চলে যান।[৪]

রাষ্ট্রপতির বিদায়

ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে বিএনপির রাজনৈতিক অবস্থান থেকে কিছুটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে দলের ভেতরে তাঁর সমালোচনা শুরু হয়। ৩০ মে ২০০২, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুদিবসের বাণীতে জিয়াকে 'স্বাধীনতার ঘোষক' হিসেবে উল্লেখ না করায় এবং তাঁর কবর জিয়ারত করতে না যাওয়ায় বিএনপির

'দলত্যাগী' সাবেক রাষ্ট্রপতি ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ওপর বিএনপির ক্যাডারদের হামলা

অনেক নেতা ও সংসদ সদস্য ক্ষুব্ধ হন। বিএনপি সংসদীয় দলের দুই দিনব্যাপী এক বৈঠকে তাঁকে নিয়েই আলোচনা হয় এবং তাঁর পদত্যাগ দাবি করে প্রস্তাব নেওয়া হয়। এক মন্তব্য প্রতিবেদনে *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন :

> রাষ্ট্রপতি ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী হয়তো বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভূমিকা ও কার্যক্রম থেকে উৎসাহিত হয়েই কিছুটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তিনি বিএনপির নেতা ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিএনপির দাবি ছিল পূর্ণ আনুগত্য। এখানে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণের কোনো সুযোগই তাঁরা দিতে চাননি। বিএনপির নেতৃত্বও সেটা মানতে কিছুতেই রাজি ছিল না। তবে এত তাড়াতাড়ি এমন ঘটনা ঘটবে, এটা ভাবা যায়নি। বিএনপি সরকার দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হয়ে এক বছরের মধ্যেই এমন রাজনৈতিক সংকটে পড়বে যে তাদের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে তাদেরকেই সরিয়ে দিতে হবে—এটা বিস্ময়কর।...
>
> সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি পদে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য একজন সম্মানিত ব্যক্তিই কাম্য।...বিএনপি চায় রাষ্ট্রপতি দলীয় সিদ্ধান্তে চলবেন, দলের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবেন না। নিরপেক্ষ থাকার সামান্য চেষ্টাও করতে পারবেন না। আবদুর রহমান বিশ্বাস সেটা মেনে নিয়েছিলেন। ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী সেটা মানতে পারেননি। সে জন্য তাঁকে ট্র্যাজিক নায়কের মতোই বিদায় নিতে হলো।

ডা. বদরুদ্দোজার বিদায় একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলগুলো হয়তো কোনো অনুগত বা বশংবদ দলীয় লোককে রাষ্ট্রপতি বানাতে চাইবে। ফলে তিনি দলেরই প্রতিনিধি থাকবেন, রাষ্ট্রের প্রতীকী অভিভাবক হয়ে উঠতে পারবেন না।[৫]

উলফার জন্য অস্ত্র

২০০৪ সালে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে দেশের রাজনীতিতে নতুন করে সংকট তৈরি হয়। দেশ পরিচালনায় বিএনপি যেন লাগামহীন হয়ে পড়েছিল।

২০০৪ সালের ১ এপ্রিল রাতে চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের জেটি থেকে অস্ত্র খালাস করে ১০টি ট্রাকে বোঝাই করা হচ্ছিল। পুলিশ ও কোস্টগার্ড অস্ত্রগুলো জব্দ করে। ৪ হাজার ৯৩০ ধরনের জব্দকৃত অস্ত্রের মধ্যে গ্রেনেড, রকেট লঞ্চার, রকেট, সাব-মেশিনগান, গুলি ইত্যাদি ছিল। এ নিয়ে কর্ণফুলী থানায় মামলা হয় এবং ১১ জুন ৪৩ জনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে ও ৪৫ জনের বিরুদ্ধে চোরাচালানের চার্জশিট দেওয়া হয়। বিষয়টি নানাভাবে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলে। ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর চট্টগ্রামের একটি আদালত এ ব্যাপারে অধিকতর তদন্তের সুপারিশ করেন। এই তদন্তে উঁচু পর্যায়ের অনেকের সংশ্লিষ্টতা বেরিয়ে আসে। পরে অস্ত্র আইনে ৫০ জন এবং চোরাচালানের দায়ে ৫২ জনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত চার্জশিট দেওয়া হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ওই সময়ের শিল্পমন্ত্রী এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রধান মতিউর রহমান নিজামী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপির নেতা লুৎফুজ্জামান বাবর, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নুরুল আমিন, ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, এনএসআইয়ের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার আবদুর রহিম, পরিচালক উইং কমান্ডার শাহাবুদ্দিন, মেজর লিয়াকত হোসেন, ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসামের (উলফা) সামরিক শাখার প্রধান পরেশ বড়ুয়া প্রমুখ। তদন্তে জানা যায়, চীনের তৈরি অস্ত্রের এই চালান যাচ্ছিল উলফার কাছে।[৬]

ভারত বরাবরই অভিযোগ করে এসেছে যে বাংলাদেশ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' গোষ্ঠীগুলো নানাভাবে সাহায্য পেয়ে আসছে। 'দশ ট্রাক' অস্ত্রের এই চালান ধরা পড়ার পর ভারতের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলো। এই কাজে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর অনেকেই জড়িত থাকার কারণে সরকারের বিব্রত হওয়ার কথা। ডিজিএফআইয়ের তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাদিক হাসান রুমি আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলেন, তিনি বিষয়টি ওই সময় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে জানালে প্রধানমন্ত্রী কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। ২০১৪ সালের ৩০ জানুয়ারি আদালতের রায়ে অস্ত্র চোরাচালানের এই মামলায় ১৪ জনের ফাঁসির আদেশ হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নুরুল আমিন ও পরেশ বড়ুয়া পলাতক। বাকিরা গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন।

অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ—এসবই চলছিল প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে। কিন্তু পরিস্থিতি দুর্ভাগ্যজনকভাবে মোড় নেয় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট। ওই দিন বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের নির্ধারিত জনসভা ছিল। সভায় উপর্যুপরি গ্রেনেড ও বোমা হামলা হয়। এই হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক আইভি রহমানসহ ২৪ জন নিহত হন এবং আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ কয়েক শ নেতা-কর্মী আহত হন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও ছিলেন মাহবুবুর রহমান, হাসিনা মমতাজ, রিজিয়া বেগম, রফিকুল ইসলাম, রতন শিকদার, মোহাম্মদ হানিফ, মোস্তাক আহমেদ, লিটন মুনশি, আবদুল কুদ্দুস পাটোয়ারী, বিল্লাল হোসেন, আব্বাস উদ্দিন শিকদার, আতিক সরকার, মামুন মৃধা, নাসিরউদ্দিন, আবুল কাসেম, আবুল কালাম আজাদ, আবদুর রহিম, আমিনুল ইসলাম, জাহেদ আলী, মোতালেব ও সুফিয়া বেগম। হামলার পর পুলিশ বাদী হয়ে মতিঝিল থানায় মামলা করে। পরদিন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মামলা দিতে গেলে পুলিশ তা নেয়নি।[৭]

ঘটনা তদন্তে ২২ আগস্ট বিচারপতি মো. জয়নুল আবেদীনকে দিয়ে এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিশন করা হয়। ৪৫ দিনের মাথায় কমিশন সরকারের কাছে ১৬২ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন দিয়ে বলে যে এই হামলার পেছনে একটি শক্তিশালী

২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার পর। আলোকচিত্র : জিয়া ইসলাম

বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত। ৪ অক্টোবর (২০০৪) *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বিচারপতি জয়নুল আবেদীন এই ঘটনায় ভারতের সংশ্লিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করেন।[৮]

এই ঘটনার ১০ মাস পর ২০০৫ সালের ৯ জুন নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার বীরকোট গ্রামের জনৈক জজ মিয়াকে সিআইডি আটক করে এবং তাঁর কাছ থেকে গ্রেনেড হামলার দায় স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি আদায় করে। জবানবন্দিতে জজ মিয়া বলেন, তিনি আগে কখনো গ্রেনেড দেখেননি, পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে 'বড় ভাইদের নির্দেশে' তিনি অন্যদের সঙ্গে এই হামলায় অংশ নেন।[৯]

দুই বছর পর ২০০৬ সালের ২১ আগস্ট জজ মিয়া নাটকের নেপথ্যের ঘটনা ফাঁস করে দেন তাঁর মা জোবেদা খাতুন। *প্রথম আলোকে* দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, জজ মিয়াকে আটকের পর থেকে তার পরিবারকে সিআইডি মাসিক ভাতা দিয়ে আসছে এবং জজ মিয়াকে 'রাজসাক্ষী' করা হয়েছে। বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় জনমনে ধারণা জন্মে যে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার জন্য সরকার ইচ্ছা করেই জজ মিয়া নাটক সাজিয়েছে। আওয়ামী লীগ এই হামলার জন্য বিএনপির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন নেতা এবং সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাকে সরাসরি দায়ী করে।[১০]

বিএনপি থেকে প্রচার করা হয়, হাসিনা নিজেই বোমা নিয়ে এসেছিলেন। যদি সত্যি সত্যি তাঁকে হত্যা করার জন্য হামলা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি বেঁচে আছেন কীভাবে? এ ঘটনার পর শেখ হাসিনার সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়ার সম্পর্কটা আর রাজনৈতিক থাকল না। তাঁরা হলেন পরস্পরের চরম দুশমন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটাই হলো সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

জেএমবির উত্থান

বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার সন্ত্রাস দমনের জন্য যৌথ বাহিনীকে দিয়ে 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' পরিচালনা করে। যৌথ বাহিনীকে এমন আইনি সুরক্ষা দেওয়া হয় যে, তাদের কোনো বিচারের মুখোমুখি করা হবে না। এ সময় 'ক্রসফায়ারে' অনেকের মৃত্যু হয় এবং অভিযানটি গণমাধ্যমে নেতিবাচক প্রচার পায়। রাজশাহীতে বিএনপির কিছু নেতা জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাইকে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। জঙ্গি নেতাদের কারও কারও সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর পুরোনো সম্পর্ক ছিল। জামায়াতের নেতা মতিউর রহমান নিজামী প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, দেশে কোনো

জঙ্গি নেই, এসব মিডিয়ার সৃষ্টি। এসব ঘটনা দেশে ও বিদেশে অনেককেই সন্ত্রস্ত ও সন্দিগ্ধ করেছিল। ফলে জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের একটা নেতিবাচক পরিচিতি দাঁড়িয়ে যায়। যদিও বিএনপি সরকারই শীর্ষ জেএমবি নেতাদের অনেককে গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের গায়ে জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকের তকমা এঁটে যায়।[১১]

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট মুন্সিগঞ্জ ছাড়া বাকি ৬৩ জেলায় একযোগে প্রায় ৫০০ বোমা ফাটিয়ে প্রচলিত শাসন ও বিচারব্যবস্থা বাতিল করে 'আল্লাহর আইন' কায়েমের দাবি জানিয়ে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) প্রচারপত্র ছড়ায়। বোমা হামলায় দুজন নিহত ও ১০৪ জন আহত হয়। এরপর গাজীপুর, চট্টগ্রাম, ঝালকাঠি, চাঁদপুর, নেত্রকোনা ও সিলেটে 'আত্মঘাতী' বোমা হামলা চালায় জেএমবি। এসব হামলায় বিচারক, আইনজীবী, পুলিশ সদস্যসহ ৩৩ জন নিহত হন। বোমা হামলার আগে পর্যন্ত জেএমবি সম্পর্কে চারদলীয় জোট সরকার ছিল উদাসীন। ১৭ আগস্টের (২০০৫) পর সরকার নড়েচড়ে বসে। কয়েক মাসের মধ্যে জেএমবির প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আবদুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান (বাংলা ভাই)সহ কয়েকজন গ্রেপ্তার হন।[১২]

খালেদা জিয়া তাঁর সরকারের প্রথম মেয়াদে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কয়েকজন সহকর্মীকে পেয়েছিলেন। ওই মেয়াদটা তাঁর জন্য ছিল শিক্ষানবিশির পর্যায়। ২০০১ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতাসীন হলে তিনি আরও দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দেবেন, এটাই আশা করা হয়েছিল। এই মেয়াদের সরকারের মন্ত্রীরা ছিলেন তাঁর নিজস্ব পছন্দের, দল চলেছিল তাঁর নিজের ইচ্ছায়। কিন্তু অর্জনের গ্রাফ হয়ে পড়ে নিম্নমুখী। এ সময়ে দেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটে। সরকার এ থেকে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে গিয়ে নিজের অজান্তে এর শিকার হয়ে পড়ে। যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাহায্য নিয়ে একদা বিএনপি তৈরি হয়েছিল, তার নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত খালেদা জিয়া ধরে রাখতে পারেননি। এ জন্য তাঁকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

বিপর্যয়

নতুন সমীকরণ

বাম ঘরানার ১১-দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। এই জোটের কয়েকটি দল ২০০৫ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে দেয়। জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ও সাম্যবাদী দল ১১-দলীয় জোট ছেড়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট গড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় তৈরি হয় ১৪-দলীয় জোট। ২০০৫ সালের ১৫ জুলাই এই জোট ৩১-দফা সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করে। তাদের মূল দাবি ছিল সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে এবং নতুন করে ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে।

ভোটের হিসাবে জাতীয় পার্টি ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট এবং বিরোধী ১৪-দলীয় জোট, উভয়ের কাছেই গুরুত্ব পায়। রাজনীতির দর-কষাকষিতে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বাজারদর বেড়ে যায় অনেক। তাঁকে নিয়ে দুই জোটে শুরু হয় টানাটানি। ২০০৬ সালের ২৭ জুলাই রাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান এরশাদের বাসায় যান কথাবার্তা বলতে। এরশাদ তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো প্রত্যাহার করাসহ অনেক শর্ত দেন। তারেকের সঙ্গে এরশাদের একটা আপস হয়, নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা তুলে নিলে তিনি সেপ্টেম্বরে ৪-দলীয় জোটে যোগ দেবেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এরশাদ বলেন, 'আমি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি না। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। বিএনপির সঙ্গে আমার আদর্শ ও মতের মিল রয়েছে। বিএনপির চেয়ে আওয়ামী লীগ আমার বেশি ক্ষতি করেছে। আমাকে জেলে নিয়েছে, জরিমানা

বিএনপির নেতৃত্বে তৈরি হলো চারদলীয় জোট

দিতে বাধ্য করেছে এবং আমার দল ভেঙেছে।'[১]

এরশাদের ৪-দলীয় জোটে যোগ দেওয়ার ঘোষণা শুনে ১৪ দল ও আওয়ামী লীগের নেতা শেখ হাসিনা আশাহত ও ক্ষুব্ধ হন। জিয়া পরিবার ও এরশাদের সখ্যকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'চোরে চোর চেনে।'[২]

এরশাদকে নিয়ে দুই জোটে রশি টানাটানি অব্যাহত থাকে। ২৮ জুলাই (২০০৬) সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির দেওয়া শর্তের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন, 'আমি নিজের জন্য কারও কাছে কিছু চাইতে যাব না। আমি এমনিতেই লাজুক মানুষ।' ৪-দলীয় জোটে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর দলের মধ্যে মতভেদ ছিল। ৩০ জুলাই তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'আমি জেলে যাব আর দলের নেতারা সাংসদ হবে, তা হবে না।'[৩] ১৬ আগস্ট ২০০৬, ঢাকা বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় সাংবাদিকদের বলেন, 'এরশাদ চাইলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলের জোটে আসতে পারেন।'[৪] ২৪ আগস্ট দুটো দুর্নীতি মামলা থেকে এরশাদ অব্যাহতি পান। পরদিন অব্যাহতি পান আরও দুটো দুর্নীতির মামলা থেকে।

ভাঙন

এ সময় বিএনপি আরেকবার ভাঙনের মুখে পড়ে। উল্লেখ যে, রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়ার পর ২০০৪ সালের ৮ মে অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী 'বিকল্পধারা বাংলাদেশ' নামে নতুন দল তৈরি করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বিএনপি নেতা মেজর (অব.) আবদুল মান্নান। মেজর মান্নান বিকল্পধারার সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর বিএনপি আরেক দফা ভাঙে। কয়েকজন নেতা-কর্মীসহ কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বিএনপি থেকে বেরিয়ে এসে 'লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি' তৈরি করেন। এক সংবাদ সম্মেলনে অলি আহমদ বলেন, 'বিএনপি এখন রাজাকারনির্ভর একটি রাজনৈতিক দল।'[৫]

নতুন দল করার আগে বদরুদ্দোজা চৌধুরী, অলি আহমদ, শেখ রাজ্জাক আলী প্রমুখ একটি সমঝোতাপত্রে সই করেন। সমঝোতাপত্রে বলা হয়, 'প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, তাঁর দুর্নীতিবাজ চক্র ও স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে' বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন সরকারের অধিকাংশ মন্ত্রী, সাংসদ ও দলীয় নেতা এবং প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের নজিরবিহীন দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, সন্ত্রাস, সার ও বিদ্যুৎ কেলেঙ্কারিসহ রাষ্ট্র পরিচালনায় সীমাহীন ব্যর্থতার কারণে অযোগ্য বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অলি আহমদ 'সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন'।[৬]

নতুন দলের নাম রাখা হয় লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)। অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী নতুন দলের সভাপতি, অলি আহমদ নির্বাহী সভাপতি ও মেজর (অব.) এম এ মান্নান মহাসচিব মনোনীত হন। দলের মৌলিক নীতি হিসেবে 'প্রচলিত রাজনীতির বিকল্পধারা হিসেবে সুস্থ, আধুনিক ও উদার গণতন্ত্রের রাজনীতি' চর্চার কথা বলা হয়। এলডিপি তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগে তৈরি হওয়া 'বিকল্পধারা বাংলাদেশ' নতুন দলে একীভূত হয়ে যায়। সংবাদ সম্মেলনে অলি আহমদ বলেন, 'লুটপাটের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া তারেক রহমানের কবল থেকে বের হয়ে আমরা একত্র হয়েছি। এই দুর্নীতিবাজ যুবরাজ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের প্রতিহত করতে দেশপ্রেমিক জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।'[৭]

তারেক রহমানকে নিয়ে দলের ভেতরে ও বাইরে আলোচনা-সমালোচনা এবং বিতর্ক ছিল। বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশান অফিস, যা 'হাওয়া ভবন' নামে পরিচিত, সেখানে বসে তারেক রহমান একধরনের 'বিকল্প সরকার' চালাতেন

বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান কথা বলছেন চেয়ারপারসনের সঙ্গে

বলে সমালোচনা ছিল। আওয়ামী লীগ বরাবরই অভিযোগ করে এসেছে যে 'হাওয়া ভবন' হলো দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের উৎস। সময়টা ছিল বিএনপির জন্য 'পড়ন্ত বেলা'।

উইকিলিকসের তারবার্তায় 'হাওয়া ভবনের' প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কামাল সিদ্দিকী হাওয়া ভবনকে বলতেন 'উইন্ড টানেল'। সে উইন্ড টানেলে তারেক রহমানের কতিপয় বিকারগ্রস্ত বন্ধু রয়েছেন। এ ছাড়া অনেক মন্ত্রী-সাংসদও নিজেদের স্বার্থে হাওয়া ভবনের নাম ব্যবহার করতেন। গণমাধ্যমেও এ নিয়ে অনেক কথাবার্তা, আলোচনা-সমালোচনা হয়। বিএনপি এসব প্রচারের কোনো জুতসই প্রতিবাদ বা পাল্টা জবাব দিতে পারেনি।[৮]

ঠিক এ সময় দলের মধ্যে ভাঙন বিএনপিকে আরও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। দলের কিছু 'বঞ্চিত' নেতা হয়তো মনে করেছিলেন, সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে এবং এটাই হচ্ছে দল ভেঙে নতুন দল বানানোর উপযুক্ত সময়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার

পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কে হবেন, এ নিয়ে বিএনপি ছক কষছিল। বিএনপি সরকার সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর নেওয়ার বয়সসীমা ৬৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৭

বছর করে। আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে যে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার মতলবেই এই সংশোধনী আনা হয়েছে। আওয়ামী লীগ বিচারপতি কে এম হাসানকে বিএনপির পছন্দের লোক হিসেবে প্রচার করে। এই প্রচারে সত্যতা ছিল। বিচারপতি হাসান বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এর আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। জিয়াউর রহমানের সরকার তাঁকে ইরাকে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছিল। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য একবার তিনি বিএনপির মনোনয়নও চেয়েছিলেন।[৯] এ ছাড়া আওয়ামী লীগের অভিযোগ ছিল, বিচারপতি হাসান সুপ্রিম কোর্টে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল শুনানির সময় 'বিব্রত'বোধ করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী ফারুক-রশিদের ভায়রা ভাই হওয়ায় শেখ হাসিনার কাছে তিনি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিলেন না।[১০]

২০০৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পল্টনে এক জনসভায় শেখ হাসিনা সমবেত জনতার উদ্দেশে বলেন, 'বিচারপতি হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নিলে ঢাকা অচল করে দেওয়া হবে। যাঁর যা আছে তা-ই নিয়ে আপনারা ঢাকায় আসবেন।' ২৩ সেপ্টেম্বর কুমিল্লার বরুড়ায় এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে বিএনপি বসে আঙুল চুষবে না।'[১১]

একটি 'গ্রহণযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠনের বিষয়ে ৫, ১৬ ও ২৩ অক্টোবর (২০০৬) আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ও বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার মধ্যে বৈঠক হয়। তাঁরা একমত হতে পারেননি। ২৮ অক্টোবর (২০০৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ছিল। ২৭ অক্টোবর ১৪-দলীয় জোট ঢাকায় পরদিন 'লগি-বইঠার' সমাবেশ ঘোষণা করে। ওই দিন চারদলীয় জোটের শরিক জামায়াতে ইসলামী বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর দিকের গেটের সামনে সমাবেশ করে। দুই জোটের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও মারামারি হয়। সারা দেশে ওই দিন রাজনৈতিক সহিংসতা ও সংঘর্ষে ১১ জন নিহত হয়। আহত হয় কয়েক হাজার মানুষ। ঢাকায় পাঁচজন এবং কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, মাগুরা, মেহেরপুর, বাগেরহাট ও মৌলভীবাজারে একজন করে নিহত হয়। ঢাকায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন ছিলেন আওয়ামী লীগের কর্মী। আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে ঢাকায় সারা দিন ধরে গুলিবিনিময়, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ইটপাটকেল ছোড়া, ককটেল ফাটানো এবং পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট ছোড়া হয়।[১২]

২৮ অক্টোবর বিচারপতি কে এম হাসান তাঁর বাসভবনের সামনে সাংবাদিকদের কাছে একটা বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'সংশ্লিষ্ট

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ ভেঙে যাওয়ায় আমাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।' এর আগে তিনি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর অপারগতার কথা জানিয়ে দেন। ওই দিনই বেগম জিয়া রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে ক্ষমতা ছেড়ে দেন।[১৩]

অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন গঠনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো একমত না হতে পারায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের হাইকমিশন হতাশা ব্যক্ত করে। ২৯ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজেই নিজেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে ঘোষণা দেন। প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়ায় মার্কিন দূতাবাস থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।[১৪]

'উইকিলিকস'-এর ফাঁস করা তথ্যে ওই সময়ের নাটকীয় ঘটনাবলির আঁচ পাওয়া যায়। বিচারপতি কে এম হাসান তাঁর উপদেষ্টা খোঁজা শুরু করে দিয়েছিলেন।[১৫] বিচারপতি হাসান ছিলেন বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী কর্নেল (অব.) ফারুক-রশিদের ভায়রা এবং আওয়ামী লীগের কাছে তিনি একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। প্রধান উপদেষ্টা পদে বিচারপতি মইনুর রেজা চৌধুরীর কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু নিয়োগের আগেই তিনি মারা যান। এরপর সুপ্রিম কোর্টের দুজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নাম ক্রমানুসারে চলে আসে। তাঁরা হলেন বিচারপতি এম এ আজিজ এবং বিচারপতি হামিদুল হক। বিচারপতি আজিজ ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং আওয়ামী লীগের কাছে তিনি ছিলেন অগ্রহণযোগ্য। বিচারপতি হামিদুল হক জুডিশিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান হিসেবে একটি 'লাভজনক' পদে থাকায় তাঁকে উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়নি। এ ছাড়া তাঁর ব্যাপারে বিএনপির আপত্তি ছিল। পরবর্তী বিকল্প ছিলেন বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী। তিনিও বিএনপির কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। পরবর্তী সময়ে বেগম খালেদা জিয়া বিচারপতি মাহমুদুল আমিনের বিরোধিতা করার জন্য আক্ষেপ করেছিলেন।[১৬]

উইকিলিকসে ফাঁস হওয়া তথ্যে জানা যায়, ২৭ সেপ্টেম্বর (২০০৬) মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিস তাঁর পাঠানো এক তারবার্তায় শেখ হাসিনার বরাত দিয়ে জানিয়েছিলেন, বিচারপতি কে এম হাসান শেখ হাসিনার পিতার হত্যাকারী দুই দণ্ডিত আসামির আত্মীয়। হাসানকে মানতে না পারার ক্ষেত্রে সেটাই ছিল 'প্রকৃত ও আবেগপূর্ণ' কারণ। বিএনপির সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আওয়ামী লীগের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এখানে বিএনপির ভুল ছিল আওয়ামী লীগের বিরোধিতার আসল কারণ খুঁজে না দেখা এবং বিকল্প চিন্তা না করে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে প্রধান উপদেষ্টা বানিয়ে তত্ত্বাবধায়ক

সরকার তৈরি করা।[১৭]

রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ২৯ অক্টোবর রাত আটটায় প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন। তাঁর রাষ্ট্রপতির পদও বহাল থাকল। ওই রাতেই শেখ হাসিনা তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'রাষ্ট্রপতির আচরণ দেখে সিদ্ধান্ত নেব।'[১৮]

৩০ অক্টোবর সারা দিন উপদেষ্টাদের তালিকা তৈরি করা নিয়ে বঙ্গভবনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে দর-কষাকষি চলে। রাতে ১০ জন উপদেষ্টা শপথ নেন। তাঁরা হলেন বিচারপতি ফজলুল হক, আকবর আলি খান, সি এম শফি সামি, হাসান মশহুদ চৌধুরী, ধীরাজ কুমার নাথ, মাহবুবুল আলম, সুফিয়া রহমান, ইয়াসমিন মুর্শেদ ও সুলতানা কামাল। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উপদেষ্টা নিয়োগের সুপারিশ করে রাষ্ট্রপতিকে আলাদা তালিকা দিয়েছিল। আওয়ামী লীগের তালিকা থেকে মাত্র একজনকে নেওয়া হয়। বিএনপির দেওয়া তালিকা থেকে বেশির ভাগ উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। অবশ্য তালিকার বাইরে থেকেও উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছিল।[১৯]

আসন্ন সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলকে অংশ নেওয়া থেকে বিরত রাখার কৌশল নিয়ে এগোতে থাকে বিএনপি। এ সম্পর্কে *প্রথম আলো* ১৮ নভেম্বর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপে। প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচন কতটা গ্রহণযোগ্য হলো কিংবা প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল অংশ নিল কি না, তার চেয়ে বিএনপির কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো অবস্থায় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার বাইরে রাখা। এভাবেই প্রস্তুতি চূড়ান্ত করছে বিএনপি ও চারদল। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ১৪ দলের দাবি অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজের পদত্যাগ ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করলে পরবর্তী নির্বাচনে এর সুফল পাবে ১৪ দল। দাবি পূরণ না হলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যাবে না—এ বিষয়টি মোটামুটি নিশ্চিত হয়েই বিএনপি মনে-প্রাণে চাইছে নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন ঠেকিয়ে রাখতে।[২০]

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপির পরামর্শেই চলছে। উপদেষ্টাদের মধ্যেও এ নিয়ে মতান্তর ছিল। বারবার মতামত উপেক্ষিত হওয়ায় এবং রাজনৈতিক সংকট নিরসনে তাঁদের উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় আকবর আলি খান, হাসান মশহুদ চৌধুরী, সি এম শফি সামি ও সুলতানা কামাল ১১ ডিসেম্বর (২০০৬) উপদেষ্টা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।[২১] ১২ ডিসেম্বর মেজর জেনারেল (অব.) রুহুল আলম চৌধুরী, অধ্যাপক মইনুদ্দিন আহমদ খান, শফিকুল হক চৌধুরী ও শোয়েব আহমদকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[২২]

জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা ফিরিয়ে এনে সবার জন্য নির্বাচনের সমান ক্ষেত্র তৈরি করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।[২৩] মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া এ বিউটেনিস বড় রাজনৈতিক দলগুলোকে নতুন করে আলোচনায় বসার জন্য এবং প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সাফ জানিয়ে দেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের পর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করতে হবে।[২৪] ১৮ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে হরতালের ডাক দেন। এ সময় মঞ্চে ১৪ দলের নেতারা ছাড়াও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ এবং এলডিপির চেয়ারম্যান বদরুদ্দোজা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় এরশাদ বলেন, 'অতীতে আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি, তার জন্য জনগণের কাছে আজ ক্ষমা চাইছি।'[২৫]

জাতীয় পার্টিকে নিয়ে বিএনপিতে বরাবরই অস্বস্তি ছিল। এরশাদ একেক সময় একেক কথা বলেন। তাঁকে আস্থায় নেওয়া যাচ্ছিল না। এরশাদের স্ত্রী ও জাতীয় পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম রওশন এরশাদ ২০ ডিসেম্বর (২০০৬) রাতে 'হাওয়া ভবনে' বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শেখ শওকত হোসেন নিলু, বেগম রাজিয়া ফয়েজ, ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল, মইনুদ্দিন ভূঁইয়া প্রমুখ। তাঁদের সঙ্গে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার কথাবার্তা হয়। রওশন এরশাদ খালেদা জিয়াকে আশ্বস্ত করে বলেন যে তাঁরা খালেদার নেতৃত্বে সম্প্রসারিত জোটে যাবেন এবং আসন্ন নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ব্যানারে লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবেন। রওশন এরশাদের হাওয়া ভবনে যাওয়ার খবর শুনে এরশাদ ক্ষুব্ধ হন।[২৬]

২৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ও খেলাফত মজলিসের নেতা শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হকের মধ্যে একটা পাঁচ দফা চুক্তি সই হয়। চুক্তিতে বলা হয়, 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে আলেমদের ফতোয়া দেওয়ার অধিকার দেব।' দেশের ৬৩ জন বুদ্ধিজীবী ২৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, ফতোয়ার স্বীকৃতি দেশকে অন্ধকার যুগে নিয়ে যাবে। বিবৃতিতে যাঁরা সই দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবীর চৌধুরী, খান সরওয়ার মুর্শিদ, মোশাররফ হোসেন, রেহমান সোবহান, আনিসুজ্জামান, মোজাফ্ফর আহমদ, হেনা দাস, মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত, হামিদা হোসেন প্রমুখ।[২৭]

অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দুই জোটই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২৬ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র

জমা দেওয়ার শেষ দিনে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে দুই জোটের ৪ হাজার ১৪৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। খালেদা জিয়া পাঁচটি আসনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন। শেখ হাসিনা এবং এরশাদ যথাক্রমে চারটি ও পাঁচটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন।[২৮] ২২ জানুয়ারি (২০০৭) নির্বাচনের দিন ঠিক করা হয়।

আওয়ামী লীগ তার শরিকদের ৯৬টি আসন ছেড়ে দেয়। এর মধ্যে জাতীয় পার্টিকে ৫০, এলডিপিকে ২৯, ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদকে চারটি করে এবং জাকের পার্টিসহ ইসলামি দলগুলোকে পাঁচটি আসন ছেড়ে দেয়।[২৯] মনোনয়ন নিয়ে শরিকদের মধ্যে বেশ মনোমালিন্য হয়।

ইয়াজউদ্দিন সরকারের অধীনে আওয়ামী লীগ আদৌ নির্বাচনে যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। ৩ জানুয়ারি (২০০৭) এক সংবাদ সম্মেলনে ১৪-দলীয় জোটসহ 'মহাজোট' একটি 'ক্রটিমুক্ত ভোটার তালিকা' না থাকার কথা উল্লেখ করে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। তারা প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি জানায়।[৩০] ৫ জানুয়ারি ২০০৭ এক সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া বলেন, 'আগামী নির্বাচন গ্রহণযোগ্য না হলে এ জন্য দায়ী হবেন নির্বাচন বর্জনকারীরা।' পৃথক এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বলেন, 'এই দায়িত্ব আমরা কেন নেব? এর দায়দায়িত্ব নেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন।'[৩১]

৬ জানুয়ারি মহাজোট এক ঘোষণায় ৭ জানুয়ারি থেকে তিন দিনের অবরোধ ঘোষণা করে। ৬ জানুয়ারি রাতে শেখ হাসিনার ধানমন্ডির 'সুধা সদনে'র বাসায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিস ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন। পরদিন সন্ধ্যায় তাঁরা বনানীর 'হাওয়া ভবনে' খালেদা জিয়ার সঙ্গে কথা বলেন। কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানায়, সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে নির্বাচন দেখতে কোনো বিদেশি পর্যবেক্ষক না-ও আসতে পারেন।[৩২]

এক-এগারো

ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপির অনুকূলে সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বলে আওয়ামী লীগের অভিযোগ ছিল। এই অভিযোগ অমূলক ছিল না। আওয়ামী লীগসহ ১৪-দলীয় জোট নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য লাগাতার 'অবরোধ' কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। ৮ জানুয়ারি ২০০৭ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি নিকোলাস বার্নস প্রধান উপদেষ্টাকে ফোন করে

বলেন, 'সব দল যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে সেই ব্যবস্থা করুন।' ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পল্টন ময়দানে এক জনসভায় শেখ হাসিনা 'ইয়াজউদ্দিনের অধীনে নির্বাচন নয়' বলে ঘোষণা দেন।[৩৩] ১০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা এনডিআই ও আইআরআই, কমনওয়েলথ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোনো পর্যবেক্ষক পাঠাবে না বলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেয়।[৩৪]

১১ জানুয়ারি ২০০৭ সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দেন। উইকিলিকসের ফাঁস করা মার্কিন কূটনৈতিক তারবার্তা অনুযায়ী সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মইন ইউ আহমেদ এবং তাঁর গ্রুপ ১১ জানুয়ারি (২০০৭) রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে 'জরুরি অবস্থা' জারি করায়।[৩৫] ওই সময় ডিজিএফআইয়ের কাউন্টার টেরোরিজম ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ টি এম আমিন মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিসের সঙ্গে দেখা করে সেনাবাহিনীর অবস্থান তুলে ধরেন। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ না নিলে এবং একতরফা নির্বাচনের সমর্থন দিলে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখা ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে—এরকম আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। এ ছাড়া জামা'আতুল মুজাহিদীন

প্রথম আলো

নির্বাচন প্রতিরোধের ডাক দিল মহাজোট

কুমিল্লার জনসভায় খালেদা জিয়া
নির্বাচন হবেই, বাধা দিতে এলে প্রতিহত করুন

এনডিআই কমনওয়েলথ ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে না

এবার ৩৮ কেজি বিস্ফোরকসহ জেএমবির তিন জঙ্গি গ্রেপ্তার

গণমাধ্যমে এক-এগারোর পটভূমি

বাংলাদেশের (জেএমবি) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেও দুশ্চিন্তা রয়েছে। সব দলকে নিয়ে একটা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত একটা নিরপেক্ষ সরকার থাকুক—এটাই সেনাবাহিনী চায়।[৩৬]

১১ জানুয়ারি বঙ্গভবনে দিনভর ছিল উত্তেজনা। ওই দিনের একটা খোলামেলা বিবরণ পাওয়া যায় পরের বছর ১১ জানুয়ারি *প্রথম আলোয়* ছাপা হওয়া টিপু সুলতানের প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে লেখা হয়: বেলা তিনটার দিকে বঙ্গভবনে ঢোকেন তিন বাহিনীর প্রধানেরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী ফজলুল বারী। তাঁরা সরাসরি দেখা করেন ড. ইয়াজউদ্দিনের সঙ্গে। প্রথমে সেনাবাহিনীর প্রধান দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকতে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ড. ইয়াজউদ্দিন বিষয়টি প্রথমে গুরুত্ব দিতে চাননি। তাঁর বক্তব্য ছিল এমন—সবই তো ঠিক চলছে। নির্বাচন হলে অসুবিধাটা কোথায়। এ সময় একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা অসন্তুষ্ট হয়ে ড. ইয়াজউদ্দিনকে বলেন, দেশ এক মহা সংকটের দিকে এগিয়ে চলছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন দিলে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে। এ সময় উপস্থিত আরেক ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করেন। তখন রাষ্ট্রপতি বিষয়টা নিয়ে ভাবার জন্য দু-এক দিন সময়ের কথা বলেন। কিন্তু সেনা কর্মকর্তাদের বক্তব্য ছিল অনেকটা এরকম—দেশকে বাঁচাতে হবে। আর সময় নষ্ট করা যাবে না, যা করার এখনই করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধান টেলিফোনে নবম পদাতিক ডিভিশনের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরীকে কিছু জরুরি নির্দেশনা দেন। এই পর্যায়ে ড. ইয়াজউদ্দিন নমনীয় হন। এ বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা পোষণ করে বলেন, 'আমি ভেতরে গিয়ে একটু কথা বলে আসি?' উপস্থিত সেনা কর্মকর্তারা এতে সায় দেননি। তাঁদের বক্তব্য, এটা রাষ্ট্রীয় বিষয়, এ নিয়ে ওনার সঙ্গে আলোচনার দরকার নাই। একপর্যায়ে সেনা কর্মকর্তাদের প্রস্তাবে রাজি হন রাষ্ট্রপতি। তখন সই করার জন্য তাঁর হাতে ইস্তফার কাগজ তুলে দেওয়া হয়। একজন বললেন, 'কলম লাগবে স্যার?' 'না আমার কাছে কলম আছে'—এ কথা বলে ড. ইয়াজউদ্দিন পকেট থেকে কলম বের করতে করতে মৃদুকণ্ঠে জানতে চান, দুই পদ থেকেই ইস্তফা কি না। জবাব আসে, 'না স্যার, শুধু প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে।' তিনি কাগজে সই করেন। এরপর দেশে জরুরি অবস্থা জারিসংক্রান্ত কাগজ এগিয়ে দেওয়া হয়, তাতেও তিনি সই করেন। সর্বশেষ তাঁর হাতে দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে জাতির উদ্দেশে দেওয়ার জন্য তৈরি করা ভাষণের খসড়া।

সেটা পড়তে গিয়ে এক জায়গায় তিনি থেমে যান এবং বলেন, এই অংশটুকু বাদ দিলে হয় না? যেখানে লেখা ছিল, দেশ বিগত পাঁচ বছর কীভাবে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তার বিবরণ। সেনা কর্মকর্তারা তাঁর কথা মেনে নেন। আর এভাবেই এক ঘণ্টা ধরে বঙ্গভবনে কেটেছে 'ওয়ান-ইলেভেনের' পটপরিবর্তনের চূড়ান্ত ক্ষণগুলো।

বিকেল চারটার দিকে বঙ্গভবন থেকে বের হন তিন বাহিনীর প্রধানেরা এবং সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার। প্রায় ওই সময়ে বঙ্গভবনে ঢোকেন নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও একজন উর্ধ্বতন গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবং তাঁদের সঙ্গে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একদল সেনাসদস্য। তাঁরা যাওয়ার পর পাল্টে যায় বঙ্গভবনের চেনা পরিবেশ। তাঁদের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের ক্যামেরা-ক্রুরা গিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ধারণ করেন। ওই সেনা কর্মকর্তারা বঙ্গভবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেন। সারা দেশে সেনা মোতায়েন ও টহল শুরু করা হয়। অভ্যুত্থানকারীরা তখনও জানেন না, সরকার চালাবে কারা। টিপু সুলতানের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় :

> ওদিকে তখন নীতিনির্ধারকেরা ব্যস্ত পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের খোঁজে। রাত ১১টার দিকে দুই উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা যান নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বাসায়। তিনি দায়িত্ব নিতে অপারগতা জানান। তারপর রাত ১২টার দিকে তাঁরা হাজির হন ড. ফখরুদ্দীনের বাসায়। ফখরুদ্দীন আহমদ এতে সম্মত হন। আর এভাবে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি পরিবর্তনের ঘটনা 'ওয়ান-ইলেভেন' নামে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্থান করে নেয়।[৩৭]

সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ লে. জেনারেল মইন ইউ আহমেদ (পরে জেনারেল) ১১ জানুয়ারির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, দেশের বাইরে ও ভেতর থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া স্থগিত করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তাঁর ওপর 'প্রচণ্ড চাপ' সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> ১১ জানুয়ারি খুব ভোরে উঠে ফজরের নামায পড়ে...মোনাজাত শেষ করে আমি অফিসের সময় শুরু হওয়ার আগেই অফিসে চলে এলাম। প্রথমে খবর ও পরে জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে টেলিফোন পেলাম। আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মি. গুইহিনো কোনোরকম ভনিতা না করেই জানালো, সব দলের অংশগ্রহণ ব্যতীত নির্বাচন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এরকম একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যদি ভূমিকা রাখে তাহলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে। অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের ব্যাপারে জাতিসংঘের এরূপ কঠোর হুঁশিয়ারির পর আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এমন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা আন্তর্জাতিক

অঙ্গনেও সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তিকে বিতর্কিত করে তুলবে। আমার মনে হলো ১৯৯০ সালের পর থেকে অদ্যাবধি সেনাবাহিনী দেশে ও বিদেশে তিল তিল করে যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে তা এখন ধুলোয় মিশে যাওয়ার উপক্রম। শুধু তাই নয়, এর ফলে দেশে যে অচিন্তনীয় এক গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হবে তার দায়ভারও আমাদের নিতে হবে। আমি সেনাপ্রধান হিসেবে কিছুতেই এ পরিস্থিতি মেনে নিতে পারছিলাম না।

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও জাতিসংঘের মনোভাব নিয়ে আমি নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধানের সাথেও কথা বললাম। তারাও সবাই একমত হলো...। আমরা প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলার সময় চাইলাম।...ঠিক হলো আমরা তিন বাহিনীর প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পিএসও এবং ডিজিএফআইয়ের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বারী (ডিজি, ডিজিএফআই তখন একটি সরকারি সফরে বিদেশে অবস্থান করছিল) এক সাথে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলবো।[৩৮]

জেনারেল মইন ও অন্যরা বেলা দুইটায় বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওনা হন। বিকেল চারটায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। সিদ্ধান্ত হলো তিনি উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙে দেবেন, প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করবেন এবং রাত এগারোটা থেকে সান্ধ্য আইন জারি করা হবে। তাঁরা বঙ্গভবন ছেড়ে আসার পর জরুরি অবস্থাসংবলিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।[৩৯]

এক-এগারোর পালাবদলটি জনসমক্ষে সেনা-অভ্যুত্থান হিসেবে তেমন প্রচার পায়নি। যদিও ফখরুদ্দীন আহমদের সরকারকে 'সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার' হিসেবে গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়। এই অভ্যুত্থানটির পরিকল্পনা হচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের মাধ্যমে 'সেনা-সমর্থিত' এই সরকার প্রথম দিকে ব্যাপক জনসমর্থন পায়। যাঁরা ওই সময় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন সমাজের উঁচু তলার রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ী। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জিহাদ মুখ থুবড়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নানা জায়গায় জোর করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ ওঠে।

এই অভ্যুত্থানের প্রধান শিকার ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া স্বয়ং। তাঁর সাজানো বাগান তছনছ হয়ে যায় কয়েকজনের হাতে, যাদের তিনি তাঁর প্রতি অনুগত মনে করতেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, সেনাবাহিনীর স্বাভাবিক প্রথা ভেঙে মেজর জেনারেল জামিল ডি আহসানকে ডিঙিয়ে তিনি অপেক্ষাকৃত জুনিয়র মইন ইউ আহমেদকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেছিলেন। জেনারেল জামিল বীর প্রতীক ছিলেন শেষ মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা। বঙ্গভবনে অভ্যুত্থানের মূল কুশীলব ছিলেন রক্ষীবাহিনী থেকে সেনাবাহিনীতে আসা চাকরিরত শেষ কর্মকর্তা মেজর জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরী। মইন ছিলেন খালেদা জিয়ার ভাই মেজর

(অব.) সাঈদ ইস্কান্দারের কোর্সমেট এবং মাসুদউদ্দিন হলেন সাঈদের ভায়রা ভাই। খালেদা জিয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকায় সাঈদের পক্ষে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ-বদলির ব্যাপারে নাক গলানো সহজ ছিল। মেজর জেনারেল ফাতমী এক নাগাড়ে পাঁচ বছর এসএসএফের মহাপরিচালক ছিলেন। তাঁরা সবাই দৃশ্যপট থেকে খালেদা জিয়াকে সরানোর ব্যাপারে একজোট হয়েছিলেন।[৪০]

এক-এগারো ছিল নাটকীয়তায় ঠাসা। ওই দিনের ঘটনার অন্য রকম একটা বিবরণ পাওয়া যায় পুলিশের তৎকালীন আইজিপি (মহাপুলিশ পরিদর্শক) খোদা বখশ চৌধুরীর কাছ থেকে, যাঁকে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইজিপি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল বিএনপি সরকারের রেখে যাওয়া পুলিশপ্রধানকে পরিবর্তন করে :

> আওয়ামী লীগ নির্বাচন থেকে উইথড্র করার ঘোষণা দিল। রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সঙ্গে একটা মিটিং ছিল। বেলা একটার দিকে অফিসে ফিরলাম। বেলা দুইটার পর ডিজিএফআইয়ের প্রধানের অস্থায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার বারীর ফোন, ইমপেসেন্ট কল, 'আপনি কোথায়? তাড়াতাড়ি বঙ্গভবনে আসেন।' গেলাম বঙ্গভবনে। খোঁজ করলাম মহামান্য কোথায়। রাষ্ট্রপতিকে সবাই এই সংক্ষিপ্ত নামেই সম্বোধন করত।
>
> দেখলাম জেনারেল মইনের নেতৃত্বে সবাই দরবার হলের পর বঙ্গভবনের সবচেয়ে পেছনের করিডর দিয়ে বেরিয়ে আসছে—এয়ার চিফ ফখরুল, নেভির চিফ, ডিজিএফআইয়ের বারী এবং আরও কয়েকজন।
>
> আমি জেনারেলের মুখোমুখি হয়ে সম্ভাষণ করলাম। তিনি বললেন, 'আসেন।' ফখরুল চোখের ইশারায় কী যেন বলতে চাইলেন। মইন বললেন, 'আমরা হেডকোয়ার্টারে যাব। একটু তাড়াতাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।' বঙ্গভবনে গাড়ি পার্কিংয়ে আসার পর দেখলাম এসএসএফ চিফ ফাতমী রুমি আসছেন। মইন এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন।
>
> ক্যান্টনমেন্ট সেনাসদরে গেলাম। একের পর এক জেনারেলেরা আসছে। সন্ধ্যা হয়ে গেল। অল জেনারেলস, সিভিলিয়ান মাত্র দুজন—আমি আর র‍্যাবের মিজানুর রহমান।
>
> মইন সিচুয়েশন ব্যাখ্যা করলেন, 'জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এখানে যদি গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও শান্তিশৃঙ্খলা না থাকে, শান্তিরক্ষা মিশন থেকে আমাদের সব ফোর্স ফেরত পাঠাবে।' আমাকে বললেন, 'যদি আপনার পুলিশকে ফেরত পাঠায়, আপনি কী জবাব দেবেন? ক্যান ইউ একসেপ্ট ইট? আমি কি আমার সেনাদের বোঝাতে পারব? রেনাটা লক (জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী) দুপুরে আমার সঙ্গে দেখা করে এই চিঠি দিয়ে গেছে।' মইনের হাতে একটা চিঠি দেখলাম। আমার কী করার ছিল। অলরেডি রেজিম

চেইঞ্জ ইজ কমপ্লিট। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চিফ অ্যাডভাইজর হ্যাজ অ্যাগ্রিড টু রিজাইন। মইনের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা।

পরে জেনেছিলাম, চিঠির বিষয়টা ছিল ভুয়া। আমি তখন আফগানিস্তানে জাতিসংঘ মিশনে সিনিয়র পুলিশ অ্যাডভাইজর। ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি ছিলেন মনোজ বাসনিয়াত, নেপালি-আমেরিকান। এক-এগারোর সময় ঢাকায় ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর ছিলেন। জাতিসংঘের কথিত চিঠির প্রসঙ্গ আসতেই তিনি জানালেন, 'ইউএন হেডকোয়ার্টার থেকে কথিত চিঠি পাঠানোর বিষয়টি ঠিক নয়। ইউএন থেকে এরকম চিঠি এলে তা আমার নজরে আসতই। তবে বিষয়টা আমি শুনেছিলাম। ব্রিটিশ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আর ইউএস অ্যাম্বাসেডরদের সঙ্গে কথা বলে মনে হলো চিঠির বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হোক, এটা তারা চায় না। বললেন, এই দুই মহিলা গণতন্ত্র এবং দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার পথে বাধা। তাদের ভাবখানা অনেকটা এরকম, এদের সরিয়ে দিতে পারলেই মিল্ক অ্যান্ড হানি উইল ফ্লো।[৪১]

২০১০ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার *দ্য ডেইলি স্টার*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রেনাটা লক জাতিসংঘের কথিত চিঠির বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জাতিসংঘ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কখনোই হস্তক্ষেপ করেনি। জাতিসংঘ চেয়েছিল একটা অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হোক।

বিএনপি দল হিসেবে ক্ষমতায় কিংবা তাঁদের পছন্দের রাষ্ট্রপতি ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও এ দেশে তিন-তিনবার সেনা-অভ্যুত্থান হয়েছে। প্রথমটি হয়েছিল ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারের সরকার উৎখাতের মধ্য দিয়ে। এই অভ্যুত্থানের নেতা লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে সেনাপ্রধান বানিয়েছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান এবং বিচারপতি সাত্তার তাঁর কার্যকালের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরশাদ ছিলেন সফল অভ্যুত্থানকারী। দ্বিতীয় অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ছিল সেনাপ্রধান লে. জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিমের নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। ওই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তৃতীয়টি ঘটে লে. জেনারেল মইন ইউ আহমেদের নেতৃত্বে এবং তা সফল হয়। এই তিনটি সেনা-অভ্যুত্থানের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অভ্যুত্থানকারীরা কেউই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেনাপ্রধান হননি। তিনবারই জ্যেষ্ঠতার ক্রম ডিঙিয়ে তাঁদের সেনাবাহিনীর চূড়ায় বসানো হয়েছিল। যদিও দুজন সফল হয়েছিলেন, একজন পারেননি। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, বিচারপতি সাত্তার ও অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ—এই দুজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তাঁরা সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস ১৯৯৬ সালের অভ্যুত্থানচেষ্টা বেশ কঠোরভাবেই দমন করেন। চোখ রাঙানিতে কোনো কাজ

হয়নি। আবদুর রহমান বিশ্বাস ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। যদিও তিনি এ দেশে রাজনীতিবিদ হিসেবে কখনোই তারকাখ্যাতি পাননি।

এই তিনটি সেনা-অভ্যুত্থানের পর্যালোচনা করলে মনে হবে, বিএনপির রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার কৌশলে নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি আছে। না হলে বারবার কেন এরকমটি ঘটবে। আর বিএনপি সরকারই বা কেন জ্যেষ্ঠতার স্বাভাবিক নিয়ম ভেঙে এমন সব 'পছন্দের লোককে' দায়িত্বে বসাবে, যারা তাদের পিঠে ছুরি মারবে।

যে ভুলের সূত্র ধরে ফখরুদ্দীনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সুযোগ তৈরি হয়, সেটাকে বিএনপি ভুল হিসেবে বুঝতেই পারেনি। ফলে বিএনপি ফখরুদ্দীন সরকারের বিরোধিতা করলেও শেখ হাসিনা এই সরকারকে তাঁদের 'আন্দোলনের ফসল' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে নতুন সরকারের প্রতি আস্থা জানিয়ে দেন। যেদিন ফখরুদ্দীন শপথ নেন, সেদিন আওয়ামী লীগের নেতারা বঙ্গভবনে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গভবনে অনেকেই বিএনপি নেতারা আসবেন বলে আশা করেছিলেন। সাবেক মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এবং ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। পথে তাঁরা একটা ফোন পান। তাঁদের বলা হয়, 'বঙ্গভবনে কি আর কখনো যাননি?' বার্তা বুঝতে পেরে তাঁরা বাসায় ফিরে যান। কেন তাঁদের এই ফোন করা হয়েছিল, এ নিয়ে বিএনপির ভেতরে নানা আলোচনা হয়েছে। জানা যায়, বিএনপির তখনকার থিংকট্যাংকের দুজন সদস্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে বলেছিলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে ক্যু হয়েছে, এখন আমাদের বঙ্গভবনে যাওয়া মানে ওই ক্যুকে সমর্থন করা।' অনেক পর্যবেক্ষক বলছেন, এটা ছিল একটা ভুল সিদ্ধান্ত। এর ফলে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রোষানলে পড়েছিল।[৪২]

১২ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফখরুদ্দীন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৩ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন নির্বাচনপ্রক্রিয়া স্থগিত করে। মহাজোট তাদের সব কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয়। ফখরুদ্দীন আহমদ ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, মেজর জেনারেল (অব.) আবদুল মতিন, মীর্জা আজিজুল ইসলাম, তপন চৌধুরী, গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী, আইয়ুব কাদরী, মেজর জেনারেল (অব.) ডা. মতিউর রহমান, আনোয়ারুল ইকবাল, ইফতেখার আহমদ চৌধুরী ও সি এস করিম।[৪৩]

১৪ জানুয়ারি *প্রথম আলোয়* এক মন্তব্য প্রতিবেদনে সম্পাদক মতিউর রহমান 'জাতীয় সংকটময় মুহূর্তে এগিয়ে আসার জন্য' প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে স্বাগত জানিয়ে সতর্ক করে বলেন, 'তিনি সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে,

কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলে আমরা দেশবাসীর কাছে তা জোরেশোরে তুলে ধরব এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাব।' নতুন উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকজনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রতিবেদনে প্রশ্ন তোলা হয়। 'মেজর জেনারেল (অব.) আবদুল মতিনকে কিছুতেই কোনো বিচারেই নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ বলা যায় না। বিএনপির সমর্থক হিসেবে তাঁর পরিচিতি রয়েছে।...অন্যদিকে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনও দৃশ্যত একটি দলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ।' বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয় :

> আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না সদ্য পদত্যাগী প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নির্লজ্জ পক্ষপাতদুষ্ট স্বৈরাচারী ভূমিকার কথা। প্রায় তিন মাস ধরে এ দায়িত্ব পালনকালে বিএনপি ও চারদলীয় জোটের সব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রায় সবকিছুই তিনি করেছেন। তিনি দেশকে আরও রক্তপাত ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। উপদেষ্টারা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নাগরিক সমাজ, জনসাধারণ—কারও কথাই তিনি শুনছিলেন না। জনমতকে তিনি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেননি। তিনি সবকিছু করছিলেন তাঁর 'ম্যাডাম'-এর নির্দেশমতো। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক যে, তিনি উপদেষ্টাদের কোনো কোনো প্রস্তাবে এমন কথাও বলেছেন, 'এটা করলে ম্যাডাম রাগ করবেন।' এভাবে চরম পক্ষপাতমূলক ও সুবিধাবাদী নীতি দ্বারা প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সব ন্যায়নীতিকে ভূলুণ্ঠিত করেছেন, যদিও নিজেকে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরপেক্ষ শিক্ষক' বলতে তাঁর বিবেকে বাধেনি। তিনি দেশ ও দেশের মানুষকে অপমানিত করেছেন, বিদেশিদের কাছে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন। তিনি যদি আরও কিছুদিন তাঁর ক্ষমতা ধরে রাখতেন তা হলে দেশে সংঘাত হতো, রক্তপাত বাড়ত। প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের পদত্যাগে জনগণ এই রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়েছে। জনমনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে। স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য খুলতে শুরু করেছে। জনজীবনে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসছে।
>
> বিগত পাঁচ বছর বিএনপি ও চারদলীয় জোট সরকারে থাকাকালে যেভাবে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেছে; প্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগ—সবকিছুকেই দলীয়করণ করেছে; প্রশাসনের সর্বত্র দুর্নীতির বিস্তার ঘটিয়েছে, তারই পরিণতিতে দেশে সর্বব্যাপী সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। আর এর পেছনে যাঁদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি, তাঁদের অন্যতম হলেন বেগম খালেদা জিয়া, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, মির্জা আব্বাস, তারেক রহমান, মোসাদ্দেক আলী ফালু, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ প্রমুখ। দেশের বর্তমান সমগ্র পরিস্থিতির জন্য মূলত তাঁরাই দায়ী থাকবেন। জোট সরকারের চরম দুর্নীতিগ্রস্ত ও দুর্বিনীত নেতৃত্ব গত পাঁচ বছর সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও অপশাসনের মাধ্যমে দেশকে ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। দেশবাসী এসব মনে রাখবে।

এ প্রসঙ্গে আমরা আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের ভূমিকার কথাও ভুলতে পারি না। গত পাঁচ বছর তারা হরতাল, অবরোধ, ভাঙচুর ও সংঘাতের মাধ্যমে দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। আওয়ামী লীগ ও মহাজোট নেতৃত্বের দুর্নীতি, নির্বাচন সামনে রেখে চরম সুবিধাবাদী ও অনৈতিক নীতি, মনোনয়ন ও দল কেনাবেচার যে নির্লজ্জ নিদর্শন তাঁরা দেখিয়েছেন, দেশবাসী সে কথাও মনে রাখবে। শেখ হাসিনা, স্বৈরাচারী এরশাদ, অলি আহমদ, শায়খুল হাদিস আজিজুল হক, সালমান এফ রহমান, শেখ হেলাল ও কাজী জাফর উল্যাহ—এই নেতাদের কাছ থেকে এখন দেশবাসীর বিশেষ কিছু আশা করার নেই।

প্রকৃতপক্ষে এই দুটি দল ও জোটের নেতারা দেশের সামনে তাঁদের কর্মকাণ্ডের যেসব নিদর্শন রেখেছেন, তাতে দেশবাসী তাঁদের কাছ থেকে দেশ ও জনগণের জন্য কোনো কল্যাণ আশা করতে পারে না। এই রাহুগ্রস্ত রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি থেকে জনগণ মুক্তি চায়।

আমরা আরও দেখলাম, চারদলীয় জোটের নেতারা নতুন প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে আকস্মিকভাবে বিএনপি-জামায়াতের সাজানো বাগান ভেঙে পড়ে। তাই তাঁরা শপথ অনুষ্ঠানে যাননি। যেন তাঁদের স্বর্গ থেকে পতন হয়েছে। তবে আবার তাঁরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবেন নিশ্চয়ই।

অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিনের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে জনমনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসার পাশাপাশি ভালো কিছু উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া আমাদের মধ্যে বেশ কিছুটা হতাশা সৃষ্টি করেছে।[৪৪]

গণমাধ্যমে ফখরুদ্দীনের সরকারকে 'সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার' নামে উল্লেখ করা হয়। ২১ জানুয়ারি প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজ পদত্যাগ করেন।

৩১ জানুয়ারি (২০০৭) নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। ওই দিন ভারতের নয়াদিল্লিতে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট প্রাঙ্গণে এক সংবাদ সম্মেলনে নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'আমি রাজনীতিতে স্বস্তিবোধ করি না। তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি বাধ্য করলে রাজনীতিতে যোগ দেব। আমি রাষ্ট্রপতি হতে চাই না। কারণ, এটা হচ্ছে আলংকারিক পদ। আমি কাজের মধ্যে বেঁচে আছি।'[৪৫]

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এক-এগারোর পটভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০০৬

সালের গোড়ার দিকে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য 'সৎ প্রার্থী' খোঁজার প্রচারাভিযান শুরু করেছিলেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর উদ্যোগে ২০ মার্চ ২০০৬ ঢাকার শেরাটন হোটেলের বলরুমে আয়োজিত এক নাগরিক সমাবেশে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ নিয়ে আলোচনা হয়। সমাবেশে মূল বক্তব্য দেন প্রধান অতিথি সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। সিপিডির সভাপতি অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস দিকনির্দেশনামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধে তিনি 'যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন'-এর কথা বলেন। সমাবেশে আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ, আওয়ামী লীগের নেতা মতিয়া চৌধুরী, *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান এবং *ডেইলি স্টার*-এর সম্পাদক মাহফুজ আনামও বক্তৃতা দেন। সভার শেষে একটা নাগরিক কমিটি তৈরি হয়। এর আহ্বায়ক হন অধ্যাপক রেহমান সোবহান। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে কমিটির সদস্যসচিব করা হয়। এটা ছিল সিপিডি, *প্রথম আলো* ও *ডেইলি স্টার*-এর একটা যৌথ উদ্যোগ। নাগরিক কমিটির ব্যানারে বিভিন্ন জেলায় নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। নাগরিক কমিটির মূল ভাবনা ছিল আসন্ন নির্বাচনে যাতে 'সৎ ও যোগ্য' প্রার্থীরা অংশ নেওয়ার সুযোগ পান তার জন্য পরিবেশ তৈরি করা।[৪৬]

৯ ডিসেম্বর ২০০৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নাগরিক কমিটির ব্যানারে 'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ' নামে একটা সভা হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিল সিপিডি, *প্রথম আলো, ডেইলি স্টার* ও চ্যানেল আই। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় অতিথি বক্তা ছিলেন বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এবং সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আকবর আলি খান।[৪৭]

২০০৬ সালের শেষের দিকে অধ্যাপক ইউনূস রাজনীতিতে আসার ইচ্ছা জানান।[৪৮] ২০০৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার *ডেইলি স্টার*-এ তাঁর একটা 'খোলা চিঠি' ছাপা হয়। ওই চিঠিতে তিনি রাজনৈতিক সদিচ্ছা, উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটা রাজনৈতিক দল তৈরির কথা জানান। তিনি এ ব্যাপারে সব নাগরিকের পরামর্শ চান।[৪৯] ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি 'নাগরিক শক্তি' নামে একটি দল তৈরির ঘোষণা দেন।[৫০] তাঁর এই উদ্যোগের পেছনে সামরিক বাহিনীর সমর্থন আছে বলে গুঞ্জন ছিল।[৫১] অধ্যাপক ইউনূস শেখ হাসিনার

তোপের মুখে পড়েন। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ইউনূসের নাম উচ্চারণ না করে তিনি বলেন, ঘুষখোরের সঙ্গে সুদখোরের কোনো পার্থক্য নেই। গ্রামীণ ব্যাংকের 'সুদ' নেওয়ার প্রসঙ্গ টেনেই তিনি কথাটি বলেছিলেন। স্পষ্টতই তিনি ইউনূসের মধ্যে একজন পরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর ছায়া দেখেছিলেন। হাসিনা আরও বলেছিলেন, 'যারা রাজনীতিকে ঘেন্না করে, তারাও এখন রাজনীতি করতে চায়।'[৫২] ৩ মে অধ্যাপক ইউনূস তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করেন এবং এর পরপরই জানিয়ে দেন যে, কোনো রাজনৈতিক দল তৈরি করার ইচ্ছা তাঁর আর নেই।[৫৩]

৪ ফেব্রুয়ারি (২০০৭) ১৫ জন সাবেক মন্ত্রী ও সাংসদ গ্রেপ্তার হন। এঁদের সবার বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, মো. নাসিম, সাকা চৌধুরী, সালমান এফ রহমান, মীর নাসির, মহীউদ্দীন খান আলমগীর, ইকবাল মাহমুদ, মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী, মোসাদ্দেক হোসেন ফালু, ওয়াদুদ ভূঁইয়া, আমানুল্লাহ আমান, মোস্তফা কামাল, নাসের রহমান ও পঙ্কজ দেবনাথ। ১৩ ফেব্রুয়ারি মওদুদ আহমদ গ্রেপ্তার হন। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় তিন কোটি টাকার চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেন ওয়েস্টমন্ট বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম ফারুক।[৫৪]

২০০৭ সালের ১৬ জুলাই শেখ হাসিনা গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে তিন কোটি টাকা চাঁদা আদায়সহ ১১টি মামলা হয়। ৩০ জুলাই হাইকোর্টে তিনি জামিন পেলেও আরেক মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।[৫৫]

দুর্নীতির অভিযোগে খালেদা জিয়ার দুই ছেলে তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান গ্রেপ্তার হন। বিএনপির মধ্যে চেয়ারপারসনের সমালোচনা হতে থাকে। দলের অনেক নেতা বিএনপিকে আরও 'গণতন্ত্রমুখী' করার দাবি জানান।

সংস্কারপন্থীদের উত্থান

দলের অনেক নেতা ওই সময় মন খুলে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, খালেদা জিয়ার রাজনীতি বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে যে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অন্য নেতাদের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। দলের ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি ও ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা ২০০৭ সালের ১০ মে এটিএন বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা বাড়ানো, রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেওয়া এবং ২২ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনের পথে এগোনোর কারণেই দেশে

আজ এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।' সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের মন্তব্য ছিল, 'বিচারপতি মাহমুদুল আমিনের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টা করা ছিল মারাত্মক ভুল।' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিচারপতি হাসান অপারগতা জানানোর পর পরবর্তী বিকল্প ছিলেন বিচারপতি মাহমুদুল আমিন। ১২ মে বিএনপির নেতা লে. জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান স্পষ্ট উচ্চারণেই বলেন, 'ওয়ান-ইলেভেন-পরবর্তী বাংলাদেশ আগের চেয়ে আলাদা, সংস্কার আজ সময়ের দাবি।' ২৫ মে এক সাক্ষাৎকারে সাবেক স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী বলেন, 'বিএনপিতে খালেদা ও তারেকের দ্বৈত নেতৃত্বে সমস্যা হয়েছিল।' ৯ জুন বিবিসি সংলাপে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও মাহবুবুর রহমান বলেন, 'প্রয়োজন হলে দুই নেত্রীকে (খালেদা ও হাসিনা) বাদ দিয়ে সংস্কার।' ২৫ জুন বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ১৫ দফা সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী বা দলের চেয়ারপারসন হওয়া যাবে না। ১ আগস্ট খালেদা জিয়া অভিযোগ করেন, মান্নান ভূঁইয়া একজন বামপন্থী নাস্তিক; তিনি পার্টিকে ভেঙে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন। ৩ সেপ্টেম্বর খালেদা জিয়া মান্নান ভূঁইয়াকে দল থেকে বহিষ্কার করেন এবং খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব দেন। ওই দিনই খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৫৬]

বিএনপির মধ্যে 'সংস্কারপন্থী' নেতার অভাব ছিল না। খালেদা জিয়া অবশ্য সবাইকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। তাঁর খড়্গটা শেষমেশ মান্নান ভূঁইয়ার ঘাড়ের ওপরই পড়ল। মান্নান ভূঁইয়া যত দিন বেঁচে ছিলেন, বিএনপিতে আর ফিরে আসতে পারেননি।

সংসদ ভবন চত্বরে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বাসভবন দুটিকে বিশেষ কারাগার হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দুই দলের দুই শীর্ষ নেত্রীকে সেখানে রাখা হয়। আটক অবস্থায় তারেক রহমান নির্যাতনের শিকার হন।

সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপির ওপরই বেশি খড়্গহস্ত ছিল বলে বিএনপি মনে করে। ওই অবস্থায় বিএনপিকে কঠিন সময় পার করতে হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৯০ দিন হলেও ফখরুদ্দীনের সেনা-সমর্থিত সরকার যে নির্বাচনের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবে না, এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা মইনুল হোসেন সাফ জানিয়ে দেন, 'আমরা আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোর মতো কেবল তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার সরকার নই। আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য রয়েছে। এই লক্ষ্য হলো, দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতি এবং সৎ লোকের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।'[৫৭]

খালেদা জিয়া গ্রেপ্তার হলেন, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭। আলোকচিত্র : মনিরুল আলম

এক-এগারোর সরকারের সঙ্গে কয়েকজন রাষ্ট্রদূত এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানের মাখামাখি কোনো গোপন ব্যাপার ছিল না। রাষ্ট্রদূতেরা এ দেশের রাজনীতি এবং আমজনতার মনস্তত্ত্ব বুঝতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। সরকার খোলাখুলিভাবেই 'মাইনাস টু' ফর্মুলার নামে খালেদা-হাসিনা দুজনকেই নির্বাসনে পাঠাতে চেয়েছিল। দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁরা নির্বাচিত হলেও একনায়কের মতো আচরণ করেন, দলে এবং দেশে গণতন্ত্রের চর্চা নেই এবং দুই দলই দুর্নীতিবাজে ঠাসা। রাজনীতিতে

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার মিশনে শামিল হয়ে রাষ্ট্রদূতেরা তাঁদের সীমানার বাইরে পা রেখেছিলেন। মাইনাস টু ফর্মুলাটি হোঁচট খায় যখন রাজনীতিতে একেবারেই পরিত্যক্ত ফেরদৌস আহমদ কোরেশীকে দিয়ে একটা 'কিংস পার্টি' বা পছন্দের দল বানানোর চেষ্টা চলে। ২২ জুন ২০০৭ কোরেশীর নেতৃত্বে প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক পার্টি তৈরি হয়। জেনারেল মইন নিজেকে এই দলের সঙ্গে জড়াননি।[৫৮] আন্তর্জাতিক সমর্থনও পাওয়া যায়নি। পশ্চিমের শক্তিধর দেশগুলো প্রলম্বিত সেনাশাসন চায়নি। ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের উপপ্রধান গীতা পাসি কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ করার সময় বলেছিলেন, 'আমরা এই

বিএনপির সংস্কারপন্থী নেতা মাহবুবুর রহমানের ওপর খালেদা জিয়ার অনুগত কর্মীদের হামলা।

অঞ্চলে আর একজন পারভেজ মোশাররফ (পাকিস্তানের সাবেক সেনাশাসক) তৈরি হোক, তা চাই না।[৫৯] বছর না ঘুরতেই সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করার পথে হাঁটতে শুরু করে। সরকারের উপলব্ধি হলো, 'এই দুই মহিলার' নেতৃত্বে দুই দলের পেছনে দেশের ন্যূনতম শতকরা ৬০ ভাগ মানুষের সমর্থন আছে এবং তাঁদের কোনো গ্রহণযোগ্য বিকল্প তৈরি হয়নি।

প্রায় ১১ মাস আটক থাকার পর শেখ হাসিনা ১১ জুন (২০০৮) চিকিৎসার জন্য আট সপ্তাহের জামিন পান। এক বছর সাত দিন কারাবাসের পর ১১ সেপ্টেম্বর খালেদা জিয়া জামিনে ছাড়া পান। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, তারেক তিন বছর কোনো রাজনীতি করবে না। আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে প্যারোলে ছাড়া পেয়ে তারেক রহমান চিকিৎসার জন্য লন্ডন চলে যান।[৬০]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইতিমধ্যে মন ঠিক করে ফেলেছে যে তারা আর বেশি দিন দেশ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে না। যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই ছাড়া পান। প্রবাসীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্থায়ী সমাধান নয়, নির্বাচিত সরকারের দেশ চালানো উচিত। বিচার বিভাগ স্বাধীন বলেই অনেকে জামিন পাচ্ছেন।'[৬১]

নির্বাচন ২০০৮

পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আনে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন। আটটি বিষয়ে প্রত্যেক প্রার্থীকে ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার বিধান রাখা হয়। নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ অন্য দুটো অর্জন হলো যথাসম্ভব নির্ভুল একটা ভোটার তালিকা তৈরি এবং ভোটারদের পরিচয়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ২ নভেম্বর (২০০৮) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, ভোটগ্রহণ হবে ২৯ ডিসেম্বর (২০০৮)। পাঁচ মাস যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার পর ৬ নভেম্বর শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন এবং নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন হতে হবে বলে দাবি জানান। ১৮ নভেম্বর আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করার ঘোষণা দেয়। জাতীয় পার্টিকে ৫০টি আসনে 'মহাজোটের' পক্ষ থেকে একক প্রার্থী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন শেখ হাসিনা।[৬২]

২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপির যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না। দলটি নির্বাচনে যাবে কি যাবে না, এ নিয়ে কালক্ষেপণ করেছে। দৈনিক *মানবজমিন*-এ প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণে বলা হয় :

২০০৬ সালে আওয়ামী লীগ যে কৌশলটি নিয়েছিল, তা থেকে কোনো শিক্ষাই নিতে পারেনি বিএনপি। আবার ২০০৮ সালের নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন তৎকালীন মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। নির্বাচনের পাঁচ দিন আগে বিএনপির আরেক নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বরাত দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টির এক তারবার্তায় দেখা যায়, বিএনপির নেতারা অভিযোগ করছেন, এ নির্বাচনে ভোটে নয়, সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পছন্দের ব্যক্তিদের জয়ী করানো হবে। সে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টির চেয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিএনপিকে দুর্বল করেছিল। কারণ, বিএনপি শেষ মুহূর্তে অপ্রস্তুত অবস্থায় সাড়া দিয়েছিল।[৬৩]

রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে সারা দেশে ২ হাজার ৪৬০ জন প্রার্থী সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেন। নির্বাচন কমিশন ৫৫৭টি মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেয়। এর মধ্যে ৯৩ জন আপিল করায় তাঁদের প্রার্থিতা বহাল থাকে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন ৬০০ জনের বেশি।[৬৪]

১৩ ডিসেম্বর বিএনপি ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। দলের মূল স্লোগান ছিল—'দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও'।[৬৫] ১৭ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ 'দিন বদলের সনদ' শিরোনামে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে।[৬৬]

২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন। নির্বাচনে ৪-দলীয় জোটের ভরাডুবি হয়। জোটের প্রার্থীরা ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৩৩টি আসনে জয়ী হন। শতকরা ৩৩ দশমিক ২ ভাগ ভোট পেলেও বিএনপির কপালে জোটে মাত্র ৩০টি আসন। জামায়াত দুটি এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) একটি আসন পায়। জোটের অন্যতম শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের ঝুলি শূন্য পড়ে থাকে। অন্যদিকে মহাজোটের ভূমিধস জয় হয়। তারা সবাই মিলে ২৬২টি আসনে জয়ী হয়। শতকরা ৪৯ ভাগ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৩০টি আসন পায়। জাতীয় পার্টির (এরশাদ) প্রার্থীরা ২৭টি আসনে জয়ী হন। জোটের ছোট শরিক জাসদ (ইনু) তিনটি এবং ওয়ার্কার্স পার্টি দুটি আসনে জেতে। এই নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পাঁচটি আসনে জয়ী হন। ১৯৭৩-পরবর্তী সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে নির্বাচনে এত বড় ব্যবধানে জয়-পরাজয় আর নির্ধারিত হয়নি।[৬৭]

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। খালেদা জিয়া যথারীতি বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের উপনেতা জিল্লুর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।[৬৮]
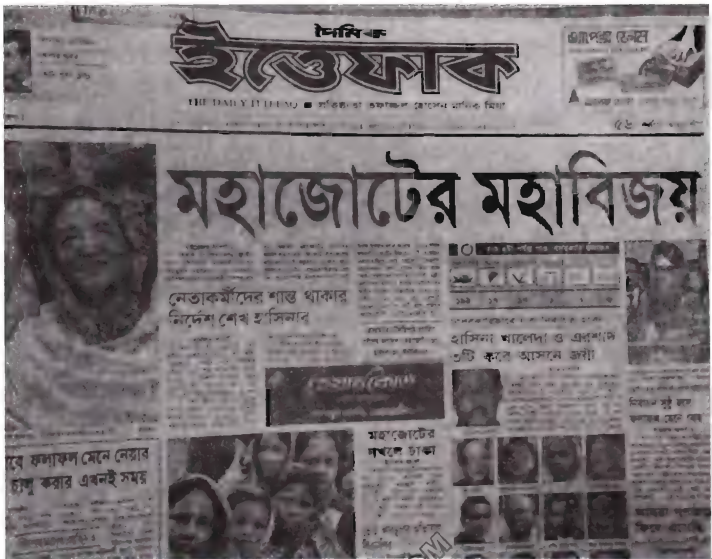
গণমাধ্যমে নির্বাচন ২০০৮-এর ফলাফল

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল

রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের প্রতি আস্থা না থাকার কারণেই ১৯৯৬ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালু হয়েছিল। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য ক্ষমতাসীন দল সব সময়ই নানা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়ার কারণে কোনো দলের পক্ষেই পরপর দুবার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা। জনমনে একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে যে এই ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন হলে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। হঠাৎ করেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা হোঁচট খেল। ২০১১ সালের ১০ মে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অবৈধ বলে রায় দেন। রায়ে অবশ্য মন্তব্য করা হয়, পরবর্তী দুটি সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে। তবে এতে প্রধান বিচারপতিকে না জড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।[৬৯]

আপিল বিভাগের এই রায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের জন্য ছিল বেশ সুবিধাজনক। ৩১ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়ে দেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রাখার আর সুযোগ নেই। ওয়েস্টমিনস্টার-ব্যবস্থায় যেভাবে নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ শেষ হয়, সেভাবেই দেশ চলবে।'[৭০]

আপিল বিভাগের রায় এবং শেখ হাসিনার মন্তব্যে বিএনপি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ৪ জুন এক সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া বলেন, 'আদালতের রায় মানা সংসদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হলে টানা আন্দোলন। খায়রুল হক (প্রধান বিচারপতি) নিরপেক্ষ নন।'[৭১]

৩০ জুন (২০১১) জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে ৫-৬ জুলাই বিএনপির আহ্বানে ৪৮ ঘণ্টার হরতাল হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচনকালীন সরকারের প্রস্তাব দেওয়া হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে বহাল রেখে বিরোধী দল থেকে সমানসংখ্যক সদস্য নিয়ে নির্বাচনকালীন অস্থায়ী মন্ত্রিসভার প্রস্তাবটি বিএনপি নাকচ করে দেয়। খালেদা জিয়া সাফ জানিয়ে দেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অধীনে বিএনপি নির্বাচনে যাবে না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার পক্ষে প্রবল জনমত থাকা সত্ত্বেও জাতীয় সংসদে একচেটিয়া আধিপত্য থাকার কারণে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। *প্রথম আলোর* উদ্যোগে ওআরজি-কোয়েস্ট রিসার্চ লিমিটেড পরিচালিত ২০১১ সালে এক জনমত জরিপে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার পক্ষে শতকরা ৭৩ ভাগ ভোট পড়েছিল। তাদের করা বিভিন্ন সময়ের জরিপে দেখা যায়, ২০১২ সালে ৭৬ শতাংশ, ২০১৩ সালের এপ্রিলে ৯০ শতাংশ এবং একই বছর অক্টোবরে ৮২ শতাংশ উত্তরদাতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। *ডেইলি স্টার* এবং এশিয়া ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ২০১৩ সালের অক্টোবরের জনমত জরিপে শতকরা ৭৭ ভাগ উত্তরদাতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে মত দেন।[৭২]

জাতীয় সংসদে পুরোনো নাটকের নতুন মঞ্চায়ন শুরু হয়। বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট নানা ছুতানাতায় সংসদ অধিবেশন বর্জন করতে থাকে। রাজনীতি তারা সংসদ থেকে নিয়ে যায় রাজপথে, যখন-তখন হরতাল ডাকা শুরু হয়।

২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল বিএনপির নেতৃত্বে ৪-দলীয় জোট সম্প্রসারিত হয়ে ১৮-দলীয় জোট হয়। এই জোটে বিএনপির সঙ্গে থাকে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, বিজেপি, খেলাফত মজলিস, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি,

ন্যাশনাল পিপলস পার্টি, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাপ, মুসলিম লীগ, ইসলামিক পার্টি, ন্যাপ (ভাসানী), ডেমোক্রেটিক লীগ ও পিপলস লীগ।[৭৩]

এই জোটের অনেক দলই ছিল একেবারেই অপরিচিত, সাইনবোর্ড-সর্বস্ব। শুধু সংখ্যা বাড়ানোই ছিল প্রধান লক্ষ্য। জোটের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা থাকে দৃশ্যমান।

যুদ্ধাপরাধের বিচার

মহাজোট সরকার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০১০ সালের ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠন করে। শুরু হয় ১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার-প্রক্রিয়া। জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ কয়েকজন নেতাকে 'যুদ্ধাপরাধে'র অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। বিএনপির কয়েকজন নেতাও একই অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং আবদুল আলীম। ২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত জামায়াতের নেতা আবদুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। আদালতের এই রায়ে অনেকেই অসন্তুষ্ট হন। রায় পুনর্বিবেচনা করে কাদের মোল্লার সর্বোচ্চ সাজা, অর্থাৎ ফাঁসির দাবিতে ব্লগার ও অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের একটি জোট ঢাকার শাহবাগ মোড়ে বিক্ষোভ-সমাবেশ শুরু করে। তাদের সমর্থনে সেখানে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হন। সব বয়সের নারী-পুরুষ-শিশু-যুবা-প্রবীণদের এক অনন্য সমাবেশ চলতে থাকে দিনের পর দিন। শাহবাগ মোড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সমাবেশ থেকে সব যুদ্ধাপরাধীর সর্বোচ্চ সাজা এবং জামায়াতে ইসলামীকে যুদ্ধাপরাধী দল হিসেবে নিষিদ্ধের দাবি ওঠে।

জামায়াতে ইসলামী বিএনপির বিশ্বস্ত মিত্র। সুতরাং শাহবাগের এই আন্দোলন ছিল বিএনপির জন্য অস্বস্তিকর। কিন্তু তারুণ্যের ক্ষোভকে এড়িয়ে যাওয়াও ছিল কঠিন। শাহবাগ আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রথম এক সপ্তাহ বিএনপি মুখ খোলেনি। ১১ ফেব্রুয়ারি (২০১৩) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিএনপি শাহবাগ আন্দোলন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বিএনপির অবস্থান বদলে যায়। ১২ ফেব্রুয়ারি বিএনপির স্থায়ী কমিটির এক বিবৃতিতে তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনকে স্বাগত জানানো হয়। বিবৃতিতে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে তরুণ প্রজন্ম বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।[৭৪]

দুই সপ্তাহের মাথায় এই আশাবাদের উত্তাপে জল ঢেলে দেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। ১ মার্চ এক সংবাদ সম্মেলনে শাহবাগ আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'একটি গোষ্ঠীকে সরকার উসকানিমূলক ও বেআইনি কর্মকাণ্ড সংগঠনে আশকারা ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তারা প্রতিনিয়ত ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে।'[৭৫] এর পর থেকে শাহবাগ আন্দোলন নিয়ে বিএনপির নেতাদের সমালোচনা ক্রমে বাড়তে থাকে। ১৫ মার্চ বিকেলে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার গোয়ালিমান্দ্রা কালীমন্দিরসংলগ্ন মাঠে এক জনসভায় খালেদা জিয়া শাহবাগের 'গণজাগরণ মঞ্চ'কে 'আওয়ামী লীগ ঘরানার ও নাস্তিকদের চত্বর' বলে উল্লেখ করেন। সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে খালেদা জিয়া আরও বলেন, 'এসব মঞ্চফঞ্চ বন্ধ করুন। তা না হলে জনগণ ঢাকার দিকে রওনা হবে। সেখানে গড়ে তুলবে জনগণের মঞ্চ।...মসজিদের গেট তালাবদ্ধ করে শাহবাগিদের পাহারা দেবেন, এটা হতে পারে না। এখনো সময় আছে, ঠিক হোন। জনগণ খেপে সারা দেশ থেকে ঢাকায় আসবে। আলাদা মঞ্চ তৈরি করবে। সেটাই হবে জনতার মঞ্চ।...এরা কেমন তরুণ যে শুধু তারা ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই দাবি করছে। অন্যদিকে দেশের এত সংকটের বিষয় নিয়ে কোনো কথাই বলছে না। তরুণেরা এমন হতে পারে না।'[৭৬]

এর কয়েক দিন আগে শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ব্লগার রাজীব হায়দার আততায়ীদের হাতে নিহত হন। রাজীব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে খালেদা জিয়া বলেন, 'ফেসবুক ও ব্লগে রাজীবের লেখায় ধর্মের এত অবমাননা করা হয়েছে, যা বলার মতো নয়।'[৭৭]

বিএনপি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে। এক জনসভায় খালেদা জিয়া যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতের নেতাদের 'রাজবন্দী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ১৮-দলীয় জোটের জনসভাগুলোতে জামায়াতের কর্মীদের বিপুল উপস্থিতি এবং জামায়াতের অভিযুক্ত নেতাদের মুক্তির দাবি জোরালো হতে থাকে। বিএনপি প্রকাশ্য বিবৃতি ও বক্তব্যে বারবার বলার চেষ্টা করে যে তারা যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিরুদ্ধে নয়; তবে বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় বিচার চলছে তা অস্বচ্ছ এবং রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক। যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে জামায়াতকে হয়রানি এবং প্রকারান্তরে বিএনপিকে কোণঠাসা করা হচ্ছে বলে বিএনপি অভিযোগ করে। প্রকাশ্যে জামায়াতের পক্ষ নেওয়ায় 'যুদ্ধাপরাধ' নিয়ে জামায়াতের এবং বিএনপির অবস্থান একাকার হয়ে যায়।

'শাহবাগ আন্দোলন' এবং যুদ্ধাপরাধের বিষয়ে বিএনপির অবস্থানকে আওয়ামী লীগ ও মিত্ররা যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর কৌশল বলে প্রচার করে। এর ফলে বিএনপি আত্মরক্ষামূলক পাল্টা কৌশল বেছে নেয়। বিএনপির নেতারা দাবি

করেন, তাঁরাও যুদ্ধাপরাধের বিচার চান। তবে প্রকৃত অপরাধীর বিচার করতে হবে এবং বিচার-প্রক্রিয়া হতে হবে 'স্বচ্ছ এবং আন্তর্জাতিক মানের'। কীভাবে এটা হবে, সে ব্যাখ্যা তাঁরা দেননি। তাঁদের আশঙ্কা হলো, এই বিচারের নামে সরকার জামায়াতের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট থেকে জামায়াতিদের বের করে নিয়ে আসতে চায়। সরকারের এই কৌশল যদি সফল হয়, তাহলে ভোটের সমীকরণে বিএনপি পিছিয়ে পড়বে। যুদ্ধাপরাধের বিচার-সম্পর্কিত ট্রাইব্যুনালের বিষয়ে বিএনপির অভিযোগ হলো, এই ট্রাইব্যুনাল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং সাক্ষীদের দিয়ে জোর করে 'মিথ্যা সাক্ষ্য' দেওয়ানো হচ্ছে।

বিএনপির আন্দোলন

বিএনপির পেছনে যথেষ্ট জনসমর্থন আছে। তারা দুবার (১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের হিসাব বাদ দিয়ে) নির্বাচিত হয়ে সংসদীয় সরকার গঠন করেছিল। বিএনপি মনে করে, বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে তাদের জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক মতলব থেকেই আরেক মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করেছে এবং এ কাজে তারা আদালতকে ব্যবহার করেছে। সুতরাং, বিএনপির সামনে এখন একটাই পথ খোলা আছে, 'আন্দোলনের' মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া।

ঠিক এ সময় বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবির্ভূত হলো 'হেফাজতে ইসলাম'। চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে এর উৎপত্তি। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও শিক্ষানীতিকে ইসলামবিরোধী আখ্যা দিয়ে তা বাতিলের দাবি তুলে ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি এই গোষ্ঠীর জন্ম। শাহবাগে যখন গণজাগরণ মঞ্চের বিক্ষোভ-সমাবেশ চলছে এবং ক্রমে সারা দেশে তা ছড়িয়ে পড়ছে, তখন হেফাজতে ইসলাম শাহবাগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ২০১৩ সালের ৬ এপ্রিল ঢাকার মতিঝিলে 'শাপলা চত্বরে' হেফাজতে ইসলামের এক সমাবেশে ১৩ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলোর অন্যতম ছিল, 'শাহবাগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নাস্তিক-মুরতাদ এবং প্রিয় নবীর (সা.) শানে কুৎসা রটনাকারী ব্লগার ও ইসলামবিদ্বেষীদের সব অপপ্রচার বন্ধসহ কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।'[৭৮] হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনে বিএনপি তথা ১৮-দলীয় জোট একটি সম্ভাব্য মিত্র পেয়ে যায় এবং এই সুযোগটি কবজা করার কৌশল নেয়।

হেফাজতে ইসলাম ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরে সমাবেশ ডাকে। এর আগের দিন, অর্থাৎ ৪ মে শাপলা চত্বরে ১৮-দলীয় জোট একটি সমাবেশ করে। নির্দলীয় সরকারের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য খালেদা জিয়া সরকারকে ৪৮ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেন। সমাবেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন :

> সরকারকে অনেক সময় দিয়েছি, ধৈর্য ধরেছি। হেফাজতের কর্মসূচি না থাকলে ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়ে রাজপথে অবস্থান করতাম।...কোনো ধানাইপানাই করবেন না। ৪৮ ঘণ্টা পর আর সমাবেশের পারমিশনের জন্য অপেক্ষা করব না। যেখানে পারব বসে পড়ব। আর জেল-জুলুম, নবীর (সা.) অবমাননা সহ্য করব না।
>
> ...(শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ করে) তিনি সৌদি আরবে গেলে জোব্বা পরেন, তজবি টিপেন আর ভারতে গেলে তিলক আঁকেন। তাঁর বেশভূষার ঠিক নেই। তাঁকে বিশ্বাস করা যায় না।...
>
> হেফাজতের কর্মসূচিতে বাধা দেবেন না। বাধা দিলে পরিণতি হবে ভয়াবহ। আলেমসমাজ পথে নেমেছে। শাহবাগের ধর্মদ্রোহীদের না সরালে এবার আর আলেমদের সরানোর চিন্তা করবেন না। এরপর আর তারা ফেরত যাবে না।[৭৯]

৫ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ হয় মতিঝিলের শাপলা চত্বরে। আশপাশের জায়গাগুলোতে দিনভর সহিংসতা চলে। গভীর রাতে পুলিশ সমাবেশকারীদের হটিয়ে দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তাদের এই অভিযানে একজন পুলিশসহ মোট ১১ জন নিহত হয়েছেন। মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' দাবি করে, পুলিশি অভিযানে ৬১ জন নিহত এবং অনেকে আহত হয়েছেন। সরকারের দাবির মুখেও তারা নিহতদের তালিকা সরবরাহ করেনি। ১৮-দলীয় জোট হেফাজতের সমাবেশে পুলিশের 'আক্রমণ'কে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার সঙ্গে তুলনা করে।[৮০] ধর্মীয় জঙ্গিবাদ উসকে দেওয়ার অভিযোগ এনে সরকার দিগন্ত টিভিসহ কয়েকটি গণমাধ্যমের প্রচার বন্ধ করে দেয়।

নির্বাচন ২০১৪

বিএনপির পক্ষে জনমত ঘুরে দাঁড়াতে বেশি সময় নেয়নি। ২০১০ সালের ১৭ জুন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত মেয়র প্রার্থী এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীকে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী মো. মনজুর আলম বিপুল ভোটে হারিয়ে দেন।

এ সময়ের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শেখ হাসিনার সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়ার ফোনালাপ। হাসিনা নিজেই ফোন করেছিলেন ২৬ অক্টোবর ২০১৩ বিকেলে। তিনি খালেদাকে ২৮ তারিখ গণভবনে আসার জন্য অনুরোধ

করেন কথাবার্তা বলার এবং একসঙ্গে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য। ওই সময় বিএনপির নেতৃত্বে ১৮-দলীয় জোটের তিন দিনব্যাপী হরতাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। ৩৭ মিনিটের ফোনালাপ জুড়ে ছিল অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ। দুই দলের মধ্যে যে তিক্ত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব ছিল তাঁদের দুজনের কথাবার্তায়। তাঁদের টেলিফোন সংলাপের শেষ পর্বটি ছিল এরকম :

> খালেদা : আপনি বলেন যে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে আপনি রাজি আছেন। তাহলে আমি কালকেই উইড্র করে দেব।...বসে ঠিক করব, কালকে হরতাল উইড্র হবে। আমরা কালকেই আপনার সঙ্গে আলোচনায় বসব। কোনো অসুবিধা নাই।
>
> হাসিনা : আপনি সর্বদলীয়টা মেনে নেন।
>
> খালেদা : না, সর্বদলীয় মানা যায় না।
>
> হাসিনা : কালকে আসেন, সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে।
>
> খালেদা : হরতাল প্রত্যাহার হবে না। ২৯ তারিখ ডেট দেন। আমরা আলোচনায় যাব।
>
> হাসিনা : আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি, আপনি আসুন।
>
> খালেদা : না, আমি যেতে পারব না। হরতালের মধ্যে আমি কোথাও যাই না।[৮১]

২০১১ সালের ৩১ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত প্রার্থী শামীম ওসমানকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে জয়ী হন আওয়ামী লীগেরই বিদ্রোহী প্রার্থী ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের এই ফলাফল ছিল আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার সূচক। ধারাবাহিকভাবেই এটা ঘটতে থাকে।

২০১৩ সালে পাঁচটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও গাজীপুর মহানগরের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮-দলীয় জোটের প্রার্থীরা সব কটি মেয়র এবং ১৭৩টি সাধারণ কাউন্সিলর পদের মধ্যে ১১৪টিতে জয়ী হন।[৮২] আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়, সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও আন্তরিক ছিল বলেই বিরোধী দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। বিএনপির পাল্টা যুক্তি ছিল, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরকার বদল হয় না; জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল সন্ত্রাস ও কারচুপি করে ফলাফল বদলে দেবে।

আওয়ামী লীগ সরকার যথাসময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এগোতে থাকে। ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয় নির্বাচন কমিশন। তফসিল ঘোষণার পর থেকেই ১৮-দলীয় জোট নির্বাচন

প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে পথে নামে। বিভিন্ন মেয়াদে সারা দেশে 'অবরোধ' কর্মসূচি চলে ২৬ দিন।[৮৩]

নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসে, দুই প্রধান দলের মধ্যে নির্বাচন কেমন ধরনের সরকারের অধীনে হবে, তা নিয়ে দূরত্ব এবং বিরোধ বাড়তে থাকে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সরকার নির্বাচন যথাসময়ে আয়োজন করবেই এবং বিএনপি তা প্রতিরোধ করবেই। এ সময় দুই দলের মধ্যে দূতিয়ালির দায়িত্ব নেয় জাতিসংঘ। জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রতিনিধি হিসেবে অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকো ঢাকায় আসেন এবং দুই দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন।

অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকোর উপস্থিতিতেই আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতারা অন্তত চারটি বিষয়ে একমত হয়েছিলেন। এগুলো হচ্ছে—১. বিরোধী নেতা-কর্মীদের মুক্তি, ২. মামলা প্রত্যাহার, ৩. বিরোধী দলগুলোর অফিস খুলে দেওয়া, ৪. সভা-সমাবেশের ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার। ১০ ডিসেম্বর (২০১৩) প্রথম দফা এবং ১১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফা বৈঠকে তারানকো এই চারটি পয়েন্টে ঐকমত্য দেখে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু ১১ ডিসেম্বর যখন বৈঠক প্রায় শেষের দিকে, তখন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনই নেওয়া যাবে না। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মুহূর্তেই তারানকোর মুখ অনেকটা মলিন হয়ে যায়। 'ওয়েল, আপনারা আবার বসে আলোচনা করুন' বলেই সভা ছেড়ে চলে যান তিনি। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম হতাশ হয়ে পড়েন। কারণ, তাঁর চেষ্টাতেই প্রাথমিক সাফল্য এসেছিল। মূল দুটো বিষয় : নির্বাচনের তফসিল পরিবর্তন ও নির্বাচনকালীন সরকারে কে থাকবেন, তা নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগেই এভাবে সংলাপের ভাগ্য ঝুলে যায়। ১৩ ডিসেম্বর আরেকবার বৈঠক হলেও সাফল্য আসেনি। দুদলের একাধিক সূত্রে জানা যায়, সরকার সামান্যতম ছাড় দিতে রাজি নয়। তারা পূর্বশর্ত দেয় হরতাল-অবরোধ প্রত্যাহার করলেই শুধু এসব দাবি বিবেচনা করা যেতে পারে। এ জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। বিএনপি তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত দিতে রাজি হয়নি। তারা বারবারই বলেছে, 'আপনারা আগে সংলাপের পরিবেশ তৈরি করুন। তারপর সবকিছুই হবে।' হরতাল-অবরোধ স্থগিত রাখতে বিএনপির তরফে ইতিবাচক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নেতা আমির হোসেন আমুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'কোনো অগ্রগতি হলে জানতে পারবেন।'[৮৪]

দেশের নাগরিক সমাজের কয়েকজন প্রতিনিধি একটা সমঝোতার পরিবেশ তৈরি করা এবং নির্বাচন স্থগিত করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা তাঁদের উদ্দেশে বলেন, 'এক-এগারোর কুশীলবেরা আবারও সক্রিয় হয়েছে।'[৮৫]

১৮-দলীয় জোট অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশব্যাপী অবরোধ ডেকেছিল। ২৯ ডিসেম্বর (২০১৩) খালেদা জিয়া দলীয় এক সমাবেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। খালেদা জিয়াকে পুলিশ সারা দিন তাঁর বাড়িতেই অবরুদ্ধ করে রাখে। গেটের সামনে বালুবোঝাই ট্রাক রেখে দেওয়া হয়। পরদিন পত্রিকার খবরে লেখা হয়, 'খালেদা জিয়ার বাইরে আসার সব পথ রুদ্ধ। সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে "অন্তরীণ" রাখতে সামান্য ফাঁকফোকরও রাখেননি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।'[৮৬]

গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'ট্রাকগুলো নষ্ট হয়ে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে।' র‍্যাব-১-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল কিসমত হায়াত সাংবাদিকদের জানান, 'নিরাপত্তাজনিত কারণে বিরোধী দলের নেতাকে বাসা থেকে বের হতে বাধা দেওয়া হয়েছে।' খালেদা জিয়া একপর্যায়ে বাসা থেকে বেরিয়ে গেটের সামনে আসেন। পুলিশকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন :

> এরা সব গোপালি। দেখব কার কত ক্ষমতা। যা করা হচ্ছে তার জন্য ভয়ংকর পরিণতি বরণ করতে হবে। গোপালগঞ্জ বলে কিছু থাকবে না। গোপালগঞ্জের নামই বদলে দেওয়া হবে।...এই সরকার অবৈধ সরকার, অগণতান্ত্রিক সরকার।...শেখ হাসিনা রক্তগঙ্গায় নৌকা ভাসিয়ে হাওয়া খেতে চান। এত হত্যা, জুলুমের পরিণাম হবে ভয়াবহ। চোখের পানি মুছতে মুছতে অন্ধ হয়ে যাবেন।[৮৭]

৩১ ডিসেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেড় ঘণ্টা বৈঠক করেন। এরপর এক লিখিত বিবৃতিতে তিনি বলেন :

> বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে 'জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য' একটি নির্বাচনের পথ বের করাই রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সবচেয়ে জরুরি বলে মনে করছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া বিরোধী দলকে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। এখনই সংলাপ শুরু করে বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ খোঁজা আরও জরুরি হয়ে পড়েছে।...
>
> গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সহিংসতা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা অগ্রহণযোগ্য। এটা এখনই থামাতে হবে।[৮৮]

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় 'পশ্চিমা বিশ্ব' হতাশ হয়। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি। শুধু ভুটান ও ভারত থেকে মোট চারজন পর্যবেক্ষক ঢাকায় আসেন।[৮৯]

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতি সহিংস হয়ে ওঠে। ২৬ নভেম্বর (২০১৩) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ৪ জানুয়ারি (২০১৪) পর্যন্ত ৪০ দিনে সহিংসতায় নিহত হন ১২৩ জন।[৭০]

এ সময় ১৮-দলীয় জোটের পরিধি আরেকটু বাড়ে। নির্বাচনে অংশ নেওয়া কিংবা না নেওয়া নিয়ে এরশাদ অনেক নাটক করেন। একদিন বিকেলে যদি বলেন 'নির্বাচন হবেই', তো পরদিন সকালেই বলেন 'একতরফা নির্বাচনে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না'। তাঁর মুখ বন্ধ করতে তাঁকে 'চিকিৎসার জন্য' ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের একটি কেবিনে রেখে দেওয়া হয়। তাঁর দলের সিনিয়র নেতা কাজী জাফর আহমদ 'বিদ্রোহ' করে খালেদার নেতৃত্বাধীন ১৮-দলীয় জোটে ঢুকে পড়েন। ১৪-দলীয় জোটের শরিক সাম্যবাদী দলেও ভাঙন ধরে। দলের একটা অংশ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন দেয়। ১৮-দলীয় জোটের ২০-দলীয় জোটে রূপান্তর ঘটে।

২০-দলীয় জোট ৪ জানুয়ারি থেকে ৪৮ ঘণ্টার হরতাল ডাকে। ৪ জানুয়ারি ১১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এগুলো ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার কথা ছিল। ঠাকুরগাঁওয়ে সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারকে কুপিয়ে খুন করা হয়। ২০০টি ভোটকেন্দ্রে হামলা চালিয়ে ব্যালট পেপার ছিনতাই করা হয়। *প্রথম আলোর* একটি সংবাদ মন্তব্যে বলা হয়:

প্রথম আলো

১১ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন

আতঙ্কের নির্বাচন আজ

গণমাধ্যমে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের দিন

'একতরফা' তকমার পাশাপাশি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইতিহাসের পাতায় প্রাণঘাতী নির্বাচন হিসেবেও চিহ্নিত হয়ে থাকবে।[৯১]

নির্ধারিত দিনে নির্বাচন হয়। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত ৪১টি দলের মধ্যে ১১টি দল নির্বাচনে অংশ নেয়। নির্বাচনের আগেই ১৫৩ জন প্রার্থী 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' নির্বাচিত হয়ে যান। সরকার গঠন করার জন্য এই সংখ্যাটিই যথেষ্ট ছিল। ৫ জানুয়ারি বাকি ১৪৭টি আসনে নির্বাচন হয়। আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৩৫টি আসন পায়। তার মধ্যে ১২৭ জনই ইতিমধ্যে 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' নির্বাচিত হয়েছিলেন। আদালতের নির্দেশে কুড়িগ্রামের একটি আসনে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। মহাজোটের মধ্যে সমঝোতা হলেও শরিকদের একে অন্যের বিরুদ্ধে অনেক জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জাতীয় পার্টির ভাগে পড়ে ৩৪টি আসন। ওয়ার্কার্স পার্টি ছয়টি এবং জাসদ পাঁচটি আসন পায়।

নির্বাচন সামনে রেখে আরেকবার বিএনপিকে ভাঙার চেষ্টা হয়েছিল। এর নাটের গুরু ছিলেন ক্রমশ দলে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যাওয়া বিএনপির নেতা ও সাবেক মন্ত্রী নাজমুল হুদা। বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনায় বসতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ এনে ২০১২ সালের ৬ জুন বিএনপি থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। নাজমুল হুদা বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) নামে নতুন একটি দল তৈরি করেন। তিনি নিজেই এর আহ্বায়ক হন এবং নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেন। বিএনএফের প্রধান সমন্বয়কারী আবুল কালাম আজাদ দলের আসল লক্ষ্য থেকে সরে এসে বিএনপি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে—১১ মার্চ (২০১৩) এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ তুলে হুদা বিএনএফ ছাড়ার এবং বিএনপি থেকে নির্বাচন করার ঘোষণা দেন। বিএনএফ ১০ অক্টোবর নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পায়।[৯২] দলটি নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'ধানের শীষ' বরাদ্দ পাওয়ার জন্য আবেদন করে। 'ধানের শীষ' বিএনপির প্রতীক। বিএনপি এটাকে দল ভাঙার চক্রান্ত মনে করে এবং এ জন্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে।

বিএনপি ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচন বর্জন করলেও বিএনএফ মাঠে থেকে যায়। এই দলের আবুল কালাম আজাদ ঢাকার একটি আসন থেকে জয়ী হন।

নির্বাচনের দিন নাশকতা ও সংঘর্ষে ১৩ জেলায় মোট ২২ জন নিহত হন।[৯৩] ২২টি কেন্দ্রে কোনো ভোট পড়েনি। নির্বাচন কমিশন জানায়, ভোটার উপস্থিতির হার ছিল শতকরা ৩৯ দশমিক ৮১ ভাগ। এক বিবৃতিতে খালেদা জিয়া নির্বাচন 'বর্জন' করার জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি 'প্রহসনের' নির্বাচন বাতিল করে সমঝোতায় আসার আহ্বান জানান। ৬ জানুয়ারি বিকেলে গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আগামী নির্বাচনের

জন্য ধৈর্য ধরতে হবে।...সহিংসতা পরিহার করুন, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গ ত্যাগ করুন।...যতক্ষণ পর্যন্ত জঙ্গিবাদী জামায়াত-শিবির বিএনপির ঘাড়ে চেপে থাকবে, ততক্ষণ তারা সুস্থ চিন্তাভাবনা করতে পারবে না। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।'[৯৪]

৫ জানুয়ারি (২০১৪) নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ না করা নিয়ে দলের ভেতরে এবং বাইরে বিতর্ক হয়। বিএনপির কৌশল প্রশ্নবিদ্ধ হয়। দলটি নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দিলেও নির্বাচনটি হয়ে যাওয়ায় আওয়ামী লীগ সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, বিএনপি নির্বাচনে আসুক এটা আওয়ামী লীগ চায়নি। বিএনপি আওয়ামী লীগের ফাঁদে পা দিয়ে নির্বাচন বর্জন করার মতো চরম সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তে প্রবল ঝুঁকি ছিল। বিএনপির ধারণা ছিল, নির্বাচন হবে না। নির্বাচনটি হয়ে যাওয়ায় আওয়ামী লীগ একটা স্বস্তিকর অবস্থানে চলে আসে।

ভারতের সঙ্গে সমীকরণ

বিএনপি ভারতবিরোধী দল হিসেবে পরিচিত। ভোটের রাজনীতিতে সুবিধা পাওয়ার জন্য বিএনপি নিজেই মাঝেমধ্যে এ ধরনের প্রচার উসকে দেয়। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বিরোধী দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়া ২০১২ সালে দিল্লি সফরে যান। ওই সফরে ভারত সরকার বেগম জিয়াকে আতিথেয়তা দিতে ত্রুটি করেনি। দেশে ফিরে বেগম জিয়া ভারত সরকারের আতিথেয়তার প্রশংসা করে তাঁর দিল্লি মিশন সফল বলে দাবি করেছিলেন। ২০১৩ সালের মার্চে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশ সফরে এসে বলেছিলেন, 'ভারত কোনো দল নয়, দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায়।' এই মন্তব্য ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পরে প্রণব মুখার্জি রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশ সফরে এলে তাঁর সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত সৌজন্য বৈঠক জামায়াতের ডাকা একটি হরতালের অজুহাতে বেগম জিয়া বাতিল করে দেন। এতে ভারতীয় প্রশাসন বিব্রত হয়। যাঁরা বিএনপির পক্ষে লবি করেছিলেন, তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। বিষয়টিকে ভারত অপমান হিসেবে বিবেচনা করে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন আয়োজন করতে আওয়ামী লীগ সরকারকে ভারত সর্বোচ্চ কূটনৈতিক সমর্থন দেয়। নির্বাচনের আগে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব সুজাতা সিং ঢাকা সফর করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পক্ষে দূতিয়ালি করেন।[৯৫]

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণে একধরনের বাংলাদেশ-ভারত সমীকরণ তৈরি হয়েছে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার একটা সুযোগ হাতে পেয়েও বিএনপি তা কাজে লাগাতে পারেনি।

বর্তমান অবস্থা

বেগম জিয়া তিন দশকের বেশি সময় ধরে দলের চেয়ারপারসন। তাঁর সামনে এখন দুটো সমস্যা। সরকারের নানামুখী 'আক্রমণে' দল ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে দলীয় কাজেকর্মে এসেছে স্থবিরতা। অনেক নেতা বয়সের ভারে ন্যুজ। অন্যরা মামলায় জর্জরিত, গ্রেপ্তারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এক সাক্ষাৎকারে বেগম জিয়া বলেন :

> আমাদের অনেক সমস্যা। প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যের। অথচ শেখ হাসিনা প্রতিশোধের রাজনীতি করছেন। তারা জোর করে ক্ষমতায় আছে। মানুষ কি তাদের ভোট দিয়েছে? সব সময় গালিগালাজ করে। এটা কি রাজনীতির ভাষা? আমি পারি না। গালিগালাজ শিখি নাই।
>
> দলে অনেক সিনিয়র নেতা আছেন। তাঁদের বয়স হয়েছে। তরুণেরা দায়িত্ব নিতে চায়। তাদের জায়গা করে দিতে হবে। দল পুনর্গঠনের কাজ চলছে।[৯৬]

জনমনে একধরনের ধারণা তৈরি হয়েছে যে, তারেক রহমান লন্ডনে বসে নানান পরামর্শ দিয়ে দলকে ডোবাচ্ছেন। খালেদা জিয়াকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। দলের মধ্যে অন্য আরেকটা মতও আছে। সেটি হলো—তারেক রহমান অনেক বেশি বাস্তববাদী। কিন্তু বেগম জিয়াই একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে দল চালাচ্ছেন। নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তটি বেগম জিয়ার, তারেকের নয়। তারেক ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক চান, কিন্তু বেগম জিয়া হলেন কট্টর ভারতবিরোধী। বেগম জিয়া যাঁদের পরামর্শে চলেন, তাঁরা ভালো করেই জানেন, দলে তারেকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁদের অবস্থান টলে যাবে, হয়তো বিদায় নিতে হবে। তাঁরা এমনও মনে করেন, তারেক দলের কর্তৃত্ব নেওয়ার চেয়ে আওয়ামী লীগকেই ক্ষমতায় রাখা তাঁদের জন্য নিরাপদ। তাঁরা সচেতনভাবেই দেশে তারেকবিরোধী প্রচারণার জবাব দিচ্ছেন না, বরং আরও উসকে দিচ্ছেন, তারেককে খলনায়ক বানানোর চেষ্টা করছেন। তাঁরা মনে করেন, 'অন্ধ ভারতবিরোধিতা এবং জামায়াততোষণ' এই দুই প্রবণতার ধারক হলেন বেগম জিয়া এবং তিনি দল নিয়ে যথেচ্ছাচার করছেন। তারেক হলেন ঠিক এর উল্টো। তারেককে খলনায়ক বানাতে পারলে আওয়ামী লীগের সুবিধা হয়। কেননা, তারেকই 'ভবিষ্যতের নেতা' এবং আওয়ামী লীগ যেভাবেই হোক 'তারেকের উত্থান' ঠেকাতে চায়।

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের নৈতিক বৈধতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকলেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার তেমন একটা চাপে নেই। এর প্রধান কারণ হলো বিএনপির সাংগঠনিক দুর্বলতা। অনেক নেতা ঝুঁকি নিতে চান না। তৃণমূলের

নেতা-কর্মীরা হামলা-মামলায় ঘরছাড়া, দিশেহারা। অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। 'আন্দোলন'-এর রাজনীতিতে বিএনপি পূর্ণ শক্তি নিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে কি না বলা মুশকিল। ২০১৩-১৪ সালের সহিংস নেতিবাচক রাজনীতির কারণে বিএনপি দুর্বলতর হয়েছে।

২০১৪ সালে যেভাবেই হোক একটা নির্বাচন করিয়ে আওয়ামী লীগ চালকের আসনে বসে গেছে। বিএনপিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে হলে নির্বাচন ছাড়া গতি নেই। নির্বাচনের পথ একবার ছেড়ে দিয়ে আবার সেই পথে ফিরে আসার একটা জোর চেষ্টা চলছে দলের মধ্যে। কিন্তু গত কয়েক বছরে দলটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। দলের পুনর্গঠন এবং পুনরুজ্জীবনই এই মুহূর্তে বিএনপির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য দরকার গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব এবং দলীয় সংহতি। বিএনপির মধ্যে এ দুটোই নড়বড়ে হয়ে গেছে। নেতৃত্বে সমন্বয় ঘটিয়ে দলটিকে কার্যকর করার সাফল্যের মধ্যেই বিএনপির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

যে প্রক্রিয়ায় ২০১৪ সালের নির্বাচন হয়েছে, তা যদি না বদলায় তাহলে বিএনপির পক্ষে একটা 'অবাধ' নির্বাচন আদায় করে নেওয়া মুশকিল হবে। সে ক্ষেত্রে পুরো নির্বাচন-প্রক্রিয়াটি প্রশ্নবিদ্ধ হতেই থাকবে। এর শিকার শুধু বিএনপিই হবে না, গণতন্ত্রই মুখ থুবড়ে পড়বে।

বিএনপি ভালো না খারাপ, সম্ভাবনাময় না একেবারে শেষ হয়ে গেছে, এই তর্কের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, দ্বিদলীয় রাজনীতিতে নাগরিকদের জন্য 'স্পেস' থাকে। একটি দল যদি নির্বাসনে যায়, অন্যটির তখন যা খুশি করার প্রবণতা পেয়ে বসে। তৈরি হয় একচেটিয়া দলতন্ত্র। বিএনপির বর্তমান দশা এরকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরির সুযোগ করে দিয়েছে। আখেরে এটা কারও জন্যই মঙ্গল বয়ে আনবে না। বিএনপি আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কি না, তার ওপর দেশের আগামী দিনের রাজনীতি অনেকাংশে নির্ভর করছে।

অনিশ্চিত পথে

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো বেশির ভাগই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এখানে বড় দল আর ছোট দলে কোনো ফারাক নেই। ছোট একটা দল যখন রাস্তায় ১৫-২০ জন লোক নিয়ে একটা মিছিল বের করে, তখনো দেখা যায় দলের ব্যানার হাতে সামনে কয়েকজন ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যানারে দলের নামের পাশে দলের সভাপতির যৌবনকালের একটা ছবিও শোভা পায়। এর অর্থ একটাই। দলটা ওই ব্যক্তির, যাঁর ছবি ব্যানারে উঁকি দিচ্ছে। এখানে দলের মালিকানা নির্ভর করে সাধারণত দলের মধ্যে পদ-পদবি, চাঁদা তোলা ও দলের দপ্তর চালানোর আর্থিক ক্ষমতা, দলের ক্যাডারদের মাঝেমধ্যে মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতার ওপর। দল ভেঙে গেলে সচরাচর দলের নাম বদলায় না, ভগ্নাংশের পাশে বন্ধনীতে দলের প্রধান কর্তার নামটি থাকে। যেমন বিএনপি (নিলু), জাসদ (ইনু), জেপি (মঞ্জু) ইত্যাদি।

কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠবে, এটা একটা সনাতন ধারণা। বাস্তবে তেমনটা আর ঘটে না। বিএনপি শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের চিন্তায় ও উদ্যোগে। তাঁর সঙ্গে শামিল হয়েছিলেন কয়েকজন সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৮ সালে যাত্রা শুরু করলেও এর সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হয় ১৯৭৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর একটি স্থায়ী (স্ট্যান্ডিং) কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে। প্রথম স্থায়ী কমিটির সদস্যরা সবাই ছিলেন 'হ্যান্ড-পিকড', অর্থাৎ স্বয়ং জিয়াউর রহমান কর্তৃক নিযুক্ত। জিয়া দলের চেয়ারম্যান থাকলেন, মহাসচিব করা হলো বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে।[১] ১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়া নিহত হলে দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান বিচারপতি আবদুস সাত্তার।

১৯৮৪ সালের ১০ মে বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির চেয়ারপারসন নিযুক্ত হন। বিচারপতি সাত্তার লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান। তারপর খালেদা জিয়া

কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমানকে দলের মহাসচিব নিযুক্ত করেন। এরপর ১৯৮৬ সালে মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পান আওয়ামী লীগের দলছুট নেতা কে এম ওবায়দুর রহমান। দলাদলি ও দল ভাঙার 'ষড়যন্ত্রের' অভিযোগে ১৯৮৮ সালে তাঁকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এরপর মহাসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয় আবদুস সালাম তালুকদারকে।[২]

আবদুস সালাম তালুকদারের সাংগঠনিক নৈপুণ্যে বিএনপি ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল জল্পনা-কল্পনা ভুল প্রমাণ করে জিতে যায়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিএনপি হেরে গেলে সালাম তালুকদারকে সরিয়ে আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিযুক্ত করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ভারমুক্ত হয়ে পুরোপুরি মহাসচিব বনে যান এবং ২০০১ সালে নির্বাচনী বৈতরণি পার হতে দলকে সাহায্য করেন।

ভবিষ্যতে দলের হাল কে ধরবেন, তার আগাম চিন্তা বিএনপিতে ছিল। বেগম খালেদা জিয়া এগোচ্ছিলেন সনাতন ফর্মুলা অনুযায়ী। ২০০২ সালের জুন মাসে বিএনপিতে একটা পরিবর্তন আসে, যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। বেগম খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান দলের যুগ্ম মহাসচিব নিযুক্ত হন। কিন্তু এটা হঠাৎ করে হয়নি। তারেককে দলে ঢোকানোর আয়োজন চলছিল অনেক দিন ধরেই। ১৯৯৩ সালে তিনি বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলা বিএনপির প্রাথমিক সদস্য হন। একই বছর তাঁকে বগুড়া বিএনপির জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয়। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব নির্বাচিত হয়েই তারেক গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যান এবং দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সমাধিতে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা জানান। কমিটির যুগ্ম মহাসচিব নিযুক্ত হওয়ার কিছুদিন পরই সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিবের পদ তৈরি করে তাঁকে সেই পদে বসানো হয়। দলের নেতাদের ক্রম অনুযায়ী তাঁর স্থান অনেক নিচে হলেও তিনিই হয়ে ওঠেন দলের মুখ্য কান্ডারি। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, দল পরিবারতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে এবং 'তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি' হিসেবে তারেক রহমান আগামী দিনগুলোতে দলের নেতৃত্ব দেবেন, এমন একটা পূর্বাভাস বেশ যত্নের সঙ্গেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারেকের আশপাশে জুটে যায় বিএনপির একদল 'তরুণ তুর্কি'। তারেক দলের মধ্যে আরেকটা বলয় বানানোর চেষ্টায় বেশ সফল হন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর মায়ের প্রশ্রয় কাজ করেছিল। এ ছাড়া মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানো বা কথা বলার মতো লোক বিএনপি নেতৃত্বের মধ্যে ছিল না। বিএনপির প্রতি কারও বিশ্বাস-ভালোবাসা ছিল না। সুতরাং, তারেকের উত্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গিয়ে দলে চাকরি হারানোর ঝুঁকি প্রবীণ নেতারা কেউ নিতে চাননি। তারেকও বেশ করিতকর্মা ছিলেন। তিনি জেলায় জেলায় ঘুরে দলের তরুণদের

সঙ্গে সভা-সংলাপ করলেন। বিএনপিতে মাঠপর্যায়ে এ ধরনের সংলাপের প্রক্রিয়া ছিল একেবারেই নতুন। সুতরাং, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তারেক দলের যুব সম্প্রদায়ের 'মাথার মণি' হয়ে গেলেন।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দাবার ঘুঁটি উল্টে গেল। দেশে জারি হলো জরুরি অবস্থা। সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ চালাল দুই বছর। বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা গ্রেপ্তার হলেন। তবে তাঁদের 'ভিভিআইপি' মর্যাদায় গৃহবন্দী করে রাখা হলো সংসদ ভবন চত্বরে। পরে তাঁরা ছাড়াও পেলেন। তারেক নির্যাতনের শিকার হলেন এবং দেশ ত্যাগ করে লন্ডনে নির্বাসিত জীবন বেছে নিতে বাধ্য হলেন।

দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে ২০০৭ সালে বিএনপি থেকে বের করে দেওয়া হয়। খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যেতে থাকেন। ২০০৯ সালের ৮ ডিসেম্বর দলের পঞ্চম কাউন্সিল সভায় খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে দলের পূর্ণ মহাসচিব নির্বাচিত করা হয়। এই সভায় সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের নতুন একটা পদ তৈরি করে তারেক রহমানকে এই পদে নির্বাচন করা হয়। দলের গঠনতন্ত্র এবং আচরণবিধি অনুযায়ী দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী এখন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তারেক রহমানই দলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন[৩]। অনেকের ধারণা, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কট করার যে সিদ্ধান্ত বিএনপি নিয়েছিল, তা তারেক রহমানের ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়েছিল।[৪]

বিএনপির মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন ২০১১ সালে মৃত্যুবরণ করলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিযুক্ত হন।

বিএনপি দলটি বেশ বড়। এই দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে আছেন ৩৫১ জন। ২০১০ সালে স্থায়ী কমিটি নতুন করে তৈরি হয়। এটাই দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী ফোরাম। এই কমিটিতে চেয়ারপারসন ছাড়াও অন্যদের মধ্যে ছিলেন আর এ গণি, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মওদুদ আহমদ, এম শামসুল ইসলাম, আ স ম হান্নান শাহ, এম কে আনোয়ার, বেগম সারোয়ারী রহমান, জমিরউদ্দিন সরকার, রফিকুল ইসলাম মিয়া, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং তারেক রহমান। মহাসচিব পদাধিকারবলে স্থায়ী কমিটির সদস্য। ১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। আর এ গণি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন।

দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্যের মধ্যে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান ছাড়াও আরও ১৭ জন ভাইস চেয়ারম্যান আছেন। এ ছাড়া যুগ্ম মহাসচিব আছেন সাতজন। মির্জা ফখরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্বে আছেন।[৫] এ ছাড়া চেয়ারপারসনের ৩৫ জন উপদেষ্টা আছেন। এঁদের সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে সভা করার সময় ও স্থান পাওয়া যায় না। সম্ভবত এর প্রয়োজনও কেউ অনুভব করেন না। দলের সিদ্ধান্ত আসে চেয়ারপারসন বা সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের কাছ থেকে।

বিএনপির বিধিবদ্ধ নয়টি অঙ্গসংগঠন আছে। এর মধ্যে আছে মুক্তিযোদ্ধা দল, যুবদল, মহিলা দল, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা, কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল, তাঁতী দল, ওলামা দল এবং মৎস্যজীবী দল। প্রতিটি অঙ্গসংগঠনের আগে 'জাতীয়তাবাদী' শব্দটি আছে। এ ছাড়া সহযোগী সংগঠন হিসেবে আছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল। এ দুটো সংগঠন তাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চলে। তবে সব অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের 'সুপ্রিম কমান্ডার' হলেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। তিনিই সভা ডাকেন, কমিটি ভাঙেন, কমিটি বানান।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর দলটি নতুন করে সংকটে পড়ে। দলের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস, কোন্দল এবং ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। এ অবস্থায় দলটি আবার কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়াতে পারবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

১৯৭৮ সাল থেকে ২০১৫—বিএনপির বয়স এখন ৩৭। জিয়াউর রহমানের উত্থানের সময়টুকু বিবেচনা করলে, এর বয়স দাঁড়াবে ৪০। এত দিনে একটা রাজনৈতিক দলের টিকে যাওয়ার কথা। কোটি টাকার প্রশ্ন হলো, বিএনপি কি টিকে থাকবে?

জিয়া বিএনপি তৈরি করেছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে। ওই সময় যাঁরা বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা যে বিএনপির আদর্শের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তা হয়তো বলা যাবে না। প্রাপ্তিযোগের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সন্দেহ নেই। তবে আদর্শের ব্যাপারটা যে একেবারে ছিল না, তা নয়। যাঁরা আওয়ামী লীগ বা কমিউনিস্ট রাজনীতি পছন্দ করেন না, তাঁদের তো একটা অবলম্বন দরকার। বিএনপি হয়ে দাঁড়াল ওই রকমের একটা প্ল্যাটফর্ম। বিএনপি না থাকলেও আওয়ামী লীগের বিপরীতে এ ধরনের একটা দল থাকবে। এবং এই দল অবধারিতভাবেই 'মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদের' কথা বলবে। 'বিএনপি' নামের দলটা যদি একদিন ধ্বংসও হয়ে যায়, তর্কের খাতিরেও যদি এমন সম্ভাবনার কথা ভাবা হয়, তাহলেও দেখা যাবে আওয়ামী

লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটা দল দাঁড়িয়ে গেছে। এই অর্থেই বলা যায়, বিএনপির রাজনীতি টিকে গেছে।

বিএনপির প্রথম স্থায়ী কমিটির কনিষ্ঠতম সদস্য নাজমুল হুদা রাজনীতির ময়দানে সর্বশেষ ডিগবাজি দেওয়ার আগে বলেছিলেন, জিয়া পরিবার থেকেই দলের নেতৃত্ব আসবে। এ দেশের রাজনীতিতে ব্যক্তি বা পরিবারের ক্যারিশমা অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাওয়ার জো নেই। বিএনপিতে এখনো বেগম খালেদা জিয়ার বিকল্প তৈরি হয়নি। সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা না থাকলেও তারেক রহমানকে বাদ দিয়ে দলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করা কষ্টকর। পারিবারিক পরম্পরা রাজনীতিতে ভালোভাবেই জেঁকে বসেছে।

বিএনপিতে উপদলীয় কোন্দল এবং মতপার্থক্য থাকলেও খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মোটামুটি সবাই সমর্পিত। অন্তত তিনটি বিষয়ে তিনি আপসহীন: ভারত প্রসঙ্গে মনোভাব, মুসলমানিত্ব এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব। এই তিনটি বিষয়কে যাঁরা বাংলাদেশের রাজনীতির নিয়ামক হিসেবে মনে করেন, তাঁরা বিএনপিকে এবং এর প্রধান নেতা খালেদা জিয়াকেই মনোজাগতিক আশ্রয় হিসেবে বিবেচনা করেন।[৬] পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের প্রধান উপকরণ ছিল 'ইসলাম' এবং ভারত-বিরোধিতা। বিএনপির রাজনীতিতে তাই পাকিস্তানবাদের ছায়া দেখেন অনেকেই। বিএনপির বিপরীতে আওয়ামী লীগের কাঁধে ভারতীয় জুজু দেখেন বিএনপিপন্থীরা। বলা চলে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত-পাকিস্তানের ছায়াযুদ্ধ (প্রক্সি ওয়ার) চলছে। দেশটা কখনোই পাকিস্তান হবে না, ভারতও হবে না, এটা সবাই জানেন। কিন্তু এ নিয়ে রাজনীতি করতে তো অসুবিধে নেই। যাঁরা মনে করেন ভারতের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব জিম্মি হয়ে পড়েছে, তাঁরা আদর্শগত কারণেই বিএনপির ছাতার তলায় আছেন এবং থাকবেন। এঁদের সংখ্যা কয়েক কোটি এবং এটাই বাস্তবতা।

দ্বিদলীয় রাজনীতির একটা সুবিধা হলো, সাধারণ নির্বাচনে ভোটাররা তাঁদের পছন্দের বিকল্প সহজেই বেছে নিতে পারেন। নাগরিকেরা সবাই দলের ঘোষণাপত্র বা কর্মসূচি পড়ে ভোট দেন না। তাঁরা পরিবর্তন চান। দেখা গেছে, যত দিন এ দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছে, তত দিন নাগরিকেরা তাঁদের পছন্দমতো এক দলকে হটিয়ে অন্য দলকে সুযোগ করে দিয়েছেন। এটুকু গণতন্ত্র অন্তত এ দেশে চর্চা করা গেছে।

আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি সবচেয়ে বড় দল। অন্য দলগুলো উপগ্রহের মতো এদের কক্ষপথে ঘোরাফেরা করে। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি পরস্পরের বিরুদ্ধে শুধু কর্মসূচিই দেয় না, তারা গালাগাল, খিস্তি,

চরিত্রহনন—কোনোটাই বাদ দেয় না। তারা মনে করে প্রতিপক্ষকে গাল দিলে বুঝি তাদের ভোট বাড়বে।

দেশে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিকে অর্থনীতির 'ডুয়োপলি' তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করা চলে। অর্থাৎ এক দল কী ভাবছে, কী করছে, তা দেখে অন্য দলটি তার কৌশল ঠিক করে। এ যত গাল দেয়, ও দেয় তার চেয়ে বেশি। এক দলের সরকার যদি প্রতিপক্ষের ১০ জনকে পেটায়, অন্য দলটি তাদের সুযোগমতো হয়তো পেটায় ২০ জনকে। অভিযোগ করলেই তাদের ঠোঁটের আগায় জবাব তৈরি করাই আছে—ওরা তো ওদের সময় হেন করেছিল, তেন করেছিল। কাজটা যে খারাপ, তা কেউ স্বীকার করে না। খারাপ কাজটাই অনুকরণের চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হয়তো-বা কিছু সুবাতাস বইত। কিন্তু সে সুযোগ প্রায় নষ্ট করে দিয়েছে এ দেশের সুশীল সমাজের একটি অংশ। এরাও বড় দুই দলের কক্ষপথে অবিরাম ঘুরছে এবং নগদপ্রাপ্তির আশায় নিজ নিজ পছন্দের দলের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে চাটুকারিতার উদাহরণ তৈরি করছে। ব্যাঙের ছাতার মতো বুদ্ধিজীবীদের দোকানপাট তৈরি হচ্ছে—বঙ্গবন্ধু পরিষদ, জিয়া পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগ, মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম দল, শত নাগরিক, সহস্র নাগরিক, সাদা দল, নীল দল ইত্যাদি।

ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরও দলবদল হয়। এক দল অপেক্ষায় থাকে, কখন তাদের পছন্দের দল ক্ষমতায় আসবে। তারা এ জন্য বিনিয়োগও করে শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে। তারা ঘোষণাপত্র লিখে দেয়, নেত্রীর ভাষণ ঠিক করে দেয়, রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে, তার মহড়া দেয় এবং কে কোন পদটি দখল করবে, তার আগাম আভাস দিয়ে রাখে।

এ প্রসঙ্গে বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত 'শত নাগরিক কমিটি'র আহ্বায়ক অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা দল ক্ষমতায় গেলে নানা ছলছুতোয় কীভাবে কারা ক্ষমতাসীনদের মোসাহেবি করে, তিনি তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। স্বভাবতই তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কটাক্ষ করে এই মন্তব্য করেছেন :

> দেশের বুদ্ধিজীবীদের মস্ত বড় অংশটাই সরকারি আনুকূল্যে ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লভ্যাংশে ভাগ বসাতে এবং ক্ষমতাসীনদের কাছাকাছি থাকার অপার আনন্দে প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নতুন নতুন ব্যাখ্যাদানে রত।...মুক্তিযুদ্ধের কালে রাজাকার থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই যদি সে 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির পিতা'র কবচটা গলায় লটকিয়ে সর্বদা তার বন্দনা করে চলে।[৭]

বাংলাদেশ এখন এভাবেই চলছে। আওয়ামী লীগ 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'

পকেটে পুরেছে। বিএনপি দেশের 'স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে'র চাবিটা আঁচলে বেঁধে রেখেছে। এই দুই দলের হাঁক-ডাকের মধ্য পড়ে সাধারণ মানুষ খাবি খাচ্ছে। তার পরও বলতে হবে, এরাই নিকট ভবিষ্যতে টিকে থাকবে। যদি কোনো পরিবর্তন আসে, তবে সেটা হয়তো আসবে এই দুই দলের ভেতর থেকেই। জনগণের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। রাজনীতিকেরা যতই 'বিকল্প শক্তির' কথা বলুন না কেন, আসমান থেকে সহসা তা টুপ করে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

লালন সাঁই একটা গান লিখেছিলেন—'এসব দেখি কানার হাটবাজার।' গানের কথাগুলো এখনকার বাংলাদেশের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। লালন তো মাটির মানুষ ছিলেন। প্রবল ঘ্রাণশক্তি দিয়ে তিনি মানুষ ও সমাজকে চিনেছেন, জেনেছেন। লালনের সময় 'সুশীল সমাজ' বলে কিছু ছিল কি না, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। ওই সময় কলকাতাকেন্দ্রিক 'ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট' বেশ জোরদার ছিল। এঁদের অনেকেই ছিলেন জমিদার-নন্দন, অর্থলিপ্সু এবং অহংকারী। পরস্পরকে তাঁরা কী পরিমাণ গালাগাল করতেন, সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় তার যথেষ্ট উল্লেখ হয়েছে। লালনের গানের কয়েকটা লাইন প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

পণ্ডিত কানা অহংকারে
মাতব্বর কানা চোগলখোরে
আন্দাজি এক খুঁটো গেড়ে
চেনে না সীমানা কার।
এক কানা কয় আর এক কানারে
চল দেখি যায় ভবপারে
নিজে কানা পথ চেনে না
পরকে ডাকে বারে বার।[৮]

দেশবাসী এখন নানা রকম 'কানা'র পাল্লায় পড়েছে। লালন প্রতীকী অর্থে একচোখা রাজনীতিবিদ (মাতবর) এবং বুদ্ধিজীবীদের (পণ্ডিত) প্রসঙ্গ টেনে পঙ্‌ক্তিগুলো সাজিয়েছেন। এঁরা সবাই জনগণকে ডাকছে, নানান তত্ত্ব ফেরি করে বেড়াচ্ছে। উদ্ধার পেতে হলে অদৃষ্টবাদীর মতো আবার লালনকেই স্মরণ করে বলতে হবে, 'এসো দয়াল, পার করো ভবের ঘাটে।'[৯]

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

একটি জাতির জন্ম

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান

['মুক্তিযুদ্ধের বিখ্যাত ত্রয়ী ও তাঁদের স্মৃতিকথা' শিরোনামে *বিচিত্রা* প্রচ্ছদকাহিনি প্রকাশ করেছিল ১৯৭৪ সালের স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায়। এতে স্মৃতিকথা লিখেছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ। প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছিল : 'মুক্তিযুদ্ধের সময় এই তিনজনের নাম লোকের মুখে মুখে গল্পের মতো ফিরত, যুদ্ধের সময় তাঁদের নাম লোকের বুকের বল বাড়িয়ে দিত। তাঁরা যুদ্ধ করতেন বীরত্বের সঙ্গে, সজীব রাখতেন স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা।' এখানে সেই স্মৃতিকথাটির অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রিত হলো।]

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সপ্তাহ খানেক পরে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন সেই দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলোর সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা লিখতে। আমি একজন সৈনিক আর লেখা একটি ঈশ্বরপ্রদত্ত শিল্প। সৈনিকেরা স্বভাবতই সেই বিরল শিল্পক্ষমতার অধিকারী হন না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ছিল এমনই আবেগধর্মী যে, আমাকেও তখন কিছু লিখতে হয়েছিল। কলম তুলে নিতে হয়েছিল হাতে।

ভারত ভেঙে দু-ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের। আর তার অব্যবহিত পরেই আমরা চলে গিয়েছিলাম করাচি। সেখানে ১৯৫২ সালে আমি পাস করি ম্যাট্রিক। যোগদান করি পাকিস্তান সামরিক অ্যাকাডেমিতে। অফিসার ক্যাডেট রূপে। সেই থেকে অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন স্থানে আমি কাজ করেছি পাকিস্তানি বাহিনীতে।

স্কুলজীবন থেকেই পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিত। আমি জানতাম অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুলজীবনেই বহুদিন শুনেছি আমার স্কুলবন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকেরা বাড়িতে যা বলত, তা-ই তারা রোমন্থন করত স্কুলপ্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম। মাঝে মাঝেই শুনতাম তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানি তরুণ সমাজকেই শেখানো হতো বাঙালিদের ঘৃণা করতে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে

দেওয়া হতো স্কুলছাত্রদের শিশুমনেই। শিক্ষা দেওয়া হতো তাদের বাঙালিকে নিকৃষ্টতর মানবজাতিরূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময়ই আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝেমধ্যে প্রত্যাঘাত হানতাম আমিও। সেই স্কুলজীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাঙ্ক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনো দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানব। সযত্নে এই ভাবনাটাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই কিশোর-মনের ভাবনাটাও পরিণত হলো। জোরদার হলো। পাকিস্তানি পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দুর্বারতম আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠত মাঝে মাঝেই। উদগ্র কামনা জাগত পাকিস্তানের ভিত্তিভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে।

১৯৫২ সালে মশাল জ্বলল আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনের। আমি তখন করাচিতে। দশম শ্রেণির ছাত্র তখন। পাকিস্তানি সংবাদপত্র, প্রচারমাধ্যম, পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারী, সেনাবাহিনী, আর জনগণ—সবাই সমানভাবে তখন নিন্দা করেছিল বাংলা ভাষার। নিন্দা করেছিল বাঙালিদের। তারা এটাকে বলত বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা এটাকে মনে করেছিল এক চক্রান্ত বলে। এক সুরে তাই তারা চেয়েছিল একে ধ্বংস করে দিতে। আহ্বান জানিয়েছিল এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। কেউ বলত বাঙালি জাতির মাথা গুঁড়িয়ে দাও। কেউ বলত ভেঙে দাও এর শিরদাঁড়া। এর থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা চায় বাঙালিদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে। কেড়ে নিতে চায় বাঙালিদের সব অধিকার। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক রূপে বাঙালিদের মেনে নিতে তারা কুণ্ঠিত।

১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের বিজয়রথের চাকার নিচে পিষ্ট হলো মুসলিম লীগ। বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয়কেতন উড়ল বাংলায়। আমি তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্যাডেট। আমাদের মনেও জাগল তখন পুলকের শিহরণ। যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যে আনন্দে উদ্বেলিত হলাম আমরা সবাই; পর্বতে ঘেরা অ্যাবোটাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা, বাঙালি ক্যাডেটরা আনন্দে হলাম আত্মহারা। খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলাম সেই বাঁধভাঙা আনন্দের তরঙ্গমালা। অ্যাকাডেমি ক্যাফেটেরিয়ায় নির্বাচনী বিজয়-উৎসব করলাম আমরা। এ ছিল আমাদের বাংলা ভাষার জয়, এ ছিল আমাদের অধিকারের জয়, এ ছিল আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জয়, এ ছিল আমাদের জনগণের, আমাদের দেশের এক বিরাট সাফল্য।

এই সময়েই একদিন কতগুলো পাকিস্তানি ক্যাডেট আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের গালাগাল করল। আখ্যায়িত করল তাঁদের বিশ্বাসঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম। অবতীর্ণ হলাম তাদের সঙ্গে এক উষ্ণতম কথা-কাটাকাটিতে। এই বিরোধের মীমাংসা হলো না। ঠিক হলো এর ফয়সালা হবে মুষ্টিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে। বাঙালিদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বক্সিং গ্লাভস হাতে তুলে নিলাম আমি। পাকিস্তানি গোঁয়ার্তুমির মান বাঁচাতে এগিয়ে এল এক পাকিস্তানি ক্যাডেট। নাম তার লতিফ (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অর্ডিন্যান্স কোরে এখন সে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)। লতিফ প্রতিজ্ঞা করল,

আমাকে সে একটু শিক্ষা দেবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে যাতে আর কথা না বলতে পারি, সেই ব্যবস্থা নাকি সে করবে।

এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে সেদিন জমা হয়েছিল অনেক দর্শক। তুমুল করতালির মাঝে শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের দুই প্রতিনিধির মধ্যে। লতিফ আর তার পরিষদ দল অকথ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করল। হুমকি দিল বহুতর। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ স্থায়ী হলো না ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি। পাকিস্তানপন্থী আমার প্রতিপক্ষ ধুলায় লুটিয়ে পড়ল। আবেদন জানাল সব বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য।

এই ঘটনাটি আমার মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতেও বাঙালি অফিসারদের আনুগত্য ছিল না প্রশ্নাতীত। অবশ্য গুটি কয়েক দালাল ছাড়া। আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখত, অবহেলা করত, অসম্মান করত। দক্ষ ও যোগ্য বাঙালি অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটত না কোনো স্বীকৃতি বা পারিতোষিক। জুটত শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা। আখ্যায়িত করত আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে। অ্যাকাডেমির ক্লাসগুলোতেও সব সময় বোঝানো হতো, আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের দালাল। পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতেই আওয়ামী লীগ সচেষ্ট। এমনকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ক্যাডেটদের শেখানো হতো—আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ওদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।

বাঙালি অফিসার ও সৈনিকেরা সব সময়ই পরিণত হতো পাকিস্তানি অফিসারদের রাজনৈতিক শিকারে। সব বড় পদ আর লোভনীয় নিয়োগপত্রের শিকাগুলো বরাবরই ছিঁড়ত পাকিস্তানিদের ভাগ্যে। বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো না বাঙালি অফিসারদের। আমাদের বলা হতো ভীরু কাপুরুষ। আমাদের নাকি ক্ষমতাই নেই ভালো সৈনিক হওয়ার। ঐতিহ্য নেই যুদ্ধের সংগ্রামের।

এরপর এল আইয়ুবি দশক। আইয়ুব খানের নেতৃত্বে চালিত এক প্রতারণাপূর্ণ সামরিক শাসনের কালো দশক। এই তথাকথিত উন্নয়ন দশকে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতিকে বিকৃত করার। আমাদের জাতীয়তা খাটো করার। বাংলাদেশের বীর জনতা অবশ্য বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করেছে এই হীন প্রচেষ্টা। এ ছিল এক পালাবদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা-সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথ : আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল, ছাত্র-জনতা আর প্রচারমাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পালন করেছে এক বিরাট ভূমিকা। আমাদের দেশের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চারণে এদের রয়েছে এক বিরাট অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একমাত্র উপাদান হচ্ছে এর সংস্কৃতি।

১৯৬৩ সালে আমি ছিলাম সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন পরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী মালিক একসময় আমার এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল একদিন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা উন্নততর করার সরকারি অভীপ্সা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন তিনি। একপর্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমত

জানতে চাইলে আমি বললাম, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা না হয়, তাহলে দেশে প্রশাসক-ব্যবস্থা চালু করা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। এর জবাবে তিনি বললেন, বাংলাদেশ যদি স্বয়ম্ভর হয়, তাহলে সে আলাদা হয়ে যাবে। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল মনোভাব। অথচ তাঁরাই তখন দেশটা শাসন করছিলেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন বাংলাদেশটাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, যার নামে গর্ববোধ করত, তেমনই একটা ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার। সেই ব্যাটালিয়ন এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও গর্বের বস্তু। খেমকারান রণাঙ্গনের বেদিয়ামে তখন আমরা যুদ্ধ করছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটালিয়ন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এই ব্যাটালিয়নই লাভ করেছিল পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক। ব্যাটালিয়নের পুরস্কার বিজয়ী কোম্পানি ছিল আমার কোম্পানি আলফা কোম্পানি। এই কোম্পানি যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ রাজপুত ঊনবিংশ মারাঠা লাইট ইনফেন্ট্রি ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাভালবীর (সাঁজোয়া বহর) বিরুদ্ধে। এই কোম্পানির জওয়ানরা এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহুসংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে, যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করে এই কোম্পানি অর্জন করেছিল সৈনিকসুলভ মর্যাদা, প্রশংসা করেছিল তাদেরও প্রীতি। যুদ্ধবিরতির সময়, বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশ কিছুসংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের সঙ্গে। আমি তখন তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করেছি, হাত মিলিয়েছি। আমার ভালো লাগত তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে। কেননা, আমি তখন দেখেছিলাম, তারাও অত্যন্ত উঁচু মানের সৈনিক। আমরা তখন মতবিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটা হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম। এই প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাইয়ের মতো দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।

পাকিস্তানিরা ভাবত বাঙালিরা ভালো সৈনিক নয়। খেমকারানের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানি বাহিনীর সবার কাছেই আমরা ছিলাম তখন ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি, যেখানে বাঙালি জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সঙ্গে সেই সংঘর্ষে বহু ক্ষেত্রে পাকিস্তানিরাই বরং লেজ গুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে সময় পাকিস্তানিদের সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তানি বাহিনীর এক প্রথম শ্রেণির সাঁজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাংকের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল, এসব কিছুতে পাকিস্তানিরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙালি সৈনিকদের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃৎকম্প জেগেছিল তাদের।

এই যুদ্ধে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বাঙালি পাইলটরাও অর্জন করেছিল প্রচুর সুনাম। এসব কিছুই চোখ খুলে দিয়েছিল বাঙালি জনগণের। তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল তাদের বাঙালি সৈনিকদের বীরত্বের প্রতি। বাঙালি সৈনিকদের বীরত্ব ও দক্ষতার প্রশংসা

হয়েছিল তখন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে। উল্লেখ করা হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম। এ নাম আজ বাংলাদেশেরও এক পরম প্রিয় সম্পদ। এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করল এক গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করল প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালিদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এই গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকর করল। কিন্তু এই গোপন তথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমাদের মনে। বাঙালি সৈনিকদের মনে। বিমানবাহিনীর বাঙালি জওয়ানদের মনে। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, বিশ্বের যেকোনো বাহিনীর মোকাবিলায়ই আমরা সক্ষম।

জানুয়ারি মাসে আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম পাকিস্তান সামরিক অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষকের পদে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি একদিন শিক্ষক হলাম। মনে রইল শুধু যুদ্ধের স্মৃতি। সামরিক অ্যাকাডেমিতে শুরু হলো আমার শিক্ষক-জীবন। পাকিস্তানিদের আমি সমরবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আর সেই বর্বররা এই বিদ্যাকে কাজে লাগাল আমারই দেশের নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এক পাশবিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে।

সামরিক অ্যাকাডেমিতে থাকাকালেও আমি সম্মুখীন হয়েছি শুধু নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতার। সেখানে দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানিদের একই অজ্ঞতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানিদের দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের কোণঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন, আমি যখন শিক্ষক হলাম, তখনো তেমনিভাবেই বাঙালি ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটত শুধু অবহেলা অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আন্তসার্ভিস নির্বাচনী বোর্ডে গ্রহণ করা হতো নিম্নমানের বাঙালি ছেলেদের। ভালো ছেলেদের নেওয়া হতো না ক্যাডেটরূপে। রাজনৈতিক মতাদর্শ আর দরিদ্র পরিবারের নামে প্রত্যাখ্যান করা হতো তাদের। এই সবকিছুই আমাকে ব্যথিত করত। এই সামরিক অ্যাকাডেমিতেই পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করল। অ্যাকাডেমির গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল সব বিষয়ের ভালো ভালো বই। আমি জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমি ব্যাপক পড়াশোনা করলাম ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা এটাকে আখ্যায়িত করেছিল বিদ্রোহ হিসেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না। এটা ছিল এক মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তথাকথিত সামরিক যুদ্ধজীবীদের সঙ্গেও মাঝেমধ্যে আমার আলোচনা হতো। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল আরও কয়েক দশক কোটি কোটি জাগ্রত বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম, বাংলাদেশের জনগণ আর ঘুমিয়ে নেই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের পরিণতিই ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এটাও ছিল একটা সুস্পষ্ট অঙ্গুলি-সংকেত। এই মামলার পরিণতি এক করে দিল বাঙালি সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের। বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল তারা। তাদের ওপর পাকিস্তান সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সব বিধিনিষেধ ঝেড়ে ফেলা হলো। এক কণ্ঠে সোচ্চার হলো তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার

দাবিতে। ইসলামাবাদের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং অস্ত্র তুলে নেওয়ার মধ্যেই যে আমাদের দেশের—বাংলাদেশের কল্যাণ নিহিত, তাতে আর কোনো সন্দেহই ছিল না আমাদের মনে। এটাও আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের আরেক দিগ্‌দর্শক। এ সময় থেকেই এ ব্যাপারে আমরা মোটামুটিভাবে খোলাখুলি আলোচনাও শুরু করেছিলাম।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হলো জয়দেবপুরে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নে আমি ছিলাম সেখানে সেকেন্ড ইন-কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আবদুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানি। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করল, বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে, তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত। এই ভোজসভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাইয়ুমের এই দম্ভোক্তি আমাদের বিস্মিত করল। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সংযোগ ছিল তার। তার মুখে তার পুরোনো প্রভুদের মনের কথাই ভাষা পেয়েছে, কিন্তু তা-ই আমি ভাবছিলাম। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি। এবং এর কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সে যা বলেছে, তা জেনেশুনেই বলেছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকর করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দপ্তরে যাই। জিএসও-১ (গোয়েন্দা) লে. কর্নেল তাজ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কী জিজ্ঞাসা করি। সে আমাকে জানায় যে তারা বাঙালি নেতাদের জীবনী-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বারবার তাকে জিজ্ঞেস করি—এসব খুঁটিনাটির প্রয়োজন কী? এই প্রশ্নের জবাবে সে জানায়—ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগবে।

গতিক যে বেশি সুবিধার নয়, তার সঙ্গে আলোচনা করেই আমি তা বুঝতে পারি। সেই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে চার মাসের জন্য আমি পশ্চিম জার্মানিতে যাই। এই সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র এক রাজনৈতিক বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়। পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থানকালে আমি একদিন দেখি সামরিক অ্যাটাচি কর্নেল জুলফিকার সে সময়ের পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কারিগরি অ্যাটাচির সঙ্গে কথা বলছিল। এই ব্যক্তিটি ছিল এক সরলমনা পাঠান অফিসার। তাদের সামনে ছিল করাচির দৈনিক পত্রিকা *ডন*-এর একটা সংখ্যা। এতে প্রকাশিত হয়েছিল ইয়াহিয়ার ঘোষণা, ১৯৭০ সালেই নির্বাচন হবে। সরলমনা পাঠান অফিসারটি বলছিল, নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ব্যাপকভাবে নির্বাচনে জয়ী হবে, আর সেখানেই হবে পাকিস্তানের সমাপ্তি।

এর জবাবে কর্নেল জুলফিকার বলল, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রে সে ক্ষমতা পাবে না। কেননা, অন্য দলগুলো মিলে কেন্দ্রে

আওয়ামী লীগকে ছাড়িয়ে যাবে। আমি এটা জেনে বলছি। এ সম্পর্কে আমার কাছে বিশেষ খবর আছে।

এরপর আমি বাংলাদেশে ফিরে এলাম। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড ইন-কমান্ড। এর কয়েক দিন পর আমাকে ঢাকায় যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানি অফিসাররা মনে করত চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানি সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতঙ্কের ছবি। তাদের এই আতঙ্কের কারণও আমার অজানা ছিল না। শিগগিরই জনগণ গণতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা—বাঙালি অফিসাররা—তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটালিয়নকে গড়ে তোলার কাজে। এটা ছিল রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটালিয়ন। এটার ঘাঁটি ছিল ষোলশহর বাজারে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যাটালিয়নকে পাকিস্তানের খারিয়ানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এর জন্য আমাদের সেখানে পাঠাতে হয়েছিল ২০০ জওয়ানের এক দ্রুতগামী দল। অন্যরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যেসব অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ৩০০ পুরোনো ০০৩-রাইফেল, চারটা এলএমজি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের অ্যান্টিট্যাংক বা ভারী মেশিনগান ছিল না।

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সৈনিকেরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারিদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরও জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারি বাড়িঘরগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারিদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে এসব কিছু থেকে—এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে, তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম।

তারপর এল ১ মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো। বিহারিরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে। এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হলো। এই সময়ে আমার ব্যাটালিয়নের এনসিওরা আমাকে জানাল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বেলুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম, প্রতি রাতেই তারা যায় কতগুলো নির্দিষ্ট বাঙালিপাড়ায়, নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালিদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালিকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়।

এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার

গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখার জন্যও লোক লাগায়। মাঝেমধ্যেই তার লোকেরা গিয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশঙ্কা করছিলাম আমাদের হয়তো নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেওয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালি হত্যা ও বাঙালি দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করব, কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন ও মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নিই, তাহলে তাঁরাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকল, আসতে থাকল। তারাও আমাকে জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলব। সম্ভবত ৪ মার্চে আমি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নিই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাঁকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সঙ্গে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মধ্যেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল।

১৩ মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানি নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানিদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি করা হলো। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকল অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানি সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আশা-যাওয়া শুরু করল, চট্টগ্রামে নৌবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লে. কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে।

দুই দিন পর ইপিআরের ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

এর মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ

করল। ২১ মার্চ জেনারেল আবদুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজসভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বেলুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমিকে বলল, 'ফাতমি, সংক্ষেপে ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ করতে হবে।' আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকায় চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান।

পথে জনতার সঙ্গে ঘটল তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ: এতে আহত হলো বিপুলসংখ্যক বাঙালি। সশস্ত্র সংগ্রাম যেকোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এটা আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এল সেই কালরাত। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালরাত। রাত একটায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিল নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সঙ্গে নৌবাহিনীর (পাকিস্তানি) প্রহরী থাকবে, তা-ও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সঙ্গে আমারই ব্যাটালিয়নের একজন পাকিস্তানি অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে, সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই।

এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কি না, তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে শবরীর মতো প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো-বা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে।

আমরা বন্দরের পথে বেরোলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এল মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, 'তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে তারা হত্যা করেছে।'

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম, আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেপ্তার করো। অলি আহমদকে বলো ব্যাটালিয়ন তৈরি রাখতে, আমি আসছি।

আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানি অফিসার, নৌবাহিনীর চিফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে ট্রাক ঘোরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানল। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল

তুলে নিলাম। পাকিস্তানি অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম, হাত তোলো। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম। নৌবাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। এই মুহূর্তেই আমি নৌব্যাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানল এবং অস্ত্র ফেলে দিল।

আমি কমান্ডিং অফিসারের জিপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওনা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলবেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এল। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাসুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম।

দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম। এখন লক্ষ্মীসোনার মতো আমার সঙ্গে এসো।

সে আমার কথা মানল। আমি তাকে ব্যাটালিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম, আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মেলাল।

ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানি অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরীর সঙ্গে আর মেজর রফিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগের নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সঙ্গেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো।

সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানত। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিল। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনো দিন ভুলবে না : কো-নো-দি-ন না।

সূত্র : *বিচিত্রা*, স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা, ২৬ মার্চ ১৯৭৪

পরিশিষ্ট ২

১৯ দফা কর্মসূচি

কর্মসূচিতে ছিল :

১. সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।
২. সংবিধানের চারটি মূলনীতি, অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।
৩. সর্ব উপায়ে নিজেদের একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।
৪. প্রশাসনের সর্বস্তরে উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৫. সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা।
৬. দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।
৭. দেশে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়ে সবার জন্য অন্তত মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৮. কোনো নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে, তার যথাযথ ব্যবস্থা করা।
৯. দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
১০. সকল দেশবাসীর জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।
১১. সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুবসমাজকে সুসংহত করে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।
১২. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহদান।
১৩. শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।
১৪. সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে জনসেবা এবং দেশ গঠনের মনোবৃত্তি উৎসাহিত করা এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা।
১৫. জনসংখ্যার বিস্ফোরণ রোধ করা।

১৬. সকল বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা।
১৭. প্রশাসন এবং উন্নয়নব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা।
১৮. দুর্নীতিমুক্ত ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।
১৯. ধর্ম, বর্ণ, গোত্রনির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

পরিশিষ্ট ৩

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের ১৩ দফা

১. স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ

লাখ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সব দুশমনকে প্রতিহত করা জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের অন্যতম মূল লক্ষ্য। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট মনে করে যে যারা একদিন আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বহিঃশক্তির সম্প্রসারণবাদী লিপ্সার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছিল, যারা আমাদের দেশের মহান জনগণের পবিত্র রায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে একদলীয় স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল, যাদের হত্যা, লুণ্ঠন ও দুর্নীতি দেশকে দেউলিয়াত্বের মুখোমুখি এনে ফেলেছিল, যারা শান্তিপূর্ণ পন্থায় সামরিক শাসন থেকে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়ার পথে অযৌক্তিক ও অবাস্তব শর্ত আরোপ করে বিভ্রান্তি ও বিঘ্ন সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে, সেই সব চিহ্নিত শক্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। শুধু সতর্ক থাকলেই চলবে না, এদের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্জয় শক্তি ও সংগঠন।

২. গণতান্ত্রিক অধিকার

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ ও অংশগ্রহণের মূল শর্ত হচ্ছে তার গণতান্ত্রিক অধিকার। গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ ও তাকে প্রয়োগ করার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌল দিক। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট তাই নিম্নোক্ত রূপরেখার ভিত্তিতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনির্দিষ্ট করার অঙ্গীকার ঘোষণা করছে:

- নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম, ভাষা, পেশা ও শিক্ষানির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থাকবে।
- বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশ করার, সভা-সমাবেশ করার অধিকারসহ জনগণের সব মৌলিক অধিকার সুনির্দিষ্ট করা হবে।
- আইনের চোখে সবাইকে সমান বলে বিবেচনা করা হবে এবং সবার আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার সমান অধিকার থাকবে এবং তাকে নিশ্চিত করা হবে। জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহকে আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা হবে।

- সকল জনস্বার্থবিরোধী আইন ও অগণতান্ত্রিক বিধিসমূহ দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাজনৈতিক দলবিধি আইনের অবশিষ্ট ধারাসমূহ পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে। সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। বর্তমান শ্রম আইনকে পুনর্বিন্যাস করে শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন ও সকল প্রকার মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।
- সব দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি প্রদান করা হবে এবং দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে বিগত সরকারের আমলে দায়ের করা মামলাসমূহ পর্যালোচনা করা হবে এবং তা প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করা হবে।

৩. ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতা

আমাদের শাসনব্যবস্থায় ধর্ম একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের নীতির ভিত্তি হবে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা, প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালন, প্রচার ও প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করা। ফ্রন্ট সব ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং বৃহত্তর জাতীয় জীবনে তাদের অধিকারসুবিধা ও অংশগ্রহণের সুযোগের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তাদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৪. রাষ্ট্রীয় ও শাসনতান্ত্রিক নীতি

- জনগণ কর্তৃক ধিকৃত শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী বাতিল করে প্রেসিডেন্টকে সরকারের মূল ও প্রধান কর্মকর্তার ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের কার্যপরিধি সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় ধারা সংযোজন করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত পার্লামেন্ট হবে সার্বভৌম। পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, অপারগতাজনিত কারণে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ এবং ইমপিচ করা, সব আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন এবং প্রয়োজনবোধে শাসনতন্ত্র সংশোধন-সংক্রান্ত সব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হবে। উপরন্তু ভবিষ্যৎ সরকারপদ্ধতি নির্ধারণ ও পরবর্তী মেয়াদ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদ্ধতিও এই পার্লামেন্ট নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখবে।
- ১৯৭৭-এর মে মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটের মাধ্যমে লব্ধ জনগণের ম্যান্ডেট অনুযায়ী এ পর্যন্ত শাসনতন্ত্রের যেসব সংশোধন করা হয়েছে, তা রক্ষা করা হবে।
- প্রশাসনের সর্বস্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

৫. পররাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহের মধ্যে পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফ্রন্ট পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত রূপরেখা ঘোষণা করেছে :

- পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে সব রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা এবং সর্বক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের সংগ্রামরত জনগণকে সমর্থন করা এবং স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা।
- আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো বৈদেশিক শক্তির কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ বরদাশত করা হবে না। তবে পৃথিবীর যেকোনো দেশ থেকে রাজনৈতিক শর্তহীন অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে।
- তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, বিশেষ করে আরব বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা, আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকা, ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রাম, রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের বর্ণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামসহ সব জাতি ও জনগণের ন্যায়সংগত জাতীয় মুক্তি ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে সমর্থন দান করা হবে।

৬. সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গত বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটে ফ্রন্টের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচির প্রতি জনগণ যে সমর্থন জানিয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করেই কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতির উন্নয়ন সাধন করতে বদ্ধপরিকর।

৭. কৃষিনীতি

প্রগতিশীল ভূমিনীতির ভিত্তিতে ভূমিব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হবে। এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য হবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভাগ্য উন্নয়ন। ভূমিহীন, গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কৃষকের জীবনধারণের মান উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামগ্রিক স্বার্থে আধুনিক যান্ত্রিক চাষ ও যৌথ সমবায় প্রথা প্রচলনের জন্য সরকার উৎসাহ প্রদান করবে। কৃষক তার অর্থকরী ফসল পাট, ইক্ষু, তামাক, হলুদ, আলু প্রভৃতির ন্যায্যমূল্য যাতে পেতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। কৃষকদের সুলভে সার, বীজ, ঋণ প্রভৃতি প্রদান করা হবে। মোদ্দা কথা, সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ যাতে স্বল্প সময়ে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়, তার ব্যবস্থা করা হবে এবং গ্রামীণ উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে জোরদার করা হবে।

৮. শিল্পনীতি

দেশের নিজস্ব সম্পদ ও জনশক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর ওপর ভিত্তি করে শিল্পনীতি নির্ধারণ করা হবে। জনগণের জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে এ ধরনের বৃহদায়তনের মূল ও ভারী শিল্প রাষ্ট্রের মালিকানায় রাখা হবে। শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প নিয়ামক হবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা থাকবে এবং এ ব্যাপারে অর্থ জোগান ও যুক্তিসংগত মূল্যে কাঁচামাল প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং তা বাজারজাত

করার সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শক্তির দ্রুত বিকাশ সাধন করা হবে, যাতে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র শহর ও গ্রামাঞ্চলকে বিদ্যুতায়িত করা সম্ভব হবে। কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প যথা তাঁত, রেশম, লবণ ও বিড়িশিল্পের সংরক্ষণ, পুনর্গঠন ও বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করা হবে।

৯. শ্রমিক-কর্মচারীদের সমস্যা

জাতীয় পে-কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পে-স্কেল কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে অসংগতি ও অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে, তা দূর করার জন্য এগুলোর পুনর্বিন্যাস সাধন করা হবে। শ্রমিকদের জন্য গঠিত মজুরি কমিশনের রিপোর্ট শিগগিরই প্রকাশ ও কার্যকর করা হবে। শ্রমিক-কর্মচারীরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধানপূর্বক তাদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হবে।

১০. শিক্ষানীতি

বর্তমান ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করে তোলা হবে এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল-কলেজশিক্ষক ও ছাত্রদের সমস্যাবলির ন্যায়সংগত প্রতিবিধান করা হবে।

১১. নারীর অধিকার

নারী সমাজের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। নারীর সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দান করা হবে।

১২. মুক্তিযোদ্ধা

১৯৭১-এর স্বাধীনতাসংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা, যথা দেশের শ্রমিক-কৃষক, যুবক, সশস্ত্র বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার ও তাদের সহযোদ্ধাদের জাতীয় মর্যাদা প্রদান করা হবে। সমাজে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ও উৎপাদনশীল কার্যক্রমে নিয়োজিত করার কাজ জোরদার করা হবে।

১৩. প্রতিরক্ষাব্যবস্থা

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী যাতে আধুনিক সমর উপকরণে সুসজ্জিত হয়ে এবং প্রয়োজনীয় সব রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে দৃঢ় এবং দুর্ভেদ্য করে তুলতে পারে, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

সূত্র : হক ও আলম, পৃ. ৩০৯-৩১২

পরিশিষ্ট ৪

সংসদ নির্বাচনে তুলনামূলক অবস্থান

নির্বাচন	আসন		ভোট (%)	
	আ.লীগ	বিএনপি	আ.লীগ	বিএনপি
১৯৭৯	৩৯	২০৭	২৪.৫৬	৪১.১৭
১৯৯১	৮৮	১৪০	৩০.০৮	৩০.৮১
১৯৯৬	১৪৬	১১৬	৩৭.৪৪	৩৩.৬১
২০০১	৬২	১৯৩	৪০.১৩	৪০.৯৭
২০০৮	২৩০	৩০	৪৯.০০	৩৩.২০

বিএনপির জন্ম ও বিবর্তন
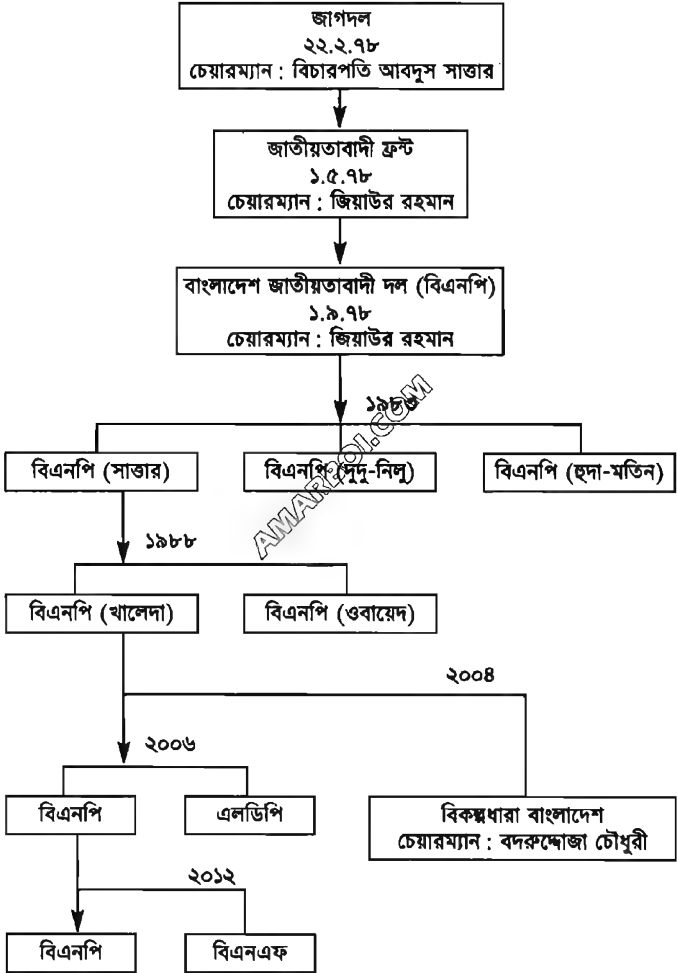
তথ্যনির্দেশ

প্রেক্ষাপট

১. খান, লে. জেনারেল গুল হাসান (১৯৯৬), *পাকিস্তান যখন ভাঙল*, Memoirs of Lt. Gen Gul Hassan Khan-এর ভাষান্তর, অনুবাদ: এ টি এম শামসুদ্দীন, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৬২।
২. *মেজর জলিল রচনাবলী* (১৯৯৭), সম্পাদনা: মাসুদ মজুমদার, মেজর জলিল পরিষদ, ঢাকা, পৃ. ৪৪-৫০।
৩. *Holiday*, 25 June 1972.
৪. *মেজর জলিল রচনাবলী* (১৯৯৭), পৃ. ৫৯-৬১।
৫. হোসেন, মো. আনোয়ার (২০১১), *তাহেরের স্বপ্ন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৩০।
৬. কামালউদ্দিন আহমেদ।
৭. করপোরাল (অব.) আবদুল মজিদ।
৮. *গণকণ্ঠ*, ১ নভেম্বর ১৯৭২।
৯. ডালিম, লে. কর্নেল (অব.) শরিফুল হক (২০০১), *যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা করেছি*, নবজাগরণ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৯০-১৫৫।
১০. Khasru, B. Z. (2014), *The Bangladesh Military Coup and the CIA Link*, Rupa Publications Pvt. Ltd, New Delhi, p. 211-225.
১১. ওই।
১২. ওই।
১৩. ওই।
১৪. ওই।
১৫. Khasru, p. 220-221.
১৬. ইসলাম, মেজর রফিকুল (২০১৪), *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা, ঢাকা, পৃ. ২৯৩।
১৭. Khasru, p-221.
১৮. সফিউল্লাহ, মেজর জেনারেল কে এম (২০০৯), *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৬১-১৬২।
১৯. Khasru, p-225.

২০. ডালিম, পৃ. ২০৯।
২১. Khasru, p. 225.
২২. খান (১৯৯৬), পৃ. ৩০।
২৩. জামিল, কর্নেল শাফায়াত (২০০৯), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৫৪।
২৪. ওই, পৃ. ৭৪-৭৫।
২৫. ওই, পৃ. ৮১।
২৬. ওই, পৃ. ৯৬-৯৭।
২৭. খান, লে. ক. এস আই এম নূরন্নবী (১৯৯৩), *জীবনের যুদ্ধ যুদ্ধের জীবন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১১৫।
২৮. Ziauddin, Lt. Col. M. Hidden Prize, *Holiday*, Dhaka, 20 August 1972.
২৯. ডালিম, পৃ. ৪১০।
৩০. ওই।
৩১. 'পূর্ব বাংলার বীর জনগণ, আমাদের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি, পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান সংগ্রাম চালিয়ে যান' শীর্ষক প্রচারপত্র, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, মার্চ ১৯৭২, উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে : রহমান, ড. সাইদ-উর (২০০৪)। *১৯৭২-১৯৭৫ কয়েকটি দলিল*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২০৭-২১৬।
৩২. আকা ফজলুল হক।
৩৩. Noruzzaman, Quazi (2010), *A Sector Commander Remembers Bangladesh Libaration War 1971*, Writers.ink, Dhaka, p. 2.
৩৪. ওই, পৃ. ৬২।
৩৫. ওই।
৩৬. bdnews24.com, 6 May 2011.
৩৭. খান, লে. কর্নেল (অব.) এস আই এম নূরন্নবী (২০০৪), *রৌমারী রণাঙ্গন*, কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৯।
৩৮. হোসেন (২০১১), পৃ. ১১।
৩৯. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৪), *জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১৩৪-১৩৫।
৪০. ডালিম, পৃ. ৪১০।
৪১. গিয়াসউদ্দিন।
৪২. Lifschultz, Lawrence (1979), *Bangladesh: The Unfinished Revolution*, Zed Press, London, p. 77-87.
৪৩. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনি (২০০২), *বাংলাদেশ রক্তের ঋণ*, *A Legacy of Blood*-এর ভাষান্তর, অনুবাদ : মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ৩৮-৩৯।
৪৪. চৌধুরী, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন (২০০০), *এক জেনারেলের নীরব*

সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৪১-৪২।
৪৫. ওই, পৃ. ৫০-৫১।
৪৬. ওই, পৃ. ৫১-৫২।
৪৭. ওই, পৃ. ৬৯-৭১।
৪৮. মাসকারেনহাস, পৃ. ৪৫-৪৬।
৪৯. হামিদ, লে. কর্নেল (অব.) এম এ (২০১৩), *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৯।
৫০. ওই, পৃ. ১৮-১৯।
৫১. ওই, পৃ. ১৯।
৫২. মাসকারেনহাস, পৃ. ৫৩।
৫৩. ওই, পৃ. ৫৩-৫৫।
৫৪. হামিদ, পৃ. ১৯।
৫৫. ওই, পৃ. ১৮০।
৫৬. মাসকারেনহাস, পৃ. ৫৩।
৫৭. হামিদ, পৃ. ২০।
৫৮. ওই, পৃ. ২০-২১।
৫৯. ওই, পৃ. ২১।
৬০. ওই, পৃ. ১৮১-১৮২।
৬১. কবির, আকবর (২০১০), *আত্মকথা; স্মৃতি-বিস্মৃতির বাংলাদেশ*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃ. ১২৫-১২৬।
৬২. রহমান, মেজর জেনারেল জিয়াউর (১৯৭৪), 'একটি জাতির জন্ম', *বিচিত্রা*, স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা, ২৬ মার্চ ১৯৭৪, ঢাকা।
৬৩. ওই।
৬৪. মোশাররফ, ব্রিগেডিয়ার খালেদ (১৯৭৪), 'জনতার একজন হিসেবে যুদ্ধ করেছি', *বিচিত্রা*, স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা, ২৬ মার্চ ১৯৭৪, ঢাকা।
৬৫. হাসান, মঈদুল (১৯৮৬), *মূলধারা '৭১*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ১৫।
৬৬. খান (২০০৪), পৃ. ৩৩।
৬৭. খান (১৯৯৩), পৃ. ১৭২-১৭৩।
৬৮. মাহমুদ, আনু (২০১৫), *বঙ্গবন্ধু হত্যার রায়*, ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ৫২৮; বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় জেনারেল সফিউল্লাহর জবানবন্দি থেকে উদ্ধৃত।
৬৯. হামিদ, পৃ. ১২-১৩।
৭০. নূরুল ইসলাম চৌধুরী, '১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড : ঘটনার আগে, ঘটনার পরে', *ভোরের কাগজ*, ১৫, ১৬ ও ১৭ আগস্ট ১৯৯৪।
৭১. হোসেন, শাহ মোয়াজ্জেম (২০০২), *বলেছি বলছি বলব*, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, পৃ. ১৩৫-১৩৭।
৭২. ওই।
৭৩. ওই, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

৭৪. ডালিম, পৃ. ৪৫১।
৭৫. মাসকারেনহাস, পৃ. ৪০-৪৩।
৭৬. *ভোরের কাগজ,* ১৫ ও ১৬ আগস্ট ১৯৯৩।
৭৭. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৭৯), 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং আমাদের পার্টির ভূমিকা ও করণীয়', কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত, পৃ. ১৪-১৫।
৭৮. ডালিম, পৃ. ৪২৭-৪৪২।
৭৯. মাসকারেনহাস, পৃ. ৯৯-১০০।
৮০. ওই।
৮১. ডালিম, পৃ. ৪৯২।
৮২. গিয়াসউদ্দিন।
৮৩. হামিদ, পৃ. ৫২।
৮৪. আলম, আনোয়ার উল (২০১৩), *রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১৫৩।
৮৫. *The Bangladesh Observer*, 16 August 1975.
৮৬. দৈনিক *ইত্তেফাক,* ১৬ আগস্ট ১৯৭৫।
৮৭. হোসেন (২০০২), পৃ. ২৫৫।
৮৮. দৈনিক *ইত্তেফাক,* ১৬ আগস্ট ১৯৭৫।
৮৯. হোসেন (২০০২), পৃ. ২৯৭।
৯০. *আহমদ শরীফের ডায়েরি: ভাব-বুদ্বুদ* (২০০৯), জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

উত্থান

১. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 20 August 1975, p. 2413-14.
২. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 28 December, 1974, p. 6641-47.
৩. জামিল, পৃ. ১২৭।
৪. হামিদ, পৃ. ৬৪-৬৫।
৫. জামিল, পৃ. ১০৩।
৬. ওই, পৃ. ১২০-১২১।
৭. ওই, পৃ. ১৩১।
৮. *দৈনিক বাংলা,* ৪ অক্টোবর ১৯৭৫।
৯. হামিদ, পৃ. ৮৪।
১০. হোসেন (২০০২), পৃ. ২৬৬-২৬৭।
১১. হামিদ, পৃ. ৮৫।
১২. ওই, পৃ. ৮৪-৮৯।
১৩. জামিল, পৃ. ১৩০-১৩২।
১৪. ডালিম, পৃ. ৫১০-৫১১।
১৫ হামিদ, পৃ. ৮৯।

১৬. জামিল (২০০০), পৃ. ১৩২-১৩৪।

১৭. হামিদ, পৃ. ৯৭।

১৮. ডালিম, পৃ. ৫৪৩।

১৯. হামিদ, পৃ. ৯৭।

২০. হোসেন (২০০২), পৃ. ২৭০-২৭২।

২১. জামিল, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

২২. ওই, পৃ. ১৩৯।

২৩. *দৈনিক বাংলা*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫।

২৪. Lifsehultz, p. 66.

২৫. *সাম্যবাদ*, চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, পৃ. ১৫।

২৬. হামিদ, পৃ. ১১৮-১২৩।

২৭. 'বিস্মৃত নিয়তি কে বি এম মাহমুদ', আসাদুজ্জামানের নেওয়া আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার, *সাপ্তাহিক*, ঈদসংখ্যা ২০১৫, পৃ. ৭৭।

২৮. ডালিম, পৃ. ৫৪৪।

২৯. হামিদ, পৃ. ১২৪।

৩০. *দৈনিক বাংলা*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫।

৩১. হামিদ, পৃ. ১২৯-১৩০।

৩২. *দৈনিক বাংলা*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫।

৩৩. ওই।

৩৪. সিদ্দিকী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জুবায়ের (২০১২), *আমার জীবন আমার যুদ্ধ*, পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৩১।

৩৫. ওই, পৃ. ৩২।

৩৬. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 31 December 1975, p. 3336-37.

৩৭. 'মোখলেসুর রহমানের (সিধু ভাই) সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা : আমার জীবন-কথা ও সময়', সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : সরদার ফজলুল করিম ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *প্রতিচিন্তা*, ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪।

৩৮. কবির, পৃ. ২২২-২২৬।

৩৯. ওই, পৃ. ১২৬-১২৮।

৪০. *দৈনিক বাংলা*, ১১ জুলাই ১৯৭৬।

৪১. ওই।

৪২. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 29 July 1976, p. 2587-92.

৪৩. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১ আগস্ট ১৯৭৬।

৪৪. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 4 August 1976, p. 2628-29.

৪৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

৪৬. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

৪৭. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

৪৮. ওই।

৪৯. ওই।
৫০. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।
৫১. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।
৫২. ওই।
৫৩. ওই।
৫৪. ওই।
৫৫. ওই।
৫৬. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।
৫৭. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।
৫৮. ওই।
৫৯. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।
৬০. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১০ অক্টোবর ১৯৭৬।
৬১. মিয়া, এম এ ওয়াজেদ (১৯৮৩), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ২৭৮।
৬২. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৩১ অক্টোবর ১৯৭৬।
৬৩. ওই।
৬৪. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২২ নভেম্বর ১৯৭৬।
৬৫. মাসকারেনহাস, পৃ. ১৫৫-১৫৬।
৬৬. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 24 December 1976, p. 3493-94.
৬৭. Khasru, p. 332-335.
৬৮. সায়েম, আবু সাদাত মোহাম্মদ (১৯৯৮), *বঙ্গভবনের শেষ দিনগুলি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৩৫-৩৬।
৬৯. *The Bangladesh Observer*, 12 November 1975.
৭০. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৭।
৭১. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 23 April 1977, p. 5397-5403.
৭২. ওই।
৭৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ মে ১৯৭৭।
৭৪. মিয়া, পৃ. ২৮৫।
৭৫. আহমদ, মওদুদ (২০১০), *চলমান ইতিহাস*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ১৩৫।
৭৬. Milam, William B (2009), *Bangladesh and Pakistan: Flirting with Failure in South Asia*, HURST Publishers Ltd., London, p. 55.
৭৭. হাবীব, খালেদা (১৯৯১), *বাংলাদেশ; নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা ১৯৭০-৯১*, প্রকাশক : এ. আর. মুরশেদ, ঢাকা, পৃ. ১৬২-১৬৬।
৭৮. খান, মিজানুর রহমান (২০১০), বিএনপির জন্ম যেভাবে সেনানিবাসে, *প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১০।
৭৯. 'মোখলেসুর রহমানের সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা', প্রাগুক্ত।
৮০. মিয়া, ২৮৪-২৮৫।

৮১. কবির, পৃ. ১২৭-১২৮।
৮২. হোসেন (২০০২), পৃ. ৩০৬-৩০৮।
৮৩. মিয়া, পৃ. ২৭১-২৭৩।
৮৪. খালেকুজ্জামান, চৌধুরী (২০০৭), *সামরিক জীবনের স্মৃতি*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ১২৯।
৮৫. মিয়া, পৃ. ২৮৫-২৮৭।
৮৬. হামিদ, পৃ. ১৭২।
৮৭. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 14 October 1977, p. 7553.
৮৮. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 28 November 1977, p. 7857-61.
৮৯. *The Bangladesh Times*, 29 November 1977.
৯০. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৩০ নভেম্বর; *দৈনিক বাংলা*, ১ ডিসেম্বর।
৯১. *দৈনিক বাংলা*, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৭।
৯২. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৭।
৯৩. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৭।
৯৪. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৮০), 'রাজনৈতিক রিপোর্ট: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত', ২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, ঢাকা, পৃ. ৪৩।
৯৫. কামালউদ্দিন আহমেদ।
৯৬. 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব'। ৮, ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত, পৃ. ৩।
৯৭. হাবীব, পৃ. ১৬৩-১৬৪।
৯৮. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৭।
৯৯. খান (২০১০), *প্রথম আলো*, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১০।
১০০. ওই।
১০১. আরিফ মঈনুদ্দীন।
১০২. ওই।
১০৩. ওই।
১০৪. ওই।
১০৫. শাহীন রাজা।
১০৬. খায়রুজ্জামান বাবুল।
১০৭. আরিফ মঈনুদ্দীন।
১০৮. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ মার্চ ১৯৭৮, www.bnpbd.org
১০৯. হক, সাহাবুল ও আলম, বায়েজীদ (২০১৪), *বাংলাদেশের জোট রাজনীতি ১৯৫৪-২০১৪*, অবসর, ঢাকা, পৃ. ১০৭; উদ্ধৃতি: আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২০৭।
১১০. আহমদ (২০১০), পৃ. ১৪৪।

১১১. রনো, হায়দার আকবর খান (২০১২), *শতাব্দী পেরিয়ে,* তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৬৩-৩৬৫।
১১২. 'মোখলেসুর রহমানের (সিধু ভাই) সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা', প্রাগুক্ত।
১১৩. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 17 April 1978, p. 1041.
১১৪. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (২০১৩), *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৪৯-৫০।
১১৫. হক ও আলম, পৃ. ১০৮।
১১৬. *সংবাদ,* ৮ মে ১৯৭৮।
১১৭. ওই।
১১৮. *সংবাদ,* ১২ মে ১৯৭৮।
১১৯. *সংবাদ,* ১৪ মে ১৯৭৮।
১২০. দৈনিক *ইত্তেফাক,* ১৬ মে ১৯৭৮।
১২১. দৈনিক *ইত্তেফাক,* ২৮ মে ১৯৭৮।
১২২. *সংবাদ,* ১ জুন ১৯৭৮।
১২৩. হক ও আলম, পৃ. ১০৯।
১২৪. Bangladesh Election Commission, *Report on Election to the Office of President: Bangladesh 1978*, p. 45-46.
১২৫. *সংবাদ,* ৫ জুন ১৯৭৮।
১২৬. দৈনিক *ইত্তেফাক,* ৭ জুন ১৯৭৮।
১২৭. *সংবাদ,* ১৯ জুন ১৯৭৮।
১২৮. রহমান (২০১৩), পৃ. ৫০।
১২৯. হাবীব, পৃ. ১৬৪।
১৩০. মো. ওবায়দুল হক ভূঁইয়া।
১৩১. ওই।
১৩২. ওই।
১৩৩. ম. সাজ্জাদ হোসেন।
১৩৪. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ।
১৩৫. নাজমুল হুদা।
১৩৬. হক ও আলম, পৃ. ১১৪।
১৩৭. চৌধুরী, এ কিউ এম বদরুদ্দোজা, 'জিয়াউর রহমানের সংগঠন কৌশল', www.bnpbd.org
১৩৮. *দৈনিক বাংলা,* ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, www.bnpbd.org
১৩৯. নাজমুল হুদা।
১৪০. *সংবাদ,* ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, www.bnpbd.org
১৪১. *সংবাদ,* ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।
১৪২. দৈনিক *ইত্তেফাক,* ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।
১৪৩. দৈনিক *ইত্তেফাক,* ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।

ভিত্তি

১. মাহমুদ, আনু (২০১৫), সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ১৭১-১৭২।
২. চৌধুরী, শ্রী নীরদচন্দ্র (১৯৯৭), *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৬৮-৮৯।
৩. শরীফ, আহমদ (২০১৪), *রাজনীতির সংকট*, সংকলক : নেহাল করিম, মহাকাল, ঢাকা, পৃ. ১১০-১১১।
৪. ওই।
৫. *Holiday*, Dhaka, 27 August 1978; quoted in Hossain, Golam (1988), *General Ziaur Rahman and the BNP: Ploitical Transformation of a Military Regime*, UPL, Dhaka, p. 63.
৬. 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ', জিয়াউর রহমান, www.bnpbd.org
৭. Franda, Marcus (1981), Ziaur Rahman and Bangladeshi Nationalism, *Economic and Political Weakly*, Vol. XVI, No. 10-11-12, 1981; quoted in Hossain (1988), p. 63
৮. শরীফ (২০১৪), পৃ. ২৩।
৯. *আহমদ শরীফের ডায়েরি*, পৃ. ৬৪।
১০. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ জুন ১৯৬৭।
১১. bdtoday.24.com, 24 October 2014.
১২. Ahmed, Emajuddin, (ed.) (1989), *Society and Politics in Bangladesh*, Academic Publishers, Dhaka, p. 138.
১৩. হক ও আলম, পৃ. ১৮১।
১৪. আহমদ, আবুল মনসুর (২০০২), *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল। ঢাকা, পৃ. ৬৩৪।

বিস্তার

১. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 18 November 1978, p. 5819-21.
২. আহমদ (২০১০), পৃ. ১৪২।
৩. চৌধুরী, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন (২০০৩), *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১১৬।
৪. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 18 December 1978, p. 7109-22.
৫. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৮।
৬. আহমদ (২০১৪), পৃ. ২৩৭।
৭. রহমান (২০১৩), পৃ. ৫২।
৮. হক ও আলম, পৃ. ১১৯-১২০।
৯. *সংবাদ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯।
১০. 'মোখলেসুর রহমানের (সিধু ভাই) সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা'।

১১. ওই।
১২. হক ও আলম, পৃ. ১২১-১২২।
১৩. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 7 April 1979, p. 1989-92.
১৪. নাজমুল হুদা।
১৫. হাবীব, পৃ. ১৬৩।
১৬. Khasru, p. 360.
১৭. আরিফ মঈনুদ্দীন।
১৮. আহমদ (২০১০), পৃ. ১৭৮-১৮৯।
১৯. হক ও আলম, পৃ. ১২২; উদ্ধৃতি : এমাজউদ্দীন আহমদ, 'বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনীতিক : নির্ভর ও দলছুট প্রবণতা', *বিক্রম*, ২৩ নভেম্বর ১৯৮৮।
২০. হক ও আলম, পৃ. ১২২।
২১. *সংবাদ*, ১৭ মার্চ ১৯৭৯।
২২. হক ও আলম, পৃ. ১২৪-১২৫।
২৩. *মোহাম্মদ ফরহাদের রাজদ্রোহ মামলা* (১৯৮০), প্রাচ্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৩-১৭।
২৪. ওই।
২৫. রনো, পৃ. ৩৬৯।
২৬. আহমদ (২০১০), পৃ. ১৫৬।
২৭. করপোরাল (অব.) আবদুল মজিদ।
২৮. চৌধুরী (২০০৩), পৃ. ১১৬-১১৭।
২৯. আরিফ মঈনুদ্দীন।
৩০. ওই।
৩১. ওই।
৩২. মাহফুজ উল্লাহ।
৩৩. ম. সাজ্জাদ হোসেন।
৩৪. আহমদ (২০১০), পৃ. ১৫৬-১৫৭।
৩৫. *প্রথম আলো*, মে ১৯৯৪।
৩৬. ওই।
৩৭. চৌধুরী (২০০৩), পৃ. ১২১-১২২।
৩৮. ম. সাজ্জাদ হোসেন।
৩৯. আহমদ (২০১০), পৃ. ১৫৭।
৪০. চৌধুরী (২০০৩), পৃ. ১২৬।
৪১. মাহফুজ উল্লাহ, 'প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হয়েছিলেন কেন', www.bnpbd.org

জিয়ানামা

১. Hossain, Golam (1985), *General Ziaur Rahman and the BNP; Political Transformation of a Military Regime*, UPL, Dhaka, p. 17.

২. ওই, পৃ. ১৭।
৩. Ahmed, Emajuddin, *The August 1975 Coup D'etat*; compiled in Ahmed, Emajuddin; ed. (1989), *Society and Politics in Bangladesh*, Academic Publishers, Dhaka, p. 150.
৪. Hossain (1988), p. 54.
৫. ওই, পৃ. ৫৫।
৬. Rizvi, Gowhar (1985), *Bangladesh: The Struggle for the Restoration of Democracy*, Bangladesh Society, Europe, London, p. 54.
৭. Hossain (1988), p. 27.
৮. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৭৯), পৃ. ২৫।
৯. চৌধুরী, এ কিউ এম বদরুদ্দোজা, 'জিয়াউর রহমানের সাংগঠনিক কৌশল', www.bnpbd.org
১০. আরিফ মঈনুদ্দীন।
১১. হোসেন (২০১১), পৃ. ৪৩।
১২. সৈয়দ আবদাল আহমেদের নেওয়া কাফি খানের সাক্ষাৎকার, www.bnpbd.org
১৩. Hossain (1988), p. 55.
১৪. এম শামসুল ইসলাম।
১৫. আহমদ (২০১০), পৃ. ৪৮৬।
১৬. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৪), *জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২৩৫।
১৭. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, বর্ষপঞ্জি, নবম বর্ষ, সংখ্যা ২৮, ডিসেম্বর ১৯৮০।
১৮. নেহাল করিম।
১৯. আলী, লে. জেনারেল (অব.) মীর শওকত, 'যুদ্ধের কথা কষ্টের কথা', আহমদ, মহিউদ্দিন (২০০৬) সম্পাদিত *আমাদের একাত্তর* গ্রন্থে সংকলিত, গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, পৃ. ৪৫।
২০. Hossain (1988), p. 55.
২১. ওই।
২২. ওই, পৃ. ৩৬-৩৭।
২৩. আহমদ (২০১০), পৃ: ১৪৩।
২৪. Hossain (1988), p. 44.
২৫. ওই, পৃ. ৫৫।
২৬. Zaman, M. Q., 'Ziaur Rahman: Leadership Styles and Mobilization Politics'; Compiled in Khan, Mohammad Mahabbat and Thorp, John P; ed, (1984); *Bangladesh: Society Politics and Bureaucracy*, Centre for Administrative Studies, Dhaka, p. 112.
২৭. আহমদ (২০১০), পৃ. ১৯৬-১৯৭।
২৮. পারভেজ, আলতাফ (২০১৫), *মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের*

পুনর্পাঠ, ঐতিহ্য, ঢাকা, পৃ. ৫৭৮।
২৯. শচিন কর্মকার।
৩০. Saez, Laurance (2011), *The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC): An emarging collabaration architecture*, Routledge, Oxford, p. 11.
৩১. Ahsan, Abul (1992), *SAARC- A Perspective*, UPL, Dhaka, p. 25-26.
৩২. Ahmed, Mohiuddin, 'A Thorny Path: Regional Cooperation in South Asia'; Compiled in *Asian Exchange*, ARENA, Hongkong, 1997.
৩৩. চৌধুরী, এ কিউ এম বদরুদ্দোজা, www.bnpbd.org
৩৪. চৌধুরী খালেকুজ্জামান।
৩৫. ওই।
৩৬. কবির, শাহরিয়ার (২০১২) সম্পাদিত, *সেক্টর কমান্ডাররা বলছেন: মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১১-১২।
৩৭. ওই।

রাজপথে

১. আহমদ (২০১০), পৃ. ২০৬।
২. হক ও আলম, পৃ. ১৩৪।
৩. আহমদ (২০১০), পৃ. ২০৭।
৪. ওই, পৃ. ২১০।
৫. হাবীব, পৃ. ১৪৫।
৬. তথ্য মন্ত্রণালয় (১৯৮২), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র*, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮।
৭. রনো, পৃ. ২৯২।
৮. আহমদ (২০১০), পৃ. ২১১-২১৩।
৯. *বিচিত্রা*, 'একটি জাতির জন্ম', মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, ৫ জুন ১৯৮১, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮।
১০. হক ও আলম, পৃ. ১৩৪।
১১. ওই, পৃ. ১৩৫।
১২. ওই।
১৩. লেনিন, নূহ-উল-আলম (২০১৫),. *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৪৫৮।
১৪. হক ও আলম, পৃ. ১৩৬।
১৫. ওই, ১৩৫-১৩৮।
১৬. ওই।
১৭. ওই, পৃ. ১৩৯।
১৮. ওই।

১৯. ওই।

২০. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (তারিখ নেই), 'রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৮১: পর্যালোচনামূলক রিপোর্ট'। কেন্দ্রীয় কমিটির ২২-২৩ নভেম্বর তারিখের সভায় গৃহীত, পৃ. ৩৩।

২১. রহমান (২০১৩), পৃ. ৫৯।

২২. আহমদ (২০১০), পৃ. ২১৮-২১৯।

২৩. সায়যাদ কাদির।

২৪. আহমদ (২০১০), পৃ. ২১৯-২২২।

২৫. ওই, পৃ. ২২২-২২৩।

২৬. ওই, পৃ. ২২৩-২২৪।

২৭. www.bnpbd.org

২৮. ওই, পৃ. ২২৮।

২৯. আহমদ (২০১০), পৃ. ২২৬।

৩০. ওই, পৃ. ২২৮-২২৯।

৩১. *বাংলার বাণী*, ৮ মার্চ ১৯৮২।

৩২. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৮২।

৩৩. রনো, পৃ. ৩৭২-৩৭৩।

৩৪. হক ও আলম, পৃ. ১৪৮।

৩৫. রনো, পৃ. ৩৬৬-৩৮০।

৩৬. হক ও আলম, পৃ. ১৪৪।

৩৭. *বিচিত্রা*, ৬ জানুয়ারি ১৯৮৪।

৩৮. এস এম ইউসুফ।

৩৯. আবুল হাসিব খান।

৪০. হক ও আলম, পৃ. ১৪৯।

৪১. লেনিন, পৃ. ৮৫।

৪২. এস এম ইউসুফ।

৪৩. হক ও আলম, পৃ. ১৪৮।

৪৪. বেগম খালেদা জিয়া।

৪৫. সংগ্রাম ও গৌরবের ৩৫ বছর, www.bnpbd.org

৪৬. চৌধুরী, মিজানুর রহমান (২০০১), *রাজনীতির তিন কাল*, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃ. ৩৯৩।

৪৭. দৈনিক *দেশ*, ১০ এপ্রিল ১৯৮৪।

৪৮. রনো, পৃ. ৩৮৭-৩৮৮।

৪৯. ওই, পৃ. ৩৮৭।

৫০. ওই, পৃ. ৩৯৮।

৫১. ওই, পৃ. ৪০৮।

৫২. চৌধুরী (২০০১)।

৫৩. হক ও আলম, পৃ. ১৫১।
৫৪. Jahan, Rounaq (2015), *Political Parties in Bangladesh: Challenges of Democratization*, Prothoma Prokashan, Dhaka, p. 31-32.
৫৫. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
৫৬. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৮৫), 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট (মে ১৯৮৪ থেকে জুন ১৯৮৫)', সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ প্রদত্ত, পৃ. ৬-৭।
৫৭. ওই, পৃ. ২১-২২।
৫৮. হক ও আলম, পৃ. ১৫৪।
৫৯. *The Bangladesh Observer*, 28 May 1986.
৬০. www.bnpbd.org
৬১. Jahan, p. 32.
৬২. চৌধুরী (২০০১), পৃ. ২১৮।
৬৩. রনো, পৃ. ৪২২।
৬৪. ওই, পৃ. ৪২২-৪২৪।
৬৫. ওই, পৃ. ৪২৪।
৬৬. ওই, পৃ. ৪২৫।
৬৭. চৌধুরী (২০০১), পৃ. ২১৮।
৬৮. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৮৫), পৃ. ২৭-২৮।
৬৯. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৮৬), 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৮৬: সাধারণ সম্পাদকের পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন', পৃ. ৫-৬।
৭০. ওই, পৃ. ৭-১১।
৭১. ওই, পৃ. ১২-১৫।
৭২. ওই, পৃ. ১৫-১৬।
৭৩. হক ও আলম, পৃ. ১৫৬।
৭৪. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৮৬), পৃ. ২০-২১।
৭৫. ওই, পৃ. ২৪।
৭৬. রনো, পৃ. ৪২৯।
৭৭. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৮৬), পৃ. ২৫।
৭৮. Hasanuzzaman, Al Masud (1998), *Role of Opposition Bangladesh Politics*, UPL, Dhaka, p. 117.
৭৯. 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—বিএনপি, নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৯১', www.bnpbd.org
৮০. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
৮১. মিয়া, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪।
৮২. *The Bangladesh Observer*, 6 March 1988.
৮৩. www.bnpbd.org

৮৪. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন।
৮৫. খান, মে. জে. মনজুর রশীদ (অব.) (২০১২), *আমার সৈনিক জীবন: পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১৯৪-১৯৫।
৮৬. রনো, পৃ. ৪৩৮।
৮৭. খান, মে. জে. মনজুর রশীদ (২০১২), *আমার সৈনিক জীবন: পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২৪৮।
৮৮. ওই, পৃ. ২৫২-২৬৪।
৮৯. রহমান, মতিউর (২০০৪), *কার রাজনীতি কীসের রাজনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ২৪২-২৪৩; 'এরশাদের শেষ ষড়যন্ত্র', *ভোরের কাগজ*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭।
৯০. হাবীব, পৃ. ১৭১।
৯১. নেহাল করিম।
৯২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাদা দলের সভার কার্যবিবরণী, ৪ এপ্রিল, ১৯৮৮।
৯৩. নেহাল করিম।
৯৪. ওই।
৯৫. ওই।

নবযাত্রা

১. হাবীব, পৃ. ১১৮-১১৯।
২. হক ও আলম, পৃ. ১৬৮।
৩. হায়দার আকবর খান রনো।
৪. নঈম জাহাঙ্গীর।
৫. হায়দার আকবর খান রনো।
৬. ওই।
৭. নঈম জাহাঙ্গীর।
৮. হোসেন, গোলাম ও ইমাম, তৌফিক (১৯৯২); *নির্বাচন ও গণতন্ত্র, সরকার ও রাজনীতি*, গোলাম হোসেন সম্পাদিত, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ২৫৯।
৯. হক, আবুল ফজল (১৯৯২), *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, টাউন স্টোরস, রংপুর, পৃ. ১৭৩-১৭৪, উদ্ধৃত হয়েছে হক ও আলম, পৃ. ১৬৯।
১০. হক ও আলম, পৃ. ১৬৯।
১১. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
১২. হায়দার আকবর খান রনো।
১৩. হাবীব, পৃ. ১৩৩-১৪৩।
১৪. হক ও আলম, পৃ. ১৭০।
১৫. Jahan, p. 36.
১৬. হক ও আলম, পৃ. ১৭০।

১৭. Sobhan, Rahman (1995), *Bangladesh: Politics of Governance*, UPL, Dhaka, p. 281.
১৮. রহমান (২০১৩), পৃ. ৮৪।
১৯. ওই, পৃ. ৮৪-৮৫।
২০. ওই, পৃ. ৮৫।
২১. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ মার্চ ১৯৯২।
২২. খান (২০১২), পৃ. ৩০৬।
২৩. ওই, পৃ. ৩০৭-৩১১।
২৪. *দৈনিক বাংলা*, ২ জুলাই ১৯৯২।
২৫. খান (২০১২), পৃ. ৩৯৩।
২৬. ওই, পৃ. ৩১৪।
২৭. রহমান (২০১৩), পৃ. ৮৬।
২৮. ওই, পৃ. ৮৭।
২৯. *The Financial Express*, Dhaka, 22 January 2015; www.thefinancialexpressbd.com/2015/01/22
৩০. *The Bangladesh Observer*, 3 January 1992.
৩১. *The Daily Star*, 8 January 1992.
৩২. *The Daily Star*, 13 January 1992.
৩৩. Firoj, Jalal (2012), *Democracy in Bangladesh; Conflicting Issues and Conflict Resolution*, Bangla Academy, Dhaka, p. 63.
৩৪. রহমান (২০১৩), পৃ. ৮৮।
৩৫. ওই।
৩৬. ওই।
৩৭. আনিসুজ্জামান (২০১৫), *বিপুলা পৃথিবী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৪৩১।
৩৮. ওই, পৃ. ৪২৬-৪২৮।
৩৯. ওই, পৃ. ৪২৮।
৪০. *আজকের কাগজ*, ২৭ মার্চ ১৯৯২।
৪১. *The Bangladesh Observer*, 29 March 1992.
৪২. Firoj, p. 66.
৪৩. ওই।
৪৪. *The Bangladesh Observer*, 23 April 1993.
৪৫. ওই।
৪৬. *The Daily Star*, 23 June 1993.
৪৭. *ভোরের কাগজ*, ১৮ জুলাই ১৯৯২।
৪৮. রহমান (২০১৩), পৃ. ৯৫।
৪৯. *আহমদ শরীফের ডায়েরি : ভাব-বুদ্বুদ*, পৃ. ১১৯-১২০।
৫০. *সংবাদ*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।

৫১. *সংবাদ*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।
৫২. *ভোরের কাগজ*, ২০ মার্চ ১৯৯৪।
৫৩. *ভোরের কাগজ*, ২১ মার্চ ১৯৯৪।
৫৪. Hasanuzzaman, p. 168-169.
৫৫. *বিচিত্রা*, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৪।
৫৬. *The Daily Star*, 22 April 1994.
৫৭. Chowdhury, Dilara (1993), *Democracy in Bangladesh: Politics and Prospects*, Asian Studies, No. 13, p. 5; quotein in Hasanuzzaman, p. 170.
৫৮. Hasanuzzaman, p. 150-151.
৫৯. ওই, পৃ. ১৬৭।
৬০. খান, মিজানুর রহমান (২০০২), *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক*, হাসি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১২৪-১২৫; উদ্ধৃত হয়েছে, হক ও আলম, পৃ. ১৭৬।
৬১. হক ও আলম, পৃ. ১৭৬।
৬২. রহমান (২০১৩), পৃ. ৯৬।
৬৩. হক ও আলম, পৃ. ১৭৬।
৬৪. রহমান (২০১৩), পৃ. ৯৬।
৬৫. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৪।
৬৬. *ভোরের কাগজ*, ৪ নভেম্বর ১৯৯৫।
৬৭. *ভোরের কাগজ*, ১১ নভেম্বর ১৯৯৫।
৬৮. *জনকণ্ঠ*, ১৪ নভেম্বর ১৯৯৫।
৬৯. *জনকণ্ঠ*, ৯ এপ্রিল ১৯৯৬।
৭০. Election Commission, Pakistan (1972), *Repart on General Election 1970-71*, Vol. 1, p. 172, 216-17, Islamabad.
৭১. ওই।
৭২. *আহমদ শরীফের ডায়েরি*, পৃ. ৩৪।
৭৩. ওই, পৃ. ২০৩।
৭৪. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২ অক্টোবর ১৯৯৪।
৭৫. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৭ জানুয়ারি ১৯৯৫।
৭৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ জুন ১৯৯৫।
৭৭. *দৈনিক বাংলা*, ৮ জুন ১৯৯৫।
৭৮. Hasanuzzaman, p. 171.
৭৯. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৫।
৮০. *সংবাদ*, ১১ জানুয়ারি ১৯৯৬।
৮১. *জনকণ্ঠ*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৬।
৮২. *জনকণ্ঠ*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
৮৩. *সংবাদ*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
৮৪. *জনকণ্ঠ*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।

৮৫. *সংবাদ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
৮৬. *জনকণ্ঠ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
৮৭. *ভোরের কাগজ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
৮৮. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
৮৯. *সংবাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
৯০. *জনকণ্ঠ*, ১০ মার্চ ১৯৯৬।
৯১. *ভোরের কাগজ*, ১৪ মার্চ ১৯৯৬।
৯২. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৯৬।
৯৩. *সংবাদ*, ২৬ মার্চ ১৯৯৬।
৯৪. হক ও আলম, পৃ. ১৭৭।
৯৫. *সংবাদ*, ২৮ মার্চ ১৯৯৬।
৯৬. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৩১ মার্চ ১৯৯৬।
৯৭. হাসিনা, শেখ (১৯৯৬), সম্পাদিত, *বিএনপির দুঃশাসন: উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের নমুনা*, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা, পৃ. ৩২৪-৩২৫।
৯৮. রহমান (২০১৩), পৃ. ১০০।
৯৯. দৈনিক *সংগ্রাম*, ১১ এপ্রিল ১৯৯৬।
১০০. দৈনিক *সংগ্রাম*, ৫ জুন ১৯৯৬।

বিরোধী দলে

১. *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ২৪ এপ্রিল ১৯৯৬, উদ্ধৃত হয়েছে, রহমান (২০১৩), পৃ. ৯৭-৯৮।
২. রহমান (২০১৩), পৃ. ১০১।
৩. ওই, পৃ. ১০১।
৪. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (২০১০), *তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়ভার*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৪৮।
৫. ওই।
৬. ওই, পৃ. ১৭৭-১৭৮।
৭. ওই, পৃ. ৪৪।
৮. ওই, পৃ. ১২১-১২২।
৯. ওই, পৃ. ১২৭।
১০. Hassanuzzaman, p. 219.
১১. *আহমদ শরীফের ডায়েরি*, পৃ. ১৬৯-১৭০।
১২. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭।
১৩. Hassanuzzaman, p. 215.
১৪. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৭ মে ১৯৯৮।
১৫. আহমদ, কর্নেল (অব.) অলি (২০০১), *আমার সংগ্রাম আমার রাজনীতি*, এশিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা, পৃ. ৭০।

১৬. রহমান (২০১৩), পৃ. ১০৯।
১৭. ওই, পৃ. ১২২।
১৮. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৭ জানুয়ারি ১৯৯৯।
১৯. *ভোরের কাগজ*, ৭ জানুয়ারি ১৯৯৯।
২০. হক ও আলম, পৃ. ১৮৮-১৮৯।
২১. *প্রথম আলো*, ২০ মে ২০০১।
২২. আহমদ (২০০১), পৃ. ৭৯-৮০।
২৩. Firoj, Jalal (2012), *Democracy in Bangladesh: Conflicting Issue Conflict Resolution*, Bangla Academy, Dhaka, p. 201-203.
২৪. *আজকের কাগজ*, ২৬ আগস্ট ১৯৯৬।
২৫. ওই।
২৬. Firoj, p. 204.
২৭. *The Bangladesh Observer*, 16 April 1998.
২৮. *The Daily Star*, 17 April 1998.
২৯. ওই।
৩০. 'BNP has Insulted Parliament', Mahfuz Anam, *The Daily Star*, 17 April 1988.
৩১. Firoj, p. 205.
৩২. *সংবাদ*, ১০ নভেম্বর ১৯৯৯।
৩৩. 'আমরা লজ্জিত, জাতি স্তম্ভিত, আপনারা?' সোহরাব হাসান, *সংবাদ*, ১২ নভেম্বর ১৯৯১।
৩৪. *ইনকিলাব*, ৫ জুলাই ১৯৯৭; Firoj, p. 209.
৩৫. হাই, মোহাম্মদ অবদুল ও পাশা, আনোয়ার সম্পাদিত (১৯৬৭), *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, পৃ. ১৫।
৩৬. '1153 hartals in 52 years', Ajay Das Gupta, *The Daily Star*, Dhaka, 26 January 2000.
৩৭. 'Politics of Confrontation: Retrospect and prospect', Akbar Ali Khan, *The Daily star*, 24 February 2009; quoted in Firoj, p. 79.
৩৮. Firoj, p. 196.
৩৯. ওই, পৃ. ২১০।
৪০. *প্রথম আলো*, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১।
৪১. রহমান (২০১৩), পৃ. ১২৪।
৪২. ওই, পৃ. ১২৫।
৪৩. ওই।
৪৪. *প্রথম আলো*, ২৮ জুন ২০০১।
৪৫. রহমন (২০১৩), পৃ. ১২৮।
৪৬. *প্রথম আলো*, ১০ আগস্ট ২০০১।

৪৭. রহমান (২০১৩), পৃ. ১২৯।
৪৮. ওই, পৃ. ১৩০।
৪৯. ওই, পৃ. ১৩১-১৩২।
৫০. ওই, পৃ. ১৩৩-১৩৪।
৫১. হক ও আলম, পৃ. ১৯৪।

দ্বিতীয় যাত্রা

১. রহমান (২০১৩)।
২. চৌধুরী, ডা. শিরীন শারমিন, 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার দাবানলে নারী ও শিশু নির্যাতন; দুঃশাসনের চার বছর: সংকট ও উত্তরণের পথ'-এ সংকলিত (২০০৬), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা, পৃ. ২০৮।
৩. রহমান (২০০৪), পৃ. ১৩৬, *প্রথম আলো,* ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩।
৪. লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, লেখক ওই সময় ওয়ারপোর পরামর্শক ছিলেন।
৫. রহমান (২০০৪), পৃ. ৮৭-৮৮, *প্রথম আলো,* ২২ জুন ২০০২।
৬. *The Daily Star*, 8 March 2009.
৭. *প্রথম আলো,* ২১ আগস্ট ২০১৫।
৮. ওই।
৯. ওই।
১০. ওই।
১১. বিএনপির ময়নাতদন্ত, *মানবজমিন,* ৫ জুলাই ২০১৫।
১২. *প্রথম আলো,* ১৭ আগস্ট ২০১৫।

বিপর্যয়

১. হক ও আলম, পৃ. ২০৮।
২. ওই।
৩. রহমান (২০১৩), পৃ. ১৮০-১৮১।
৪. ওই।
৫. *প্রথম আলো,* ২৮ অক্টোবর ২০০৬।
৬. ওই।
৭. ওই।
৮. 'ফখরুদ্দীনের অস্থির অপেক্ষা', *মানবজমিন,* ৭ জুলাই ২০১৫।
৯. হক ও আলম, পৃ. ২১০।
১০. 'K M Hasan not willing to become chief adviser to the next caretaker government', Joyonto Acharjee, bdnews24.com, 16 October 2005.
১১. রহমান (২০১৩), পৃ. ১৮৩।
১২. *প্রথম আলো,* ২৯ অক্টোবর ২০০৬।
১৩. ওই।

১৪. *প্রথম আলো,* ৩০ অক্টোবর ২০০৬।
১৫. bdnews24, 11 October 2011.
১৬. 'Khaleda Admits 2006 Mistake', Rakib Hasnet Sumon, *The Daily Star*, 6 August 2012.
১৭. 'ফখরুদ্দীনের অস্থির অপেক্ষা', *মানবজমিন,* ৭ জুলাই ২০১৫।
১৮. রহমান (২০১৩), পৃ. ১৮৯।
১৯. *প্রথম আলো,* ৩১ অক্টোবর ২০০৬।
২০. ওই, ১৮ নভেম্বর ২০০৬।
২১. ওই, ১২ ডিসেম্বর ২০০৬।
২২. ওই, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬।
২৩. ওই, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৬।
২৪. ওই, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৬।
২৫. ওই, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৬।
২৬. ওই, ২১ ডিসেম্বর ২০০৬।
২৭. ওই, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৬।
২৮. ওই, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৬।
২৯. ওই, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৬।
৩০. ওই, ৪ জানুয়ারি ২০০৭।
৩১. ওই, ৬ জানুয়ারি ২০০৭।
৩২. ওই, ৭ জানুয়ারি ২০০৭।
৩৩. রহমান (২০১৩), পৃ. ১৯৫।
৩৪. *প্রথম আলো,* ১১ জানুয়ারি ২০০৭।
৩৫. Tharoor, Ishan. General Command, *Time Magazine*, 19 June 2008, wikileaks
৩৬. Samad, Selim, General Moeen Purge 1/11 key Players in Power Struggle to Regain Supremacy, Counter Currents, Countercurrents.org
৩৭. টিপু সুলতান, '১/১১-এর চূড়ান্ত ক্ষণ : বঙ্গভবনে সেই সময় যা ঘটেছিল', *প্রথম আলো,* ১১ জানুয়ারি ২০০৮।
৩৮. আহমেদ, জেনারেল মইন ইউ (২০০৯), *শান্তির স্বপ্নে : সময়ের স্মৃতিচারণ,* এশিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা, পৃ. ৩২৩-৩২৪।
৩৯. ওই, পৃ. ৩২৪-৩২৫।
৪০. Samad.
৪১. খোদা বখশ চৌধুরী।
৪২. ফখরুদ্দীনের অস্থির অপেক্ষা, *মানবজমিন,* ৭ জুলাই ২০১৫।
৪৩. হক ও আলম, পৃ. ২১৬।
৪৪. 'ড. ফখরুদ্দীনের কাছে প্রত্যাশা', মতিউর রহমান, *প্রথম আলো,* ১৪ জানুয়ারি ২০০৭।

৪৫. রহমান (২০১৩), পৃ. ১৯৮।
৪৬. www.cpd.org.bd
৪৭. ওই।
৪৮. 'Younus not willing to be caretaker chief', The Daily Star, 18 October 2006.
৪৯. 'Younus seeks people's views on floating political party', *The Daily Star*, Dhaka, 12 February 2007.
৫০. 'Bangladesh Nobel Laureate Announces His Political Party's Name', All Headline News, 18 February 2007.
৫১. 'Bangladesh at a crossroads', BBC, 18 August 2007.
৫২. 'Sheikh Hasina Sneersat Nobel winner Yunus's bid to enter politics', Inter-Asian News Service, 18 February 2007, www. india-forums.com/news/bangladesh...; 'Hasina's negative reaction to Dr. Yunus's joining politics', *New Age*, 19 February 2007.
৫৩. 'Younus drops plans to enter Politics', Al Jazeera, 3 May 2007.
৫৪. রহমান, পৃ. ২০১।
৫৫. ওই, পৃ. ২০৬।
৫৬. ওই, পৃ. ২০৩-২০৯।
৫৭. ওই, পৃ. ২০৭।
৫৮. 'ওয়ান-ইলেভেন ব্যর্থ নয়', আনোয়ার পারভেজ-হালিম, বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা, ১১ জানুয়ারি ২০১৬।
৫৯. মতিউর রহমান চৌধুরী।
৬০. *প্রথম আলো*, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৮।
৬১. রহমান (২০১৩), পৃ. ২১৩।
৬২. ওই, পৃ. ২৩২।
৬৩. 'টেলিফোনে রাগের মাশুল', *মানবজমিন*, ৬ জুলাই ২০১৫।
৬৪. রহমান (২০১৩), পৃ. ২৩২।
৬৫. *প্রথম আলো*, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৮।
৬৬. ওই, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৮।
৬৭. হক ও আলম, পৃ. ২২৭।
৬৮. *প্রথম আলো*, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।
৬৯. ওই, ১১ মে ২০১১।
৭০. রহমান (২০১৩), পৃ. ২৭৭।
৭১. ওই।
৭২. হক ও আলম, পৃ. ২৫৩।
৭৩. ওই, পৃ. ২৩৭।
৭৪. *প্রথম আলো*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

৭৫. ওই, ২ মার্চ ২০১৩।
৭৬. ওই, ১৬ মার্চ ২০১৩।
৭৭. ওই।
৭৮. হক ও আলম, পৃ. ২৪৫-২৪৬।
৭৯. *প্রথম আলো*, ৫ মে ২০১৩।
৮০. হক ও আলম, পৃ. ২৪৭।
৮১. www.youtube.com
৮২. ওই, পৃ. ২৪৯।
৮৩. ওই, পৃ. ২৫৪।
৮৪. 'মুহূর্তেই তারানকোর মুখটা ম্লান হয়ে যায়', *মানবজমিন*, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩।
৮৫. *সমকাল*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৩।
৮৬. ওই।
৮৭. ওই।
৮৮. ওই, ১ জানুয়ারি ২০১৪।
৮৯. ওই, *প্রথম আলো*, ৪ জানুয়ারি ২০১৪।
৯০. ওই, ৫ জানুয়ারি ২০১৪।
৯১. ওই।
৯২. bdnews24.com, 10 October 2013.
৯৩. *সমকাল*, ৬ জানুয়ারি ২০১৪।
৯৪. *প্রথম আলো*, ৭ জানুয়ারি ২০১৪।
৯৫. 'কূটনীতিতে বারবার হোঁচট খেয়েছে', *মানবজমিন*, ৮ জুলাই ২০১৫।
৯৬. বেগম খালেদা জিয়া।

অনিশ্চিত পথে

১. ম. সাজ্জাদ হোসেন।
২. ওই।
৩. ওই।
৪. bdnews24.com, 14 sep 2013, retrieved 4 Jan 2014.
৫. bangladeshnationalistparty-bnp.org
৬. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন।
৭. আহমদ, ড. এমাজউদ্দীন (২০০১), *বাংলাদেশ : রাজনীতির সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির রাজনীতি*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৮৩।
৮. *লালনসমগ্র* (২০০৮), সংগ্রহ-গবেষণা-ভূমিকা-সম্পাদনা, আবুল আহসান চৌধুরী, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃ. ১৮৪।
৯. ওই, পৃ. ১৮৫।

যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে

বেগম খালেদা জিয়া : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী। ২৩ আগস্ট ২০১৫।

আকা ফজলুল হক : পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ও পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। আগস্ট ২০১৪।

আবুল হাসিব খান : জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। ১৯৮২-৮৩ সালে এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

আরিফ মঈনুদ্দীন : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সরকারে ত্রাণ ও পুনর্বাসন উপমন্ত্রী হিসেবে কিছুকাল দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টের (বিএনএফ) আহ্বায়ক। ২২ আগস্ট ২০১৫।

এম শামসুল ইসলাম : বিএনপি সরকারের সাবেক মন্ত্রী। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

এস এম ইউসুফ : ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসভাপতি (১৯৭০-৭২), ১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনীর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার কমান্ডার, আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য (১৯৭২), বাকশালের অঙ্গসংগঠন জাতীয় যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য (১৯৭৫), আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক (১৯৭৮) এবং শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক (১৯৮১), বাকশালের সাংগঠনিক সম্পাদক (১৯৮৩)। ২১ অক্টোবর ২০১৫।

করপোরাল (অব.) আবদুল মজিদ : একাত্তরে ৯ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। মেজর জলিলের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। ১৯৭৬ সালে বিশেষ সামরিক আদালতে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন। ২৮ মে ২০১৫।

কর্নেল (অব.) অলি আহমদ : সাবেক সেনাপ্রধান এবং সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমানের একান্ত সচিব। বিএনপি সরকারের বিভিন্ন মেয়াদে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। বিএনপির সাবেক নেতা। বর্তমানে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান। ১৪ আগস্ট ২০১৫।

কামালউদ্দিন আহমেদ : তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক সহসভাপতি। আগরতলা

মামলার অভিযুক্ত সুলতানউদ্দিন আহমদের ছোট ভাই। সেপ্টেম্বর ২০১৫।

খায়রুজ্জামান বাবুল : জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক। ১ অক্টোবর ২০১৫।

খোদা বখশ চৌধুরী : সাবেক মহাপুলিশ পরিদর্শক (আইজিপি)। আফগানিস্তানে জাতিসংঘ মিশনে সিনিয়র পুলিশ অ্যাডভাইজর ছিলেন। ২ অক্টোবর ২০১৫।

গিয়াসউদ্দিন : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক গাড়িচালক। বোর্ডের অধীনে ড্রেজার বিভাগের পরিচালক লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহেরের গাড়ি চালাতেন। ১২ মার্চ ২০১৫।

চৌধুরী খালেকুজ্জামান : অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, সাবেক রাষ্ট্রদূত। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রামে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন থাকা অবস্থায় মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের পক্ষে বিদ্রোহ করেছিলেন। ৬ জানুয়ারি ২০১৬।

নঈম জাহাঙ্গীর : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দুবারের মহাসচিব (১৯৭৮ ও ১৯৮১)। ১৯৮৬ সালে স্বাধীনতা পার্টি গঠন করে এর আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৮৯ সালে আরও কয়েকটি বাম দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে 'ঐক্য প্রক্রিয়া' নামে একটি জোট তৈরি করেন এবং এই জোটের সভাপতি মনোনীত হন। ঐক্য প্রক্রিয়া ১৯৮০-এর দশকে '৫-দলীয় জোটের' সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন করে। ১৭ মে ২০১৫।

নেহাল করিম : অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৭ অক্টোবর ২০১৫।

ম. সাজ্জাদ হোসেন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক (১৯৭৯-৮৩) এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (১৯৮০-৮৩)। ১৬ মে ২০১৫ ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

মতিউর রহমান চৌধুরী : *দৈনিক মানবজমিন*-এর সম্পাদক। ভয়েস অব আমেরিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

মাহফুজ উল্লাহ : বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি। সাপ্তাহিক *বিচিত্রার* সাবেক সহকারী সম্পাদক। লেখক ও গবেষক। বেইজিংয়ে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেসে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল অবধি। ১১ অক্টোবর ২০১৫।

মো. ওবায়দুল হক ভূঁইয়া : জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রথম আহ্বায়ক কমিটি এবং প্রথম পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। কুমিল্লা জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক। সাপ্তাহিক *কড়চার* সম্পাদক। ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

শচিন কর্মকার : অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন পান। মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টরে অংশগ্রহণ করেছেন। ২৭ নভেম্বর ২০১৫।

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন : পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ। জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব। বর্তমানে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান। ৯ অক্টোবর ২০১৫।

শাহীন রাজা : জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীমউদ্‌দীন হল শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, বর্তমানে সাংবাদিক। ১ অক্টোবর ২০১৫।

সাযযাদ কাদির : কবি ও সাংবাদিক। সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* ও দৈনিক *সংবাদ*-এর সাবেক সহকারী সম্পাদক, দৈনিক *দিনকাল*-এর সাবেক বার্তা সম্পাদক ও দৈনিক *মানবজমিন*-এর সাবেক যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৭৮-৮০ সালে গণচীনে রেডিও বেইজিংয়ে ভাষাবিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন। পাক্ষিক *তারকালোক*-এর সম্পাদক ছিলেন (১৯৮২-১৯৯২)। প্রেস ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক (১৯৯৫-২০০৪)। ২২ মে এবং ১৮ ডিসেম্বর ২০১৫।

হায়দার আকবর খান রনো : পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টির অন্যতম সংগঠক। বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়ামের সদস্য। ২৪ এপ্রিল ২০১৫।